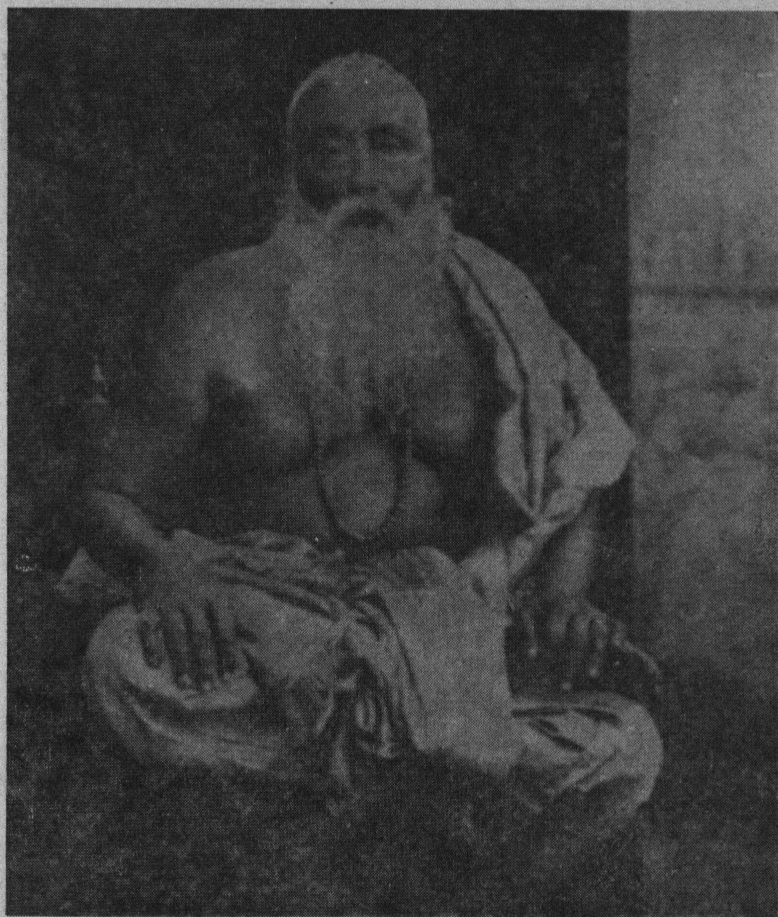
প্রথম প্রকাশ : ২৯শে বৈশাখ, ১৩৯৪

প্রকাশিকা :
সুলেখা সেন
২০/২ রাষ্ট্রগুরু এভিন্যু
কলকাতা-২৮

প্রচ্ছদ :
বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রক :
পুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বাবা—৺উমাপদ সেন

মা—প্রীতি সেন

এঁদের

শ্রীচরণোদ্দেশে

নিবেদিত

সৌদামিনী —

সহধর্মিণী সৌদামিনী দেবীকে লেখা অক্ষয়চন্দ্রের পত্র

সৌদামিনী দেবীকে লেখা পত্র

পরিচায়িকা

বঙ্কিমচন্দ্রের আহূত বঙ্গদর্শনের সারস্বত যজ্ঞে যাঁরা ইন্ধন ও সমিধ যুগিয়েছিলেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গদর্শনের অনেক কৃতবিদ্য লেখকদের মধ্যে বঙ্কিম অক্ষয়চন্দ্রকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' লেখার জন্য। বঙ্গর্শদনের এই 'ফিচার'টি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বঙ্কিম-প্রতিভার খর দীপ্তির কাছে অক্ষয়চন্দ্র বা চন্দ্রনাথ বসু নিষ্প্রভ হলেও কালের ব্যবধানে তাঁদের একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

ডঃ দেবাশিস সেন 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার : জীবন ও সাহিত্য সাধনা'—কে তাঁর গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। কারণ বঙ্কিমের যুগ এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব-প্রভাবকে জানতে হলে বঙ্গদর্শন-লেখকবর্গের স্বতন্ত্র মূল্যায়ন খুবই জরুরী। ইতঃপূর্বে এক তরুণ অধ্যাপক-বন্ধু চন্দ্রনাথ বসুর সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ডঃ সেনের বইটি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে। বারটি সুলিখিত অধ্যায়ে অক্ষয়চন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত হয়েছে। লেখক কেবল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং' প্রকাশিত দু'খণ্ড 'অক্ষয় সাহিত্য সম্ভারের' ওপর ভরসা করেননি। তিনি 'সাধারণী', 'নববিভাকর', 'পূর্ণিমা', 'ভারতী' প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা থেকে মূল রচনার পাঠ মিলিয়েছেন। এছাড়া 'অর্চনা', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সুবোধিনী' থেকেও অনেক মূল্যবান তথ্য আহৃত হয়েছে। তিনি 'অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার'-এ ধৃত লেখাগুলির প্রয়োজনীয় বর্জিত অংশ উদ্ধার করেছেন ; অপ্রকাশিত কিছু রচনাও আমাদের উপহার দিয়েছেন।

মনস্বী অক্ষয়চন্দ্রের একটি পূর্ণাবয়ব আলেখ্য অঙ্কন করে ডঃ দেবাশিস সেন আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর 'ইদানীন্তন কাল' অংশে অক্ষয়চন্দ্রের ভাষা বিষয়ে কিছু টিপ্পনী করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের সরসতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জোরালো মৌখিক গদ্যরীতি এবং নিজের মৌলিক স্টাইল মিলে অক্ষয়চন্দ্রের রচনাশৈলীকে আকর্ষনীয় করে তুলেছে।

কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-অভিনয়কল্প,

অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা সৌদামিনী দেবীর পত্র

স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব বিষয়েই অক্ষয়চন্দ্র কিছু না কিছু ভেবেছেন এবং লিখেছেন। 'বঙ্গদর্শন' যেমন বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ-কীর্তি, সাধারণীও তেমনি অক্ষয়চন্দ্রের শ্রেষ্ঠকীর্তি। বিদ্যাসাগরের প্রতি উষ্মাটুকু বাদ দিলে অক্ষয়—চন্দ্র অকলঙ্ক।

পরিশেষে, 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার : জীবন ও সাহিত্য সাধনা' বইটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি শূন্যস্থান পূরণ করতে পারবে বলেই বিশ্বাস রাখি।

চৈত্র সংক্রান্তি
১৩৯৩

রবীন্দ্র গুপ্ত
রীডার, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের নিবেদন

'অক্ষয়চন্দ্র সরকার : জীবন ও সাহিত্য সাধনা' আমার গবেষণা গ্রন্থ। ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থটির জন্য পি. এইচ. ডি ডিগ্রী প্রদান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। ডঃ ভবানী গোপাল সান্যাল মহোদয়ের উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে এই নিবন্ধ রচিত হয়েছিল। সদ্য প্রয়াত ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায় ও ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ পরীক্ষক হিসেবে আমায় নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমার শিক্ষক ডঃ রবীন্দ্র গুপ্তের কাছে সর্বদা সস্নেহ উপদেশ ও সহায়তা পেয়েছি। তাঁর প্রীতিপক্ষপাত আমার জীবনের বড় সম্বল। আমার অগ্রজ অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়ে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত ডঃ করুণাময় মজুমদার, শঙ্কর ভট্টাচার্য ও অশোক উপাধ্যায়ের কথাও স্মরণীয়।

অক্ষয়চন্দ্রের পৌত্র শ্রীঅনিল সরকার ও শ্রীঅমল সরকার তাঁদের সযত্নরক্ষিত অক্ষয়চন্দ্রের চিঠিপত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করায় আমি কৃতজ্ঞ। প্রয়াত অতুল্য ঘোষের মাধ্যমে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকেও স্মরণ করি। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন অতুল্য ঘোষের দাদামশায়। আমার সহকর্মী স্বপন বসাক এ গ্রন্থের 'নির্ঘণ্ট' তৈরি করে দিয়েছে। আমার অপর চার ভাই আমাকে সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যে গ্রন্থ রচনা শেষ হতে পেরেছে। অনুপ মাহিন্দারের তাড়না ও উৎসাহ উল্লেখনীয়। 'কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও 'চৈতন্য লাইব্রেরী'-র কর্মিগণের কাছেও কৃতজ্ঞ। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। এজন্য পাঠকদের কাছে মার্জনা প্রার্থী।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা, ১৩৯৪ — দেবাশিস সেন

২০/২ রাষ্ট্রগুরু এভিন্যু

দমদম, কলকাতা-২৮

সূচীপত্র

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জীবনবৃত্ত

বঙ্কিম-সমকালীন লেখকদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিক বা কবিরূপে নয়, সমালোচক ও প্রবন্ধকার রূপেই তাঁর মৌলিক রচনাশক্তি সমকালেই বিদ্বজ্জনের স্বীকৃতি পেয়েছিল। বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধুবর জগদীশনাথ রায়কে যে চিঠি লেখেন, তাতেই অক্ষয়চন্দ্রের সারস্বত শক্তি বিষয়ে বঙ্কিমের আস্থা সূচিত হয়েছে ; "I have got a lot of contributors who have promised to write and can write, is Dinabandhu, Hemchandra, Krishnakamal Bhattacharyya, Taraprasad Chatterjee and a younger man whom you don't know, but whose intellectual life, I think. I have greatly influnced, for good or evil, and whose inherent gifts presage something great from him in future. His name is Akhay Sirkar."

কোন প্রবন্ধ রচনার পূর্বেই বঙ্কিমের এই সাধুবাদ নিঃসন্দেহে পরম শ্লাঘার বিষয়। বস্তুত বঙ্কিমের আশা সার্থক ভাবেই অক্ষয়চন্দ্র পূরণ করেছিলেন। বঙ্গদর্শন-নবজীবন-প্রচার-সাধারণী-গৃহস্থ-পূর্ণিমা-মানসী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক-রূপে অক্ষয়চন্দ্র সমাজ-রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে মণীষা ও মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নিরূপণ করা বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য নয়। নানা রচনায় বিকীর্ণ তাঁর জীবনবৃত্তের উপাদানগুলি সংকলিত করাই বর্তমান প্রসঙ্গের লক্ষ্য।

১) জন্ম— ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৬, মাতামহ হরগোবিন্দ বসুর বাড়ী, কদমতলা চুঁচুড়া।

২) পিতা—গঙ্গাচরণ সরকার, সেকালের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। হুগলী কলেজের কৃতীছাত্র, সিনিয়র বৃত্তি-প্রাপক। কবি ও প্রবন্ধকার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুধর্মের অন্যতম উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। ১২৮৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকার হিন্দুধর্ম-রক্ষিনীসভায় তিনি 'হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা' দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাটি ৩২ পৃষ্ঠায় পরে নন্দলাল বসু কর্তৃক চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে (১৮৭৯) প্রকাশিত হয়। 'ঋতুবর্ণন' (১৮৭৩) পয়ার ছন্দে লিখিত তাঁর অন্যতম উল্লেখ্য

কাব্যগ্রন্থ। পয়ার প্রিয় চন্দ্রনাথ বসু এই কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাদের শেষ পয়ার প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্বজনসম্মানিত স্বর্গীয় পিতা রসসাগর গঙ্গাচরণ। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি।" (দ্রষ্টব্য, 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ, ১৩১৩, পৃষ্ঠ -৫৭) মাতা— থাকমণি সরকার।

৩) পৈতৃক বাসস্থান কাঁ্যাকশিয়ালী (কনকশালী) কদমতলা থেকে বেশী দূরবর্তী নয়। দশ বছর পর্যন্ত উলা বা বীরনগরে পিতার কাছে শিক্ষালাভ। তারপর হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ; নবম শ্রেণীর ছাত্ররূপে অধ্যক্ষ থোয়েট্স্* এর বিশেষ অনুমতিক্রমে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা (১৮৬৩) এবং প্রথম স্থান অধিকার। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ক শিক্ষাগুরু ছিলেন গঙ্গাচরণ সরকার।

অক্ষয়চন্দ্রের মধ্যে শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যের বীজ উপ্ত হয়েছিল। ফলে যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সক্রিয় ভাবে নিজেকে সাহিত্যে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। এবং বেশ কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। অবশ্য এর পশ্চাতে ছিল গঙ্গাচরণের অসামান্য প্রচেষ্টা। শতকাজের মধ্যেও নিজ পুত্রকে শিক্ষাদান করতে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হতেন না। প্রসঙ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে, "অক্ষয়বাবুর জীবনে বিশেষত্ব এই যে তিনি বাবার নিকট অনেক শিখিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; কখনও মজলিস হইতে "অক্ষয় তুই উঠিয়া যা" বলিয়া ছেলেকে সরাইয়া দিতেন না। অক্ষয়বাবুর বাবা একাধারে বাবা, মাষ্টার, বন্ধু ও গুরু ছিলেন।"[১] বলা বাহুল্য, এরূপ সম্মিলিত শিক্ষার সুযোগ যে কোন ব্যক্তির জীবনে পরম সৌভাগ্যদায়ক।

শৈশব-অবস্থা থেকেই পিতার সান্নিধ্যে থাকবার ফলে তিনি যেমন আদর যত্নে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগলাভ করেছিলেন, তেমন অসংখ্য বই পড়ারও সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে একদিকে তিনি যেমন তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ সকল পাঠ করতেন, অন্যদিকে তেমন সরস গ্রন্থ সকলেরও পাঠ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর স্বীকারোক্তি; "আমি বাল্যজীবনে যে কেবল ভাষাই শিখিতেছিলাম এমন নহে, না বুঝিয়া, না সুঝিয়া, একটু একটু সাহিত্যও শিখিতেছিলাম"।[২]

অক্ষয়চন্দ্র দশবছর বয়সের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী ও প্রভাকর মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করতেন। মাসিক প্রভাকর ছাড়াও দৈনিক প্রভাকরও প্রকাশিত

* দ্রঃ সাধারণী ১২৮২ পৃঃ—২৫৫-৫৬

হোত বটে, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র তা পাঠ করতেন না। কেননা "দৈনিক প্রভাকরে সংবাদ—আদি থাকিত আর সরিফ্‌সেলের বিজ্ঞাপন থাকিত। উহা আমি বড় পড়িতাম না। প্রতিমাসের প্রথম দিনের প্রভাকরে প্রচুর পদ্য থাকিত। তাহাই পড়িতাম, নাড়িতাম, চাড়িতাম, মুখস্থ করিতাম।"[৩]

নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতি বছর প্রভাকর প্রকাশিত হোত, তাহাই বার্ষিক প্রভাকর নামে সুচিহ্নিত। বার্ষিক প্রভাকরে প্রতি বছরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী ছাড়াও "রং বিরং পদ্যে ঈশ্বরগুপ্তের সেই সরল সতেজ লেখনীতে প্রকাশিত হইত।"[৪]

বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র পত্রিকা পাঠে জ্ঞানের যথার্থ বিকাশ সম্ভবপর নয় একথা চিন্তা করে তিনি 'গোলেবকাওলি' 'হাতেমতাই' রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', অক্ষয়কুমার দত্তের তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ 'চারুপাঠ গ্রন্থ', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'কাদম্বরী', মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের 'আরবীয়োপাখ্যান সেকস্‌পীয়র থেকে অপূর্বোপাখ্যান পলব-র্জিনিয়া ঈশ্বরগুপ্তের পদ্য এবং প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের পাঠ সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। এরূপ বিভিন্নমুখী মননশীলতা ও সাহিত্য পাঠে গঙ্গাচরণ সরকারের কথা অক্ষয়চন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর উক্তি; "বাঙ্গালা লেখাপড়ায় আমার প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ, শিক্ষায় সাহায্য, ভ্রমে সংশোধন প্রধানত তাহা হইতেই। তবে অন্য পঞ্চদেবতার উপাসনা অতি শৈশবেও যেমন করিয়াছি, এখনও তেমনি করিতেছি।"[৫]

বস্তুতপক্ষে পিতার প্রতি অবিচল ভক্তি ও শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর যাবতীয় পাঠ সম্পূর্ণ করেছিলেন। বিন্দুমাত্র অসুবিধার সম্মুখীন হলেই তিনি পিতার কাছ থেকে অসঙ্কোচে বুঝে নিতেন। সামান্য ভীতি বা কঠোর শাসনের মধ্যে দিয়ে তাঁকে শিক্ষালাভ করতে হয়নি। এটা যে একটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং সকলের অদৃষ্টে যে তা ঘটে না একথা অক্ষয়চন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন। "হাস্যে ও গাম্ভীর্যে আমার শিক্ষালাভ। এ সৌভাগ্যের সংযোজক পিতৃদেব।"[৬]

অক্ষয়চন্দ্রের পঠন-পাঠনে ও কোনোকিছু-জানবার-শিখবার যে অফুরন্ত উৎসাহ ও অদম্য স্পৃহা ছিল তার নিদর্শন 'শব্দসাগর' নামক অভিধান রচনায় সুপরিস্ফুট। একাজেও গঙ্গাচরণের সাহায্য উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, শৈশবস্থা থেকে

অক্ষয়চন্দ্রের বাসনা ছিল অভিধান রচনা করবার। তাই অতি সহজ শব্দের অর্থ তিনি যেমন অতি সহজে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন তদ্রূপ অতি দুরূহ, দুর্বোধ্য শব্দের জাল ভেদ করাও ছিল তাঁর জন্মগত অভ্যাস। এরই জন্য অক্ষয়চন্দ্র খাতার একপার্শ্বে দুরূহ দুর্বোধ্য শব্দ লিখে রাখতেন। এবং গঙ্গাচরণের কাছ থেকে শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা চরিতার্থ করতেন। কখনও কখনও বা স্বয়ং গঙ্গাচরণ পুত্রকে উৎসাহিত করবার জন্য নিজহস্তে শব্দের অর্থ লিখে দিতেন। পরবর্তীকালে এইসব অর্থ সমষ্টি নিয়ে এবং বাড়ীতে ব্যবহৃত 'শব্দাম্বুধি' অভিধানের অনুকরণে তিনি 'শব্দসাগর' নামে এক অভিধান রচনা করেন।

৪) ১৮৬৪ সালে সুগন্ধার গোপীকৃষ্ণ রায়ের কন্যা সৌদামিনীর সঙ্গে বিবাহ।

৫) ১৮৬৫ সালে এল. এ পাশ। এল. এ পরীক্ষা অন্তে আরায় অবস্থান-কালে অক্ষয়চন্দ্র গঙ্গাচরণের সেরেস্তাদারের কাছ থেকে উর্দু অক্ষরে লেখা 'চাহার দরবেশ' পাঠ শিক্ষা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য; "পিতার কাছারীর সেরেস্তাদারকে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা পড়াইতাম, তিনি আমাকে উর্দু অক্ষরে 'চাহার-দরবেশ' পড়াইতেন।"[৭]

৬) ১৮৬৭ সালে বি. এ এবং ১৮৬৮ সালে বি. এল পাশ। ইতোমধ্যে হুগলী কলেজ লাইব্রেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুরস্কার লাভ। ১৮৬৮ সালে* এম. এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য। ঐ বছর থেকেই বহরমপুরেই ওকালতির সূচনা।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর পাঠ্য জীবনে কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিপিন বিহারী গুপ্তের পিতা ৺গোবিন্দ গুপ্ত, হরচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি। শেষোক্ত দু'জনের কাছে গঙ্গাচরণও শিক্ষালাভ করেন।

গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির কাছে অক্ষয়চন্দ্র যাবতীয় ব্যাকরণ শেখবার সুযোগ-লাভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে গেবিন্দচন্দ্র শিরোমণি হেডপণ্ডিত থাকলেও নিজস্ব শিক্ষাগত যোগ্যতায় অধ্যাপকের পদে বৃত হন। এতদ্ব্যতীত নীলাম্বর

---

* এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৯১০)—অক্ষয়চন্দ্র উভয়েই বি. এ পরীক্ষার পর বৎসর এম. এ পরীক্ষা দিবার বিশেষ অনুমতি পান।

মুখোপাধ্যায় ও ৺গোপালচন্দ্রের কাছে অক্ষয়চন্দ্র বাংলা ও সংস্কৃত বিষয় অধ্যয়ন করেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রথম সংস্কৃতে এম. এ পাশ করেন ও হুগলী মহসীন কলেজের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু কেবলমাত্র অধ্যাপনার ভেতর দিয়েই তাঁর জীবন শেষ হয়নি। পরবর্তীকালে তিনি যথাক্রমে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী এবং অবশেষে কলকাতা করপোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যানের পদও অলংকৃত করেছিলেন।

৭) ১৮৭২ সালে সরকারী কাজে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-:৮৯৪) বহরমপুরে বদলী হন; গঙ্গাচরণের মাধ্যমে বঙ্কিমের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের সংযোগ ঘটে।

৮) মায়ের অসুস্থতা সংবাদে ১৮৭৩ সালে ওকালতী ছেড়ে চুঁচুড়ায় ফিরে আসেন; আর কোন পেশা গ্রহণ করেননি। তখন থেকে মাতৃসেবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য সেবা তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে ওঠে।

৯) সাহিত্য সেবার ফলস্বরূপ জন্মনিল 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা (১৮৭৩)। সাধারণীর মূলে ছিল সুবোধিনীর প্রভাব। এর সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র দিচ্ছিত। পত্রিকাটি অত্যন্ত সহজ সরল প্রাঞ্চল ভাষায় প্রকাশিত হোত। নিয়ত এ পত্রিকা পাঠে তাঁর মনে তখন থেকেই এক সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পত্রিকা রচনা করবার বাসনা দেখা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত 'সাধারণী'র প্রকাশ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের নিজস্ব উদ্ধৃতি; "সুবোধিনীর আকার প্রকার লইয়াই সাধারণী প্রকাশিত হয়।"[৮]

'সাধারণী' পত্রিকা তের বৎসর প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এই পত্রিকার প্রকাশ প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন বার হয়েছিল। সেটি এখানে উদ্ধারযোগ্য; "১১ই কার্ত্তিক হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। বঙ্গদর্শনের দুই তিনজন লেখক এই পত্রিকায় লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। নূতন সম্বাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার জন্য, যতদূর, সাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে। এই পত্রিকা কোন বিশেষ দলের পক্ষসমর্থনার্থ প্রকাশিত নহে। পৃথক্ পৃথক্ দলের ভিন্ন ভিন্ন সমাচার পত্র আছে; কিন্তু সাধারণ কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ কোন বিশেষ সম্প্রদায়িক পত্রে লিখিতে ইচ্ছা করেন না। এই পত্র তাঁহাদিগের জিহ্বাস্বরূপ হইবে। সাধারণে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য অতি অল্প করা হইরাছে। এক্ষণে সাধারণে সাহায্য করিলে আমরা কৃতার্থ হইব।"[৯]

এই সময়েই বঙ্গদর্শনে (২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা থেকে) 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত

সমালোচনা'র প্রকাশ।

১০) ১৮৭৪ সালে চুঁচুড়ায় সাধারণীর যন্ত্রালয় স্থাপন ও 'সাধারণী'র নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই বছরেই জ্যেষ্ঠপুত্র অমরচন্দ্রের জন্মগ্রহণ।

১১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮-১৯২৫) উদ্যোগে ১৮৭৬ সালে (২৬শে জুলাই) ভারত সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত সভার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি; "The Indian Association Supplied a real need, It Soon focussed the public Spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of the educated community of Bengal."[১০]

এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বেলা ৫-৩০ টায় কলেজ-স্কোয়ারে অবস্থিত এলবার্ট হলের নীচের তলায় এক সভা হয়। ব্যবস্থাদর্পন-প্রণেতা ও ঠাকুর আইন অধ্যাপক শ্যামাচরণ শর্মাসরকার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এছাড়া আনন্দ-মোহন বসু সম্পাদক এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যথাক্রমে সহ-সম্পাদক মনোনীত হন। এই সভায় সাত থেকে আটশ' শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভা 'ভারত সভা' হিসেবে চিহ্নিত হলেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মুখ্য ভূমিকারূপেও এর দান উল্লেখনীয়।

'ভারত সভা' স্থাপনের চারটি উদ্দেশ্যের কথা সুরেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে বিবৃত করেছেন;—(১) দেশের মধ্যে সংঘবদ্ধ জনমত গঠন করা (২) ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে একস্বার্থবোধে ও আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত করে তোলা (৩) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বের মনোভাব গড়ে তোলা এবং (৪) সর্বশেষে জনসাধারণকে দেশের গণ আন্দোলনের মধ্যে গ্রহণ।* এখানে বলা যেতে পারে চন্দ্রনাথ বসু সভার এই চারটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করলেও শেষ পর্যন্ত অক্ষয়চন্দ্রের একাগ্র সাধনা ও

---

* 1. The creation of a Strong body of Public Opinion in the Country; 2. The Unification of the Indian races and Peoples Upon the basis of Common Political interests and aspirations; 3. The Promotion of friendly feeling between Hindus and Mohammedans; and, Lastly, the inclusion of the masses in the great Public movements of the day. S. N. Banerjec. A Nation in Making, Reset and Reprinted, London, 1963. P-39

অনলস কর্ম প্রচেষ্টায় ভারত সভা ক্রমে সমগ্র ভারতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এ প্রসঙ্গেও সুরেন্দ্রনাথের সম্মানজনক মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"He (Akshay chandra) was Prominently Connected with the Indian Association in its early days, and took a leading Part in enssuing Success of the Second Session of the Congress in Calcutta 1886" (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ, পরিচিত পৃঃ—৫)

এতদ্ব্যতীত খাজনা হিসাব (Rent Bill) ও রায়তের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অক্ষয়চন্দ্রের মুখ্য ভূমিকার কথা প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ; "He was a leading figure in Connection with the rent Bill agitation and worked in earnest Co-oparation with the Editor of the Paper (Bengalee) as a sturdy Champion of the rights of ryots." (ঐ, ঐ)

এই বছরের নভেম্বর মাসে অক্ষয়চন্দ্র হুগলীর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদেও অধিষ্ঠিত হন।

১২) ১৮৭৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' উপাধি গ্রহণ। এবং এই উপলক্ষে লর্ড লিটন ইংলণ্ডের দরবারের ন্যায় 'দিল্লীর দরবার' নামে যে সভা করেন তাতে অক্ষয়চন্দ্র বার্তা সম্পাদক হিসেবে নিমন্ত্রিত ও উপস্থিতি হন।

১৩) ১৮৮০ সালে চুঁচুড়ার বিখ্যাত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 'হিন্দু স্কুলের বিলোপন, ও সেখানকার আসবাবপত্র কিনে নিয়ে অক্ষয়চন্দ্রের সাধারণী এইচ, ই, স্কুল স্থাপন। প্রতিবেশী শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেও (পরে যিনি সন্ন্যাসী হয়ে শ্রীমন্ মহারাজ পরমানন্দ তীর্থস্বামীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন) অক্ষয়চন্দ্র যেমন সুষ্ঠুভাবে এর পরিচালনা করতেন, তেমন নিয়মিত ছাত্রও পড়াতেন। যখন সাধারণী কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়, তখন এই স্কুল আপনা-আপনি উঠে যায়।

১৪) ম্যালেরিয়ার দরুণ ১৮৮৪ সালের মে মাসে অক্ষয়চন্দ্র মির্জাপুর ষ্ট্রিটে, (কলকাতা-৬৮তে) সাধারণী-যন্ত্র স্থানান্তরিত করেন। এবং এসময় থেকে সাধারণী শেষ দিন পর্যন্ত এখান থেকেই প্রকাশিত হয়। ঐ বছর জুলাই মাসে (১২৯১-৪ঠা শ্রাবণ) অক্ষয়চন্দ্র 'নবজীবন' নামে মাসিক পত্রিকা বার করেন। হিন্দুজাতির পুনরভুত্থান জাগ্রত করার মানসে নবজীবনের জন্ম। এই পত্রিকা

সম্বন্ধে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ; "His Navajivan was instrumental to no Small extent in bringing about the Hindu revival of his times." (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, প্রথমার্ধ পৃঃ-১৩)। উক্ত পত্রিকায় দেশের সমস্ত মহারথী সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের লেখনীর দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। পত্রিকাটির ব্যাখ্যা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "নবজীবন মানে হিন্দুর নবজীবন অর্থাৎ Hindu Revival." (অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯)।

এই হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের সূত্রেই তাঁর তীর্থ-পর্যটনের কথা উল্লেখ করতে হয়। যাঁরা ভারতের অতীত ঐতিহ্যে আগ্রহী তাঁরা সকলেই সরে-জমিনে তীর্থ পরিক্রমা করেছেন। পরিব্রাজক বিবেকানন্দই সারা ভারতের বিবেক-মূর্তি হতে পেরেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র মূলতঃ দেবদেবী দর্শন, পূজা-অর্চনাদি এবং কারুকার্যখচিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দর্শনের জন্যই সমগ্র ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন। অবশ্য এ সকল তীর্থভ্রমণ তিনি নিজ অর্থব্যয়েই সম্পন্ন করতেন। প্রসঙ্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য স্মর্তব্য ; "অক্ষয়বাবু তাঁহার দীর্ঘজীবনে এক এক করিয়া সকল তীর্থেই বেড়াইয়াছেন। সারা ভারতটা ঘুরিয়া লইয়াছেন।" (ঐ)

১৫) মির্জাপুরে 'সাধারণী' স্থানান্তরিত হবার পর অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে 'নববিভাকর' সম্পাদক বিখ্যাত অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় ঘটে এবং এই সূত্রেই ১৮৮৬ সালে (১২৯৩) অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় উক্ত দুই পত্রিকা মিলে 'নববিভাকর সাধারণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৬) ১৮৮৮ সালে কদমতলার বাড়ীতে ৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার গঙ্গাচরণের মৃত্যু। প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত গৃহের দুর্গোৎসবও এই বছরই শেষ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গঙ্গাচরণের মৃত্যু সংবাদে সকলেই ব্যথিত হয়েছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়টে গঙ্গাচরণের মৃত্যু সংবাদ বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হ'য়েছিল।[১১]

১৭) ১৮৮৯ সালে অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত সমস্ত পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮) ১৮৯০ সালে 'জমিদারী পঞ্চায়ৎ' সভার সাধারণ সম্পাদক পদে অক্ষয়চন্দ্র মনোনীত হন। এই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্মিনী সৌদামিনী দেবীর অকাল প্রয়াণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ৩৬ বৎসর। সহধর্মিনীর আকস্মিক প্রয়াণে তাঁর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। এমতাবস্থায় সকলের বহু পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও অক্ষয়চন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন

নি। ফলে নাবালক পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। নিয়ত তাদেরকে দেখাশোনার জন্য তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হ'ল। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন ;—"অক্ষয়বাবু একেবারে কদমতলাবাসী হইলেন, বাড়ী ছাড়িয়া এক পাও নড়িবার যো রহিল না। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার স্ফূর্ত্তি কমিল না। তিনি বলিতেন, মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুপালন করা আর বালগোপালের সেবা করা একই কাজ।"[১২]

১৯) ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন (Age of Consent Bill) পাস এবং দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন। ঘটনার সূত্র ৩৫ বছরের হরিমাইতির সঙ্গে ১০ বছরের স্ত্রী ফুলমনির সহবাসের ফলে মৃত্যু এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার ১২ বছরের কমে কোন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ করে এক বিধিনিষেধ জারী করলে দেশের মধ্যে দেখা দেয় এক জন-বিস্ফোরণ।

ব্রাহ্মসমাজ বিলটি সমর্থন করলেও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিলটির বিরোধিতা করেন। 'দৈনিক সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাল্য-বিবাহের সমর্থনে লেখা বার হয়েছিল (১৮৯১, ২০শে জানুয়ারী)। এছাড়া ১৮৯১ এর ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বেনামে এর প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন। এসময়ে অক্ষয়চন্দ্রের পারিবারিক জীবনে ঘোরতর বিপর্যয় সত্ত্বেও, দেশবাসীকে জাগ্রত করবার মানসে তিনি লেখনী ধরতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা এই জনবিস্ফোরণের নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেছিল। এছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গড়ের মাঠে এই আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা ডাকেন।[১৩] ভারতে বিশেষত কলকাতায় এত বড় আন্দোলন আর হয় নি। এমনকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনও (১৯০৫) এর তুলনায় যৎসামান্য ছিল।[১৪]

শুধু জনমত সংগঠিত ও গণবিক্ষোভ নয়, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা 'ইংরাজ সরকারের অসৎ অভিপ্রায়' সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধও * প্রকাশ করেছিল ; ১) 'আমাদের অবস্থা' (১৮৯১, ২৮শে মার্চ), 'ইংরেজের প্রকট মূর্তি' ও 'অসভ্য হিন্দুর প্রথম ও প্রধান ধারণা' (১৮৯১, ১৩ই মে) 'পরিণাম কি' ও 'অসত্যের পক্ষে অকপট নীতিই ভাল' (১৮৯১, ৩রা জুন)। প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত

---

* পাঁচটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম—অ, সা. স (প্রথমার্ধ) পরিচিত পৃ:-৩৪ দ্রঃ।

হবার পর দেশের মধ্যে দেখা দেয় এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। বলা বাহুল্য, প্রবন্ধগুলির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। কেননা ইতঃপূর্বে আর কোন পত্রিকা রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশে অগ্রসর হয়নি। ইংরেজশাসন কায়েম হবার পর এটি প্রথম রাজদ্রোহের মামলা হওয়ায় জনসাধারণ স্বভাবতই এই মামলার রায় দান ব্যাপারে আগ্রহী ছিল।

ইংরেজ সরকার নির্দয়ভাবে এর সমুচিত জবাব দেবার জন্য ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগস্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডব্লিউ সি. পেথেরম জুরির সহায়তায় এই মামলার বিচার শুরু করেন। সরকারের পক্ষে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলে মিঃপুগ, উড্‌রফ ও ইভান্‌স এবং বঙ্গবাসীর পক্ষে মিঃ জ্যাকসন, এন এন ঘোষ, গ্রাহাম্‌, এস. পি সিংহ মামলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে চন্দ্রনাথ বসু সরকারী অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় সরকার তাঁকে অন্যতম সাক্ষীরূপে উপস্থিত করেন। তিনি আদালতে উপস্থিত হ'য়ে প্রবন্ধগুলির ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বিচারে অন্তত দু'টি যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা একথা আদালতকে জানিয়েছিলেন।[১৫] যা হোক ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত উপায়ন্তর না দেখে নিজ থেকেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি ঘটান।

২০) ১৮৯২ সালের ১৯-এ এপ্রিল অক্ষয়চন্দ্রের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী থাকমণির মৃত্যু।

২১) গঙ্গাচরণের বহুদিনের ইচ্ছে ছিল যে স্বগ্রাম চুঁচুড়ায় চতুষ্পাঠী খোলেন। এই ইচ্ছাকে ফলবতী রূপ দেওয়ায় জন্য অক্ষয়চন্দ্র জগবন্ধু ভট্টাচার্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জগবন্ধু ভট্টাচার্য গঙ্গাচরণের ইচ্ছাকে পূরণ করবার জন্য চুঁচুড়ায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে গরীফা গ্রামে চতুষ্পাঠী খোলেন। গঙ্গাচরণের এই ঈপ্সিতবাসনা চরিতার্থ করবার অভিপ্রায়ে অক্ষয়চন্দ্র নিজগৃহে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী খোলেন (১৮৯৪)। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে, দেশে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুশীলন যাতে অব্যাহত থাকে তারই জন্য এই চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গত অক্ষয়চন্দ্রের উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্বাগ্রে আবশ্যক ; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে।[১৬]

অক্ষয়চন্দ্র নিজে কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হ'লে ব্রাহ্মণের প্রতি ছিল তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাঁরা ব্যতিরেকে যে সমাজে কোন কিছুরই উন্নতি সম্ভব

নয় তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য এবিষয়ে অগস্তকোমতের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য ছিল। অগস্তকোমতের মতে; "ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে, তবে তজ্জন্য বিষয় বাসনা এবং ঐহিক প্রভূত লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।[১৭] কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের মতে ব্রাহ্মণদের বিষয়াসক্তি বা প্রভূতলালসা পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

২২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূচনালগ্ন থেকেই অক্ষয়চন্দ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ থেকে ৯৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

২৩) ১৯০০ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র অমরচন্দ্রের কটকে মৃত্যু। তখন তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ২৬ বৎসর।

২৪) অমরচন্দ্রের অকাল প্রয়াণে চতুষ্পাঠীর নামকরণ হয় 'অমরচতুষ্পাঠী' (১৯০১)।

২৫) ১৯০৪ সালে সরকার গৃহে 'হিন্দুসমিতি'র আগমন ও সমিতির উপদেশকস্বরূপ অক্ষয়চন্দ্রের পরিচালন ভার গ্রহণ।

২৬) ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন সমগ্রদেশ উত্তাল, অভিভূত, তখন রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুমুসলমানের ভ্রাতৃত্ব প্রেমকে যেমন অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন, তদ্রূপ অক্ষয়চন্দ্রও তাঁর স্বগ্রাম চুঁচুড়াতে গ্রাম্য দেবতা 'ষণ্ডেশ্বরের (শিবের) পূজা', দরিদ্রনারায়ণসেবা ও শোকযাত্রার মধ্যে দিয়ে জনকল্যাণে দিন অতিবাহিত করেছিলেন। রবীন্দ্রবিরচিত সঙ্গীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান'—সকলের কণ্ঠে যেমন গীত হোত, তদ্রূপ অক্ষয়চন্দ্রও স্বরচিত "স্বদেশীর গান"—

"মা! আমি স্বদেশী হ'ব।
ওমা বিদেশীর কাছে না যা'ব॥
বিদেশীর বিষম মায়ায় কতকাল আচ্ছন্ন র'ব?
তোর চরণধূলি, শিরে তুলি, সে মায়া কাটায়ে দিব।"

(অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, শেষার্ধ পৃঃ-৮১৯)

সঙ্গীতটির মধ্যে দিয়ে উৎসবটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে তুলেছিলেন। এবং সঙ্গীতটি শোকযাত্রায় গীত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়চন্দ্রের নির্দেশে লিখিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" রচনাটি কথকতার মাধ্যমে হরিনাথ

ঘটক কথক শিরোমণির দ্বারা পরিবেশিত হয়েছিল। দেশাত্মপ্রীতি অক্ষয়চন্দ্রের জীবনের বিশিষ্ট দিক। রাজনীতি চর্চার মধ্যে দিয়ে এই দেশাত্মবোধের স্ফুরণ ঘটেছে। কার্লাইলের বীরপূজা, বায়রণের গ্রন্থপাঠ ও অনুবাদ এবং সর্বোপরি মিল—অগস্তকোমতের সমাজবাদ—অক্ষয়চন্দ্রের জীবনের রাজনীতি চর্চার মধ্যে দিয়ে দেশাত্মপ্রীতির পরিচয়ই সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত।

দেশাত্মবোধের আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা এই যে ১৮৯১ থেকে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষয়চন্দ্র কোনদিনের তরে বিদেশীদ্রব্য কেনেননি। এবং ব্যবহার করেননি। এমনকি ৭ বছর পর্যন্ত তাঁর পরিবারের জন্য কোন ডাক্তারিঔষধ রোগীরপথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি॥

২৭) ১৯০৭ সালের ২৩-এ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধবউপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা'র মামলার শুনানি ও তাঁকে রক্ষার্থে অক্ষয়চন্দ্রের দেশবন্ধুর নিকট গমন। ঐ বছরের নভেম্বরমাসে কাশিমবাজারে যে প্রথম বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলন হয় তাতে রামেন্দ্রসুন্দর অক্ষয়চন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' (বঙ্গদর্শন-১২৮০)-র উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, আনন্দমঠের (মা যা হইবেন) মাতৃমূর্তির পরিকল্পনা 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধে মহালক্ষ্মী মূর্তিতে সুপরিস্ফুট।

২৮) ১৯৮০ সালে শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (পরে সংসারত্যাগী শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানপাদ), শ্রীরামরতন সরকার ও কনিষ্ঠপুত্র অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীনসাহিত্য পাঠ সম্বন্ধে শিক্ষাদান। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ। অবশ্য এর পূর্বে তাঁর রচনা ও সমালোচনা 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

২৯) ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অক্ষয়চন্দ্রকে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছিলেন স্নাতক পর্যায়ের অবশ্যপাঠ্য বাংলার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক নিযুক্ত ক'রে (১৯০৯-১৭)।

১৯১১-১৩ (১৩১৮-২০) 'মানসী' পত্রিকা অক্ষয়চন্দ্রের বিভিন্ন সময়ের লেখা 'নিদর্শন নামক অংশ' এই নামে প্রকাশ ক'রে তাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। এই সমস্ত রচনা সে যুগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রতিটি রচনা 'অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার'-এ বার হ'লেও বিষয়ানুসারে সম্পাদক গৌরহরি সেন কখন কখন তাদের নামকরণে তারতম্য ঘটিয়েছেন—মনে হয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই পরিকল্পনা। যেমন দ্রবময়ী চণ্ডালিনী—'মেয়ে চৌকীদার' (মানসী ১৩১৮

আশ্বিন পৃঃ-৫৮৪); বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা, সংস্কার নামক অংশকে 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' (মানসী কার্ত্তিক ১৩১৯ পৃঃ-৬৬২); বা সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ (চট্টগ্রাম)-এর অংশ বিশেষকে 'পল্লীগ্রামে অস্বাস্থ্য' (ঐ ১৩২০. বৈশাখ পৃঃ-২৪১-৪২) এই নামে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩০) ১৯১২ সালে অক্ষয়চন্দ্রের চুঁচুড়া পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। উক্ত সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করবার পূর্বে তিনি মাতৃভাষার চরণ বন্দনা করে প্রশস্তি গেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস এরূপ শুভ সম্মিলনে আত্মার যোগ যেরূপ ঘটে অন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানে তা পরিলক্ষিত হয় না। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসেবে জনসাধারণকে আদর ও অভ্যর্থনা করতে পারায় নিজেকে ধন্য বলে মনে করলেও একথা বলতে বিস্মৃত হন নি যে মাতৃভাষার আশীর্বাদ ও আপনাদের পূর্ণ সমর্থন ছাড়া তা কখনই সম্ভব হ'তনা।

পুরাতনের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। এই মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধার কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ ও স্বগ্রাম চুঁচুড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। চুঁচুড়া-র অর্থ ক্ষুদ্র হ'লেও একসময়ে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য ও উৎসবাদিতে যে এ গ্রামে গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের আগমন ঘটত এর জন্য তিনি গর্বিত। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কোমলপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জজ দ্বারকানাথ মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মগণ বায়ুপরিবর্তন করিতে এই স্থানে আসিতেন ও থাকিতেন।" (অ. সা. স পৃঃ-৬৫১) আর "পূজাপার্বণে চুঁচুড়ার উৎসব নগরে ধরিত না। সুরধনীতীরে লোকে লোকারণ্য হইত।" (ঐ, ঐ) উপর্যুক্ত ঘটনাসকল বক্তার বালক-কিশোর কালের। আর যখন পূর্ণ যৌবন সেই 'সময় চুঁচুড়া সাহিত্যের নন্দনকানন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, পূজনীয় ভূদেববাবু, প্রসিদ্ধ কাব্য-সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক স্বনামখ্যাত রামগতি ন্যায়রত্ন, আর্যদর্শন সম্পাদক যোগেন্দ্র-বিদ্যাভূষণ বাস করিতেন।" (ঐ,ঐ) বর্তমানের কথা প্রসঙ্গে তাঁর আক্ষেপের সুরই ধ্বনিত হ'য়েছে ; 'আর শ্রীছাঁদ নাই, রোগে রোগে আমরা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি—শোকে আমাদিগকে জড়ীভূত করিয়াছে, * * * বন-জঙ্গলে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়াছে, একটু রৌদ্রের মুখ দেখিতে পাইনা, বসন্তের বায়ু গৃহে প্রবেশ করিতে পায় না।' (ঐ, ঐ)

বঙ্গভাষা তথা মাতৃভাষা অক্ষয়চন্দ্রের প্রাণের সামগ্রী। এই ভাষার প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁরা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক তাঁদের 'পদধূলি' গ্রহণ করতেও তিনি রাজি ছিলেন। অপরদিকে এই ভাষা নিয়ে যাঁরা বিদ্রূপ বা সঠিক প্রয়োগক্ষমতায় ব্যর্থ হতেন তাদের প্রতি তাঁর উষ্মার ভাব প্রকাশিত হ'ত। প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্য ; 'মায়ের অঙ্গে আঁচড় দেখিলে আমার চক্ষে জল আসে, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, কপালে করাঘাত করিতে প্রবৃত্তি হয়। বঙ্গভাষার সেবা আমার সখের সামগ্রী নহে, কর্তব্যের অনুষ্ঠান নহে—আমি প্রাণের টানে, হয়ত রক্তের টানে ভাষার সেবক।' (ঐ, পৃঃ-৬৫২)

মাতৃভাষার সেবা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হ'ল, 'মাতৃভাষার সেবাকরিতে হইলে মাতৃভাষাকে চিনিতে হয়; চিকিৎসক রোগী না চিনিয়া যেরূপ উদারময়ের রোগীর কাঁচা দাঁত উঠাইয়া দিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত এবং রোগীকে মহাযন্ত্রণাগ্রস্ত করিয়াছিলেন, আমরাও অনেক সময় মাতৃভাষাকে না চিনিয়া সেইরূপ বিড়ম্বিত হই ও মাতৃদেহে আঘাত করি।' (ঐ, পৃঃ-৬৫৩)

ভাষা প্রসঙ্গে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার কথা উল্লেখ করলেও চলিত ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাঁর মতে, 'কেবলগ্রন্থপাঠে বা ব্যাকরণ শিক্ষায় চলিতভাষা শিক্ষা করা যায় না ; সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের কথাবার্তা লক্ষ্য করিতে হইবে।' (ঐ, পৃঃ-৬৫৪) মোটের ওপর এপ্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষা যত সহজ সরল হবে ততই ভাল।

এরপর অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি শুদ্ধ সাহিত্য-সেবী হইয়াও লোকমধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার একান্ত কামনা করি। সাহিত্য অপচিত হইয়া বিজ্ঞান উপচিত হউক এমন কামনা করি না। তবে সাধারণজনগনমধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তৃতিলাভ করুক, এটি আমার একান্ত ইচ্ছা। রামেন্দ্র সুন্দরের মন্ত্রদানের পূর্ব হইতেই এই ইচ্ছা আমি আমাদের সভ্যমণ্ডলী-মধ্যে আগ্রহে প্রচার করিয়াছি।' (পৃঃ-৬৫৬)

পরিশেষে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। সাহিত্যপরিষদ একাজে অগ্রসর হ'লেও 'ব্রতপালনের শিথিল যত্ন হওয়াতে' তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই বছরেই অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্য পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন।

৩১) অক্ষয়চন্দ্র ১৯১৩ সালে 'আর্য সাহিত্য সমাজ' কর্তৃক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের-পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই পরীক্ষায় ডক্টর অঘোরনাথ

চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতা), যোগীন্দ্রনাথ বসু, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে পরীক্ষক নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। এই বছরে চট্টগ্রাম ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। এখানে অক্ষয়চন্দ্র মূল ভাষণের পূর্বে সকলকে 'ভারতে ভারতী দেবীর বন্দনা' করতে আহ্বান জানিয়েছেন। এরপর চট্টগ্রাম বলতে নবীনচন্দ্র সেন ছাড়া তাঁর যে আর বিশেষ কোন ধারণা নেই সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন এবং বর্তমানে নবীনের উত্তরসূরীরা তাঁর আরদ্ধকর্ম সম্পন্ন করতে অগ্রসর হওয়ায় তিনি তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা বলেছেন। তাঁরমতে, 'সুকুমার সাহিত্য-সেবায় সৌন্দর্য-উপভোগের ক্ষমতা জন্মায়, বৃদ্ধিপায় এবং স্থায়ী হয়।' (ঐ, পৃঃ-৬৬০) প্রসঙ্গত তিনি সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভাবাদর্শের প্রতি জোর দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ; 'প্রাচীন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যে রাখিতেই হইবে। পুরাণ-ইতিহাসের আদর্শ যদি সমাজে না থাকে, সমাজের আদর্শ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত না হয়, তবে বিকৃত সাহিত্যের দোষে সমাজও বিকৃত হইবে।' (ঐ, পৃঃ-৬৬২)

ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমতের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। পূর্বের মতই এখানেও তিনি বলেছেন যে ভাষা এমন হওয়া প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে প্রাণের স্পন্দন ফুটে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্য স্মর্তব্য, 'প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি। যে ভাষায় প্রাণ নাই, সে ভাষাই নহে।' (ঐ, পৃঃ-৬৬৩)

এরপর অক্ষয়চন্দ্র পল্লীগ্রামের প্রতি অবহেলার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং সকলের কাছে আবেদন করেছেন, 'আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে আমাদের ইহকাল—পরকাল নষ্ট হইতেছে। যাহাতে আপন গ্রামে, আপন ভিটায় আমরা সুস্থ শরীরে বাস করিতে পারি, তাহার চেষ্টা সকলকে করিতে হইবে, —জঙ্গল কাটাইতে হইবে, পুষ্করিনীর পঙ্কোদ্ধার করিতে হইবে, নদীসকল যাহাতে বহতা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।' (ঐ, পৃঃ-৬৭১)

সবশেষে অক্ষয়চন্দ্র প্রেরিত পুস্তক সমুহের মধ্যে থেকে কতকগুলি পুস্তকের সমালোচনা করেছেন।

উক্ত সাহিত্য সম্মিলন প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল।*

আলোচ্য বর্ষে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসবার পর অক্ষয়চন্দ্রকে দেশবাসী সম্বর্দ্ধনা জানান। এই সম্বর্দ্ধনাসভা ২৮শে বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল দমদমার সুরেন্দ্রনাথ রায়ের বাসভবনে তাঁরই আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্বেও প্রায় তিনশত গণ্যমাণ্য ব্যক্তি ও সাহিত্যসেবী এই সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত থেকে অক্ষয়চন্দ্রকে যথোচিত সম্মান দেখিয়েছিলেন। সম্বর্দ্ধনা সভার পূর্ণ বিবরণ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৩২০ পৃঃ-১১৬) প্রকাশিত হয়েছিল। এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে 'অক্ষয়গীতি' নামে একটি কবিতা রচিত ও গীত হয়।** সেটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে এখানে তুলে ধরা গেল,

কি গান গাহিব আজি
কি রাগে বা কি ভাষায়।
অক্ষয়-গরিম-গীতি
মর্ত্ত্য-স্বরে কি কুলায়॥

সাহিত্যের মূর্ত্তমান,
চিরপূজ্য গরীয়ান্;
তার যোগ্য রচিগান,
কি বা পুণ্য সাধনায়।
মরমে মূর্চ্ছনা দিয়ে;
ক'টা কথা তুলে নিয়ে,
রেখে দিনু সাজাইয়ে,
শুধু গীতি-ভঙ্গিমায়-

তাহাতেই অনুরক্তি,
প্রণতি পরমা ভক্তি,
তা' ছাড়া আছে কি শক্তি;
দিতে অর্ঘ্য দেবতায়।

---

* বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) ১৩২০ পৃঃ-৭০-৮১

** শ্রীবিহারীলাল সরকার।

তাঁর কীর্ত্তি বিশ্বজুড়ে ;
সাহিত্যের সৌধ-চূড়ে ;
বিজয়-পতাকা-উড়ে,
দীপ্ত আত্ম-প্রতিভায়,—

তবু যদি তৃপ্তি চাও,
ভক্তি মাল্য গলে দাও,
জয়গান লিখে যাও,
ভক্ত-চিত্ত নিশানায় ॥[১৮]

উক্ত বছরে অক্ষয়চন্দ্র পুনরায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৩২) ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে (২৭-২৯ চৈত্র) সপ্তম সাহিত্য সম্মিলনের যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পূর্ববর্তী সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ পাঠান্তে আরম্ভ হয়। এই সম্মিলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার ভাষণে অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটলেও যথার্থ সুকুমার সাহিত্যের বিস্তৃতি যে পূর্বের তুলনায় নিষ্প্রভ তার উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীত সাধনা ও পুস্তক রচনা করবার মধ্যেই যে বাঙালীর যথার্থ পরিচয় নিহিত সে কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ভারতের প্রাণ—ধর্ম, বাঙ্গালির প্রাণ,—সেই ধর্মের সহিত সঙ্গীত সাহিত্যের সাধনা।' (ঐ, পৃঃ-৬৮২) পুস্তক রচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন যে, পুস্তক রচনা করবার আগ্রহ বাঙালীর জন্মাবধি হলেও বর্তমানে পয়সার প্রভাবে 'বই লেখা বাই' নষ্ট হতে বসেছে।

এরপর অক্ষয়চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের গান ও তাঁর আরোপিত সুরবিকৃতি যে ভয়ঙ্কর এবং তা যে প্রকৃত স্বদেশবাৎসল্য নয় তার উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের এই বক্তব্য সেকালে অনেক সুধী ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। প্রসঙ্গত 'সবুজপত্র' জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃঃ ১২১-৩১ উল্লেখ্য।

অক্ষয়চন্দ্র রচনারীতি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বাঙালীমাত্রেরই মনে রাখা দরকার। ভাষা প্রসঙ্গে তাঁরবক্তব্য, ভাষা যত সহজ সরল এবং স্বচ্ছন্দে লেখনীমুখ থেকে প্রকাশ পাবে তত ভাল। কেননা 'ভাষার প্রাঞ্জলতা ভাষার প্রধান গুণ।' (অ, সা, স, পৃঃ-৬৮৬) এরপর অক্ষয়চন্দ্র 'বাঙ্গালির দৃষ্টি বাঙ্গালার

দুর্দশাগ্রস্ত পল্লীগ্রামের দিকে আকৃষ্ট' করবার উপদেশ দিয়েছেন।

উপসংহারে সাহিত্য-সম্মিলনে প্রেরিত গ্রন্থসকলের মধ্যে থেকে বিশেষ কয়েকখানির গ্রন্থ সমালোচনা করেছেন।

এই অভিভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা* কিছু বক্তব্য এখানে আলোচনা করা হ'ল। প্রথমেই তিনি বলেছেন, 'অভিভাষণটিতে অপ্রাসঙ্গিক, অনাবশ্যক কথা অনেক আছে—অন্যায় তর্কেরও অবতারণা আছে; কিন্তু তথাপি বলিব যে, এই অভিভাষণটি এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের সেরা অভিভাষণ। ইহা পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে রচনাটি প্রাণের টানে লেখা—ফরমায়েসী লেখা নহে। বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালী লেখকের অকৃত্রিম রোদন।

রচনাটি যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি নির্ভীক। ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথের ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বরের অভিভাষণ দুইটি পড়িবার সময় আমাদিগকে যেরূপ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে হইয়াছিল,—এ অভিভাষণটি পড়িয়া বুঝিতে আমাদিগকে তেমন কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণের আগাগোড়া বুঝিতে পারিয়া আমরা বাঁচিয়াছি। 'ভাবের ঘরে চুরি' অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণে নাই।

সুকুমার-সাহিত্য আলোচনার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে না বলিয়া অক্ষয়চন্দ্র দুঃখ করিয়াছেন—কথাটি খাঁটি সত্য। আমরা যাহা লিখি, তাহা যেন নিজেদের জন্যই লিখি ;—লিখিবার সময় পাঠক বেচারীদের মুখ চাহিনা। লেখক ও পাঠক এই দুই জনের যোগেই যে সাহিত্য তৈয়ারী হইয়া উঠে, এ সহজ সত্যটা অনেক কাল হইতেই ভুলিতে বসিয়াছি।

'অক্ষয়চন্দ্র অভিভাষণে'র একস্থলে বলিতেছেন, 'বাঙ্গালীর বই লেখা 'বাই' ছিল। ক্রমে সেই বাঙ্গালীর প্রকৃতি উল্টাইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী 'সেয়ানা' হইয়াছে, পয়সার মায়া বুঝিয়াছে।' কথাটা ঠিকও বটে বেঠিকও বটে। বাঙ্গালী 'সেয়ানা' হইয়াছে, মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে, একথা মানি। কিন্তু এ জাতির বই লেখা 'বাই' যে কমিয়াছে, একথা স্বীকার করিনা। 'বাই' যদি কমিবে, তবে প্রায় প্রত্যহই ঘরে ঘরে বেঙের ছাতার মত মাসিকপত্র গজাইতেছে কেমন করিয়া? বাঙ্গালীর বই লেখা 'বাই' কমিবে, এমন শুভদিন কি আমাদের কখনও আসিবে?

---

* প্রবাহিনী ১৩২১—২০শে আষাঢ় পৃঃ ২৯৩-৯৪

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ওপর, তাঁহার গানের সুরের উপর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। এইখানে আমরা তাঁহার সহিত একটুও একমত হইতে পারি নাই। অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমিক হইলে তিনি খাড়াসুর বাঙ্গালায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না। কেন? খাড়াসুর চালাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কি এমন অপরাধ করিয়াছেন? সুরই হউক, আর ভাবই হউক, পরের জিনিস যদি আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে, তাহাতে দোষ কি হয়? ছাগমাংস আত্মসাৎ করিয়া উহা নিজে মাংসে পরিণত করা কি অন্যায় কার্য্য?

ভাষা ও রচনারীতি সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য বাঙ্গালী লেখকমাত্রেরই মেনে চলা উচিৎ। কথাগুলো আমাদেরই প্রাণের কথা। ইহার উপরে টীকা টিপ্পনি অনাবশ্যক।

৩৩) অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা, ভারত-সভার মত আরও অনেক দেশহিতৈষী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি সেরূপ একটি সংস্থা। 'গৃহস্থ' পত্রিকায় এই রাঢ় অনুসন্ধান সমিতির বিবরণ পাওয়া যায়।[১৯]

অক্ষয়চন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক হ'ল তাঁর হিউমারবোধ বা পরিহাস প্রিয়তা। সকলের কাছে তিনি কৌতুকামোদীরূপে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অতি ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে দিয়েও অতি সহজে তিনি হাস্যরসের অবতারণা করতেন। এই হাস্যরসের মধ্যে কোনরূপ আঘাতজনিত বিদ্রূপ বা নোংরামি থাকতো না, অনাবিল সংযত হাস্যরস তাঁর আলাপচারিতার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের হাস্যরসাত্মক ঘটনাসকল বাইরের দিক থেকে ক্ষুদ্রতুচ্ছ মনে হলেও, মানবমনে অতি সহজে তা গভীরভাবে রেখাপাত করতো। উদাহরণের সংখ্যা না বাড়িয়ে সামান্য দু'টি ক্ষুদ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই রসবোধের পরিচয় আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় এই হাস্যরস পরিবেশনে তাঁর জুরি মেলা ভার। এককথায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হাস্যরসিক।

প্রথম হাস্যরসের ঘটনাটি অক্ষয়চন্দ্রের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনাটি হল;—মেজছেলে অজরচন্দ্রের বিবাহ বিশ্বকোষ প্রণেতা

নগেন্দ্রনাথ বসুর কন্যার সঙ্গে। বিবাহ যদিও আষাঢ় মাসে, তথাপি দিনটি মোটেই সুখপ্রদ ছিলনা। অসহ্য গরমে সকলে প্রায় নাস্তানাবুদ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাড়া আর সব নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকই যথাসময়ে হাজির হয়ে পরস্পর গল্প গুজবে যখন মত্ত, ঠিক সেই সময়ে নট-নাট্যকার মোজা পায়ে এসে উপস্থিত হ'ন। তাঁর এরূপ আবির্ভাবে সকলে হকচকিয়ে যান। কিন্তু সাহস ভরে কেউ কিছু বলতে পারছেন না দেখে প্রথিতযশা সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন সোজাসুজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন,—'একি! আপনার পায়ে মোজা।' একথা শোনামাত্র গিরিশচন্দ্র কালবিলম্ব না ক'রে বলেন, এতে বিস্মিত হ'বার কি আছে? মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম আমাকে মোজা পায়ে দেখছেন। অক্ষয়চন্দ্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই দুই সাহিত্যিকের প্রশ্নোত্তর অতি কাছ থেকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনছিলেন। দীনেশচন্দ্র উত্তর দেবার আগেই অক্ষয়চন্দ্র গম্ভীর হ'য়ে বলেন,—'দেখেছি, তবে সে একপায়ে।' একথা শোনামাত্র গিরিশচন্দ্র হেসে অস্থির। কিন্তু উপস্থিত অন্যসব সাহিত্যিকরা এই ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক। অবশেষে দীনেশচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে অক্ষয়চন্দ্র বলেন, 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়কালে মাতাল নিমচাঁদের ভূমিকায় তিনি একপায়ে মোজা পরে, রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হ'ন। এই কথা শুনে বিবাহ—আসরে উপস্থিত সকলে না হেসে পারলেন না।

'করৌলী তীর্থভ্রমণ' উপলক্ষে তাঁর সরস মন্তব্য পরিহাসপ্রিয়তার নিদর্শন। দ্বারকা থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে এই তীর্থস্থান। এককা গাড়ী ছাড়া অন্য কোন যাবার বন্দোবস্ত নেই, পথ ও রাস্তা খুব ভাল না। সঙ্গে অচ্যুতচন্দ্র ও একজন ব্রাহ্মণ যাত্রী হওয়া সত্বেও, অনেকে তাঁকে যেতে নিষেধ করলে, অক্ষয়চন্দ্র প্রত্যুত্তরে বলেন; সঙ্গে পুত্র ও ব্রাহ্মণ আছে, শেষ কৃত্যের কোনই অসুবিধে হ'বেনা।

৩৮) ১৯১৭ সাল অক্ষয়চন্দ্রের জীবনের শেষ অধ্যায়। একদিকে যেমন এই বছরে তাঁর শেষ রচনা 'ভায়াদের ভ্রাতৃভবন ও ভ্রাতৃভাবনা' বঙ্গবাসী পত্রিকায় (মৃত্যুর দেড়মাস পূর্বে) প্রকাশিত হয়েছিল, অনুরূপভাবে জীবনরবি অস্তমিত হ'বার প্রাক্কালে ঘটেছিল কয়েকটি উল্লেখ্য ঘটনা। এই বছরে অচ্যুতচন্দ্রের রামকৃষ্ণপুরে (শিবপুরে)প্রথম চাকরি ও অক্ষয়চন্দ্রের প্রবাস জীবন এবং এখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শরৎচন্দ্রের আগমন। দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র উভয়েই অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের কথা এবং কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যের কথা আলোচনা করেন।

ঐ বছরের ২৬শে সেপ্টেম্বর অক্ষয়চন্দ্রের রামকৃষ্ণপুরের বাসা ত্যাগ এবং ট্রেনে জ্বরে আক্রান্ত হ'য়ে চুঁচুড়ায় প্রত্যাগমন।

৩৫) ১৯১৭ সালের (১৩২৪) ২রা অক্টোবর ৭১ বৎসর বয়সে বাংলা ভাষার অদ্বিতীয় সাহিত্যিক সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রথিতযশা সমালোচক 'আচার্য অক্ষয়চন্দ্র' তাঁর জন্মস্থান কদমতলা, চুঁচুড়ার বাড়ীতে মহাপ্রয়াণ করেন। এসময় 'তিথি ছিল তর্পণ পক্ষের তৃতীয়া'। এই মৃত্যুর বিবরণ দিতে গিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, 'তাঁহার মৃত্যুর সময় যে ঘটনা হয়, তাহা আরও করুণ হৃদয়গ্রাহী। অক্ষয়বাবুর পীড়া হয় শিবপুরে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর রক্ষা নাই। তাই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কদমতলার বাড়ীতে ফিরিয়া যান। তাঁহার পিতার যে ঘরে মৃত্যু হয়, সেই ঘরে তাঁহার বিছানা হয়। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি ইসারা করেন, বাবার যেখানে মৃত্যু হইয়াছিল এবং চিরন্তন হিন্দু নিয়ম অনুসারে যেখানে পেরেক পোতা ছিল, সেইখানে তাঁহাকে শোয়ান হয়। সেখানে শুইয়া সম্মুখে বাবার ছবি টাঙ্গান ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে তাঁহার শিবচক্ষু হয়।"[১০]

৩৬) অক্ষয়চন্দ্রের এই মৃত্যু সংবাদ সে যুগের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সকলেই আবেগপূর্ণ ভাষায় এই মহামানবের প্রতি তাঁদের-শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। 'অর্চনা', 'বঙ্গবাসী', বাঙ্গালী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা ব্যতিরেকেও অমরেন্দ্রনাথ রায় (ভারতবর্ষ ১৩২৪, পৃঃ-৯২১-২৩) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য খ্যাতনামা সাহিত্যক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (নায়ক ১৩২৪, পৃঃ-১১২) তাঁদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে এই নিরহঙ্কার, সদাশিব, অজাত-শত্রুর প্রতি গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

'অর্চনা' (কার্তিক ১৩২৪) পত্রিকায় শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র 'পরলোকে অক্ষয়চন্দ্র' নামে একটি প্রস্তাব লেখেন। তার কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য।

> বাঙ্গালা সাহিত্যের আর একটী স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। বঙ্কিম-যুগের প্রতিষ্ঠাবান লেখক ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আর নাই। বিগত ১৬ই আশ্বিন রাত্রি ২টা ৫৫মিঃ সময় বঙ্গসাহিত্যের এই উজ্জ্বল ভাস্কর পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।
>
> বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্রের এমন কিছু অক্ষয়কীর্তি নাই যাহা তাঁহাকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখিবে। তবে একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে

স্বীকার করিবেন যে, তাঁহার ন্যায় সাহিত্যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, স্পষ্ট-বাদিতা আজকালকারদিনে দুর্লভ। তাঁহার গুণাবলীর আদর্শে আধুনিক সাহিত্যসেবীগণের চরিত্র গঠন হইলে বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

'বঙ্গবাসী' ও 'বাঙ্গালী' পত্রিকার আলোচনাও ঐতিহাসিক মূল্যায়নের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

১৮৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে চুঁচুড়ার বাটীতে তাঁহার জন্ম হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। ইনি খ্যাতনামা সদরালা স্বর্গীয় রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুরের একমাত্র পুত্র। ইঁহার শিক্ষা-দীক্ষা স্কুল কলেজে যথারীতি হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইনি পিতার কাছেই শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বলিতে কি, ইনি বাল্যকাল হইতে পিতার কাছে সঙ্গীভাবে থাকিতেন এবং পিতা হইতেই বঙ্গভাষার প্রতি ভক্তি ও প্রীতি তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সংসর্গও ইঁহার চরিত্র গঠনের সহায়তা করিয়াছিল।*** প্রবীণ বয়সে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজ বিষয় অবলম্বন করিয়া 'সনাতনী' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ তাঁহার চিন্তাশীলতার অক্ষয় নিশান। ইহার পূর্বে তিনি 'আলোচনা' নামক প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক গ্রন্থে ইনি 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে ইঁহার পিতার ও ইঁহার নিজের জীবনকথা আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারই লিখিত 'চন্দ্রালোকে' নামক এক প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র আদর করিয়া তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তরে' গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া অযাচিতভাবে তাঁহাকে বি. এ পরীক্ষার বাঙ্গালা পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লর্ড লিটনের প্রথম দিল্লী দরবারে ইনি সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে গবরমেণ্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দরবারে গিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র পুস্তকাদি বেশী কিছু না লিখিলেও, তাঁহার মত 'সাহিত্যিক' আর নাই বলিলেই হয়।---বঙ্গবাসী

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একে একে সকলেই ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন ; —রহিলেন মাত্র জরাজীর্ণ দেহ লইয়া বৃদ্ধ চন্দ্রশেখর। অক্ষয়চন্দ্রকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। বঙ্কিমের অন্যান্য সহচরগণ অবসরমত সাহিত্য সেবা করিতেন। কেবলমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্য সেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম করিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের তিনি সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে' তিনি যে সমালোচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমের সমালোচন শক্তির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। অনেকে অনেক সময় তাঁহার লেখাকে বঙ্কিমের লেখা মনে করিয়া ভুল করিত। সাহিত্য সমালোচনার মধ্যে তেমন করুণ কঠোর কশাঘাত করিতে এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তখনকার কালে আর কেহ তাহার সমতুল্য ছিলেন না। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ সমালোচক বাঙ্গালাদেশে আর একটী হইয়াছে কি না সন্দেহ। অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্যায় দেখিলেও তিনি তাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। আবার পরম শত্রুর সুখ্যাতির কিছু পাইলেও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী লেখক এখন অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ লেখক এখন একটীও দেখিতে পাই না। —বাঙ্গালী

'মানসী ও মর্মবাণী'—তে সাহিত্য-সমাচার অংশে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয়েছিল ; —'বঙ্গসাহিত্যের আজীবন একনিষ্ঠ সেবক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বিগত ১৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার শেষরাত্রে, তদীয় চুঁচুড়া কদম-তলার বাটীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বক্ষে ধারণ করিয়া 'মানসী' মাঝে মাঝে গৌরব লাভ করিয়াছিল। 'সেকালের কথা' নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক রচনা তিনি 'মানসী'র জন্য লিখিবেন, ইদানীং এইরূপ আশ্বাস তিনি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, কিন্তু "বলীয়সী কেবলমিশ্বরেচ্ছা।"[২১]

'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর খবর শুনে আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে মন্তব্য করেছিল, "ভারতবর্ষের শেষ ফর্মা যখন ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, তখন সংবাদ পাইলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৃদ্ধসেবক, সাহিত্যরথী আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আর ইহজগতে নাই ; এতদিনে সত্যসত্যই আমাদের একজন অকৃত্রিম অভিভাবক ও একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক চলিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য চিরঋণী। ভগবান শোকসন্তপ্ত পরিবারের গভীর শোকে সান্ত্বনা দান করুণ।"[২২]

অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পরে একটি স্মরণ প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন ;—

> অক্ষয়বাবুর সমালোচনা খুব তীব্র ছিল, সে সমালোচনার ঘায়ে অনেককেই ছটফট করিতে হইত। আমি একবার তাঁহার হাতে পড়িয়াছিলাম। আমি বঙ্গদর্শনে 'কাঞ্চনমালা' নামে একটী গল্প লিখি। ভাষা যতদূর সোজা করিবার, তাহা করি ; কিন্তু একজায়গায় একটা গভীর রাত্রির বর্ণনা করিতে গিয়া কথকদের একটা চূর্ণী চুরি

করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। সেটা এই, "ঘোরা দ্বিপ্রহরা যামিনী কুমুদবনাহ্লাদিনী শান্ত নলিনী ঝিল্লীরব মুখরিতা পেচককুল কলরব উদ্ঘোষিণী, তখন শাট্যঞ্চলে বদনাবগুণ্ঠনকরত অভিসারিকাকুল আপনাপন প্রেমপাত্রের নিকট গমন করিতেছেন।" অক্ষয়বাবু প্রবন্ধটির সমালোচনা করিলেন—ভাষাটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার কিন্তু মাঝখানে একি কক্কড় কক্কড় কড়াৎ। আমি পড়িয়া হাসিলাম, মনে হইল, অক্ষয়বাবু বোধ হয় কথকতা ভাল করিয়া শুনেন নাই। নইলে কথকের চূর্ণী তিনি ধরিতে পারিলেন না কেন? কথকের চূর্ণীগুলিকে আমি বাঙ্গালী ভাষার অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া মনে করি। তাল ও লয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে হাজার হাজার লোক মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার পর অক্ষয়বাবুর "পিতাপুত্র" পড়িয়া দেখিলাম, তিনি বাঙ্গালার সব রকম সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন। কীর্ত্তন গান, খেমটা, ঢপ, যাত্রা, কবি, পাঁচালি, সকলের কথা, কিন্তু কথকতার কথা নাই।"[২৩]

৩৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অক্ষয়চন্দ্রের সম্মানার্থে একটি 'স্মৃতিরক্ষা' সমিতি স্থাপন করেছিল। পরিষদ-পত্রিকা থেকে তার বিবরণ উদ্ধৃত করা হ'ল।

ধ) "আচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি সমিতি—

আলোচ্য বর্ষে এই স্মৃতি সমিতি অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র প্রস্তুত ও বার্ষিক পদক দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহে লিপ্ত আছেন। আনন্দের বিষয়, এই স্মৃতি সমিতির সম্পাদকের পদ শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যকুশলতায় এই কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে, এরূপ আশাকরা যায়। এই ভাণ্ডারে ১৩২৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ২০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।"[২৪]

ঐ সংখ্যাতেই পরিশিষ্ট' লেখা হয়:

পরিশিষ্ট—মেদিনীপুর শাখা—১৩২৪

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্যবর্ষে ৭টি অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১টি ৺সারদাচরণ মিত্রের ও ১টি ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।[২৫]

পাদটীকা

১) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯
২) বঙ্গভাষার লেখক (১ম)—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃ:-৪৮৯
৩) ঐ ঐ পৃঃ-৪৮৬
৪) ঐ ঐ পৃঃ-৪৮৭
৫) ঐ ঐ পৃঃ-৪৯৩
৬) ঐ ঐ পৃঃ-৫০৩
৭) ঐ ঐ পৃঃ-৫৩০
৮) অ. সা. স (প্রথমার্ধ) পিতাপুত্র, পৃঃ-৭৪
৯) বঙ্গদর্শন—১২৮১ (বিজ্ঞাপন)
১০) A Nation in Making—S. N. Banarjee Page-42
১১) Latest News and Notes—The Hindoo Patriot 1888 Nov' 12 Monday Page-534
১২) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯
১৩) হারাধন দত্ত, "বঙ্গবাসী, কৃষ্ণচন্দ্র, দেশ ও কাল" ১৩৭২ পৃ ঃ-২২
১৪) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ) পরিচিতি পৃ ঃ-৯
১৫) ঐ ঐ পৃ ঃ-৩৪
১৬) ঐ পিতাপুত্র পৃ ঃ-৫৫
১৭) বঙ্গভাষার লেখক (১ম)—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃ ঃ-৫৫৮
১৮) অর্ঘ, তৃতীয় কল্প-১০ম খণ্ড ১৩২০ পৃ ঃ-২৫৭
১৯) গৃহস্থ, ষষ্ঠ খণ্ড অগ্রহায়ণ ১৩২১ পৃ ঃ-২০৭-০৮
২০) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯
২১) মানসী ও মর্মবাণী ২য় খণ্ড কার্ত্তিক ১৩২৪ পৃ ঃ-৩৬০
২২) ভারতবর্ষ, ৫ম খণ্ড কার্ত্তিক ১৩২৪ পৃ ঃ-৭৯২
২৩) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯
২৪) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ ১৩২৬ ৩য় সংখ্যা পৃ ঃ-২৮
২৫) ঐ পৃঃ-৬৪

অক্ষয়চন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী

'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯) কেবল একটি সাময়িক-পত্র নয়, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর আত্মদর্শন। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বেই বেশ কয়েকটি উন্নত পর্যায়ের সাময়িক পত্র প্রকাশিত হ'য়েছে। এগুলির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র-রামগোপাল ঘোষ-রসিককৃষ্ণ মল্লিক-দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটার' 'জ্ঞানান্বেষণ', রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ',—'রহস্য সন্দর্ভ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত ১৮৩১ সালে 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সাময়িকপত্র সাংবাদিকতা থেকে মুক্তি পেল। দ্বিতীয় বর্ষ বঙ্গদর্শনে (১২৮০, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত হয় 'পাঠক পড়ান ব্রত', তার আগে 'লেখক পড়ানো ব্রত' নিষ্পন্ন করেছে প্রভাকর। প্রভাকরেই 'পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী' ভাবধারার সম্মিলন ঘটে। তিনি একই আসরে 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সদস্যবৃন্দ এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকদের মিলিয়েছেন।

'বঙ্গদর্শন' অনেকাংশে সেই আদর্শ আত্মস্থ করেছে। তবু একথা স্মরণীয়, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রথমশ্রেণীর কোন প্রতিভাধর লেখক এর পূর্বে সাহিত্য-পত্র সম্পাদনায় ব্রতী হননি।

বঙ্কিম যে লেখকগোষ্ঠীর ওপর ভরসা করে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেন, তাঁর মধ্যে আছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭), জগদীশনাথ রায় (১৮২৫-৮৭), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬), গঙ্গাচরণ সরকার, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-৫৮), তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪১-৮৯) প্রভৃতি। এই গোষ্ঠীর মধ্যে তরুণতম সদস্য ছিলেন গঙ্গাচরণ—পুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার। প্রথমবর্ষ প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্রের 'উদ্দীপনা'। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন ;—"ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা—নানাপুস্তক ঘাঁটিয়া আমি 'উদ্দীপনা' প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুসি। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায়, আমার সেই প্রবন্ধের টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিমবাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল।"[১]

এছাড়া 'গ্রাবু' (১২৭৯ আষাঢ়), 'তুলনায় সমালোচন' (১২৮০ বৈশাখ), 'দশমহাবিদ্যা' (১২৮০ আশ্বিন), এবং কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত 'চন্দ্রালোকে' (১২৮০ ফাল্গুন) অক্ষয়চন্দ্রের রচনা কৃতিত্বের পরিচায়ক।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্রের অভিমত ;—'যেদিন বঙ্কিমবাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিলেন, সেইদিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল ; উন্নতির স্রোত তর্‌তর্‌ বেগে ছুটিতে লাগিল ; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল ; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দরসে গলিয়া গেল ; বঙ্কিমবাবু হইতেই বঙ্গবাসিগণ 'সক্‌' করিয়া বাঙ্গালা বই পড়িতে শিখিয়াছে।"[২]

সমালোচক বঙ্কিম অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-৮৯) সঙ্গে তাঁর মতান্তর এবং পশুপতি সম্বাদের (বঙ্গদর্শন ১২৯০ কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা) প্রতিবাদে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তিক্ততা সর্বজনবিদিত। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক-বদল হ'য়েছে, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে চিরকাল যোগসূত্র ছিল। অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী' বেশ কিছুকাল কাঁঠালপাড়া বঙ্গদর্শন-যন্ত্রে ছাপা হ'ত। বঙ্কিমচন্দ্র যে অক্ষয়চন্দ্রের মতামত ও রচনাভঙ্গীর অনুরাগী ছিলেন, তার একটি বড় প্রমাণ 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' লেখার দায়িত্বে তিনি দ্বিতীয় বর্ষ (১২৮০) কার্তিক সংখ্যা থেকেই অক্ষয়চন্দ্রকে অর্পণ করেন। তাঁর সমালোচিত নিম্নলিখিত বইগুলি উল্লেখযোগ্য।

১। জয়দেব রচিত—রজনীকান্ত গুপ্ত
২। লীলাবতী—বীরেশ্বর পাড়ে
৩। গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু—মীর মোসারফ্ হোসেন
৪। ভারতমাতা—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। হেমলতা নাটক—হরলাল রায়
৬। অমরনাথ নাটক—কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী
৭। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—দক্ষিণারঞ্জণ চট্টোপাধ্যায়
৮। ইউরোপের তিন বৎসর—রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। তীর্থমহিমা নাটক—নিমাই চাঁদ শীল
১০। বঙ্গভূষণ কাব্য—রাজকৃষ্ণ রায়
১১। বেহুলা লখীন্দর—ভগবৎচন্দ্র বিশারদ
১২। বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য—রামকুমার নন্দী

১৩। রামোদ্বাহ নাটক—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪। চিত্তবিনোদ কাব্য—ঈশানচন্দ্র বসু

১৫। ভারতে যবন —কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন ধর্মীয় ও নৈতিক প্রেরণা বঙ্কিমের মনকে অধিকার করলো, তখনই 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করে তিনি 'প্রচার' (১৮৮৪) সম্পাদনায় উদ্যোগী হ'ন। সেখানেও 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের সহযোগীরূপে উপস্থিত।

বহরমপুর জজকোর্টে একটি নবরত্ন সভা বসতো। সেই নবরত্ন সভাতেই অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত। কোর্ট সংশ্লিষ্ট এই সাহিত্যসভা থেকেই বঙ্কিম অক্ষয়চন্দ্রকে যথার্থ চিনতে পারেন। 'পিতাপুত্র' গ্রন্থে (১৩১১) এই সভার বিবরণ আছে। 'এই সভার বিক্রমাদিত্য ছিলেন জজসাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্যামাচরণ ভট্ট—বেতাল ভট্ট। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন (জাতিতে বৈদ্য সুতরাং)—ধন্বন্তরি। বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলী—ক্ষপণক। বোধ করি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া. তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্বনাম প্রসিদ্ধ গুরুদাসবাবু তখন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন ; অবশ্য ওকালতীও করিতেন। তিনি ছিলেন—বররুচি। আর পিতৃদেব—কালিদাস।"[৩] অক্ষয়চন্দ্র এই সভার "রাক্ষস"। তিনি সমস্যা দিতেন, 'নবরত্ন' পূরণ করতেন।

'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) পাঠ করে অক্ষয়চন্দ্র মনে মনেই বঙ্কিমের অনুরাগী হ'য়ে উঠেছিলেন। আইনের ক্লাশে বঙ্কিমের সাক্ষাৎ পেলেও তখন অন্তরঙ্গতা হয়নি। কাজের উপলক্ষে বহরমপুরে যে বিদ্বজ্জনসমাগম হ'য়েছিল, তারই চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল বঙ্কিমের আবির্ভাবে। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের উপযুক্ত একটি বাড়ীর সন্ধান করেছিলেন। তাঁর নিজের বিবৃতি ঃ—"আমি জনান্তিকে দুই এক-কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর এইভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না ; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে,—কাদামাখা সার হ'ল মোর, মাছ ধরা হ'ল না।"[৪]

পরে নলহাটী ষ্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ আলাপ হয়। অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "শুভক্ষণে, অতিশুভক্ষনে, বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন।"[৫] এই আলাপ সাধারণ প্রসঙ্গ থেকে ক্রমে গভীরতর সাহিত্যবিষয়ে সঞ্চারিত হয়। তাতেই অক্ষয়চন্দ্রের সুপ্ত প্রতিভাকে বঙ্কিম

চিনতে পেরেছিলেন। সেই আলাপচারিতার ফল বঙ্গদর্শনে দেখা দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত 'বঙ্গদর্শন' পরিকল্পনা পর্বের আর একজন লেখক—রামদাস সেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। বহরমপুরের "গ্রাণ্টহল ক্লাব" ও "মুর্শিদাবাদসভা"—দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই তিনি ছিলেন প্রাণকেন্দ্র। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ; —"তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে।" অক্ষয়-চন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গদর্শন সূত্রেই রামদাস সেনের বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। অবশ্য স্বাধীনচেতা অক্ষয়চন্দ্র সেজন্য রামদাসের গ্রন্থ সমালোচনায় লেখকের ত্রুটি প্রদর্শনে বিরত হ'ননি। 'ঐতিহাসিক রহস্য'র সমালোচনা সাধারণীতে (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ পৃঃ-৫৬-৫৭) প্রকাশিত হ'য়েছিল। পরবর্তী সংখ্যায় অবশ্য রামদাসের বক্তব্যও স্থান পায়।

বঙ্গদর্শনের অপর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রামদাস সেন একই বিষয় * নিয়ে ভিন্নমত পোষন করেছেন। কিন্তু তাতে উভয়ের মধ্যে কোন মনান্তর হয়নি। অক্ষয়চন্দ্র তাঁর সাধারণীতে সমকালীন সব লেখকেরই বই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এমন সরস এবং অনসূয় ছিল তাঁর মন্তব্য, যে সমালোচিত লেখক কখনও আক্রান্ত বোধ করেননি। 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িকবৃত্তান্ত' (১২৮০-৮২) গ্রন্থের লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠোদ্ধার চেষ্টা এবং অক্ষয়চন্দ্রের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্তার পাঠ নির্ণয়ে উৎসাহ জাতীয় চৈতন্য-উন্মেষেরই পরিচয় দেয়। বঙ্গদর্শনের অন্যতম গবেষক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা 'এডুকেশন গেজেটে' সমালোচিত হ'লে অক্ষয়চন্দ্র খুবই ব্যথিত হ'ন। সেকালের 'গেজেট' বনাম 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র বিরোধে অক্ষয়চন্দ্র পরিষৎ পত্রিকার পক্ষ গ্রহণ করেন। তাঁর বক্তব্য ; "কেবল সাহিত্যের এবং ন্যায়ের অনুরোধে, আমি পত্রিকার পক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য'। * * * বিশেষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া কৃত্তিবাসের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কৃত্তিবাস, যে বাঙ্গালার আদি কবি এবং প্রায় পাঁচশত বৎসরের সময়ের লোক, তাহা একরূপ সংস্থাপনই করিয়াছেন—তাঁহার দোষ আছে বটে,

---

* যেমন-'শ্রীহর্ষ' সংস্কৃত কবি-প্রসঙ্গ।

তিনি চিরকালই লিখিতে লিখিতে বাঙ্গালার লেখকগণকে গালি দিয়া বসেন, কিন্তু তা বলিয়া, তাঁহার এবারকার মহতী চেষ্টার কি প্রশংসা করিতে হইবে না? না, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে না? যে কেঁড়ে ভরা দুধ দেয়, সে নহে একদিন একটা চাট্ মারিলই, তা বলিয়া কি তাঁকে গো-বাড়ান্ ঠেঙ্গাইতে হইবে? গেজেটের এ ভঙ্গি ভাল নহে।"[৬]

বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের 'জয়দেব' বিষয়ে মনোভাব ও অক্ষয়চন্দ্রের 'জয়দেব' (১২৯৩)-ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক। বঙ্কিম জয়দেবকে অগভীর এবং বায়রণের সঙ্গে তুলনীয় মনে করেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের ধারনা; —"বৈষ্ণবতত্ত্বের পরিণাম-শৃঙ্খলায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ মহাশৃঙ্খল। *** ইহাতে রাধাকৃষ্ণের রহস্য-কেলি নির্দিষ্ট বস্তু; তাহাতে হ্লাদিনীময়ী মহাপ্রকৃতিতে 'রসো বৈ সঃ' মহাপুরুষের নিত্য অনন্ত অবিরাম লীলা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। *** ভগবানের মাধুর্যময় ঐশ্বর্য-লীলা-বর্ণনই গীতগোবিন্দ।"[৭]

১২৯১ সালের পৌষ সংখ্যা 'প্রচারে' বঙ্কিম লেখেন 'লডরিপণের উৎসবের জমা খরচ'। ঐ বছরের ঐ সংখ্যাতেই 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয় অক্ষয়চন্দ্রের 'লর্ডরীপন'। বঙ্কিম জমাখরচ হিসেবের শেষে মন্তব্য করেছেন, "সে যাহাই হৌক, খরচের অপেক্ষা জমা যে বেশী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খরচগুলি ছোট ছোট, লাভগুলি বড় বড।"[৮] অক্ষয়চন্দ্রও 'জমা'র কথাই বিশ্লেষণ করেছেন। বোধ হয় রিপণের ব্যক্তিত্ব ও শাসনকালের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে অক্ষয়চন্দ্রের দক্ষতা অনেক বেশি ধরা পড়েছে। "প্রকৃত মানুষ যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখে সেইখানেই পূজা করে, প্রশংসা করে—উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখিয়াছি।"[৯]

বঙ্গদর্শনের তরুণ লেখক হরপ্রসাদশাস্ত্রী লিখেছেন; "বঙ্গদর্শনে যাঁহারা বঙ্কিমবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সকলেই উৎকৃষ্ট লেখকশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। *** বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, সাধারণীর সম্পাদক, বঙ্গদর্শনে তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে।"[১০]

বঙ্গদর্শনের এই দুই সমালোচকের রসবোধ যেমন গভীর, সূক্ষ্মসমালোচনা-শক্তিও তেমনি প্রখর। দু'জনেই দু'জনের রচনার গুণগ্রাহী, অথচ একের রচনার ত্রুটি অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সারস্বত সৌহৃদ্যের এরূপ দৃষ্টান্ত একালে বিরল।

বঙ্কিম-সুহৃদ হেমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে নিয়মিত কবিতা লিখতেন। হেমচন্দ্রের

মৃত্যুর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কবির একটি জীবনী প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, দায়িত্ব দেওয়া হয় বঙ্গদর্শনের অন্যতম লেখক, তখন বিশেষ প্রবীণ, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে। তারই ফল 'কবি হেমচন্দ্র' (প্রকাশকাল ১৫ই মার্চ ১৯১২)।[১১]

কবি হিসেবে যদিও অক্ষয়চন্দ্রের প্রবণতা ছিল পয়ারের দিকে, তবু মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের তুলনায় তিনি মধুসূদনের কাব্যোৎকর্ষ চিনতে ভুল করেননি। "বীরকাব্যে হেমচন্দ্র সকল অনুকারীর ন্যায় ওস্তাদের নিম্ন স্তরে। প্রসাদগুণে হেমচন্দ্র পূর্ববর্তীদিগের নিম্নে; একালবর্তী 'শিক্ষিত' মধুসূদনেরও নিম্নে।"[১২]

অক্ষয়চন্দ্র বৃত্রসংহারের শচী-চপলার সংলাপের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা-সরমার কথোপকথন উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করেছেন। রুদ্রপীড় পতনে বৃত্রের বিলাপ ও প্রমীলার সহমরণ দৃশ্যে রাবণের বিলাপের তুলনা করে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "তুলনা করুন; নিশ্চয়ই দেখিবেন, ওস্তাদ মাইকেল ওস্তাদি বজায় রাখিয়াছেন।"[১৩]

চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল ছিল। হিন্দু-ধর্মের নব-উত্থানে দু'জনেরই বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে আহূত একটি সভায় (১৮৮৭) অক্ষয়চন্দ্র 'হিন্দুর পরিণয় প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন, নবজীবনে প্রকাশিত হয় 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)। অক্ষয়চন্দ্র এ বিষয়ে মূলতঃ লোকাচারপন্থী। লক্ষণীয় যে, বঙ্কিমও এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মতের সমর্থক ছিলেন না। চন্দ্রনাথ বসুর 'কঃ পন্থা' (১৮৯৮), 'সাবিত্রীতত্ত্ব (১৯০০), 'হিন্দুত্ব' (১৮৯২) 'হিন্দু বিবাহ' (১৮৮৭) প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয় সনাতন হিন্দুশাস্ত্র সম্মত লোকাচার ব্যাখ্যা। চন্দ্রনাথ নিজেকে 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য' বলেছেন। অর্থাৎ পারিবারিক ও আচার প্রবন্ধের লেখকভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গী চন্দ্রনাথ বসুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অক্ষয়-চন্দ্রের লেখায় স্পষ্টত ভূদেবের উল্লেখ না থাকলেও সামাজিক বিষয়ে তিনিও অনুরূপ সনাতন মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবু অক্ষয়চন্দ্র—চন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ে একটি সমস্যা আজও রয়ে গেছে। 'সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা' নামে একটি রম্য প্রবন্ধ অক্ষয় রচনাসম্ভারে (প্রথমার্ধ) স্থান পেয়েছে। আবার চন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলীতেও আছে। উভয় লেখকের বন্ধু-পরিজন বা বংশধরেরা এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা করা হয়নি। যেহেতু সামাজিক ব্যাপারে ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম ছিল

এবং উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বও ছিল। সুতরাং পরস্পরের আলোচনা সূত্রেই হয়তো প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়েছিল। এ বিষয়ে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মত—রচনাটি চন্দ্রনাথ বসুর (বাংলা সমালোচনা পরিচয় ১৩৭৬ পৃঃ—১০৩)

বঙ্কিমের কমলাকান্ত ভঙ্গি অনুসরণে চন্দ্রনাথের চেয়ে অক্ষয়চন্দ্রের কৃতিত্ব অনেক বেশি ছিল। তার একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে।

'রজনী'তে বঙ্কিম ললিত লবঙ্গলতার গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

> "ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিনী, গৌরবের গৌরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিনী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্ল্যানেল, আরোগ্যে সুরুয়া।" (রজনী—২য় পরিচ্ছেদ)

এর সঙ্গে তুলনীয় অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণীর চেণাচুর' ;—

> "রামসদয় আবার ললিত—লবঙ্গলতার পক্ষে কেমন ? তিনি তাঁহার সিন্দুকের সোনার বাউটি, বিছানার পাশ বালিশ, পানের লবঙ্গ, গেলাসের সরবৎ। তিনি কম্পজ্বরে পৃষ্ঠচাপ, জল কাসিতে চুপ্‌চাপ, বাতে সুবন্ধন, আরোগ্যে সুরন্ধন।" (সাধারণী ১২৮১)

এই 'সুখের হাট ও সৌন্দর্যের মেলা' প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি কমলাকান্তের 'আমার মন'-কে স্মরণ করায় ;—

> "এমন যে অসীম অনন্ত অপূর্ব সুখের হাট এবং সৌন্দর্যের মেলা খোলা রহিয়াছে, ইহাতেও প্রবেশ করিতে পারিব না,—সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরিব, অসুখেই কাল কাটিবে ?"[১৪]

এছাড়া অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'জন্তুধর্মী মানব' (নবজীবন, জৈষ্ঠ ১২৯৩) প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'বার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রনাথ বসু প্রত্যুত্তরে লেখেন 'দেবধর্মী মানব' (নবজীবন, আষাঢ় ১২৯৩)। বিপরীতধর্মী প্রবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও চন্দ্রনাথ বসু কোথাও লেখকের ওপর আক্রমণ করেননি। বরং অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধটিতে

মানবমনের যেরূপ বিশ্লেষণ আছে চন্দ্রনাথের রচনায় তারই মহত্তম দিকটি আলোচিত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র যেরূপ তিনটি পর্যায়ে মানবস্বভাবের চরিত্র তুলে ধরেছেন, চন্দ্রনাথও পর্যায়ক্রমে ভিন্ন আলোকে তারই প্রত্যুত্তর বা আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। প্রসঙ্গত চন্দ্রনাথের উক্তি ;—"মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশু-ধর্মও বুঝা চাই, দেবতা ধর্মও বুঝা চাই। গতবারের নবজীবনে পাঠক পশু বা জন্তু-ধর্মী মানব দেখিয়াছেন। এবার তাঁহাকে দেব-ধর্মী মানব দেখাইব। জন্তু-ধর্মী মানবের ন্যায় দেব-ধর্মী মানবও নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির।" (অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, শেষার্ধ, পৃঃ— ৮৬৭)

অক্ষয়চন্দ্র প্রবন্ধের সূচনাংশেই বলেছেন, মানুষের পশু-ধর্মী মনোভাব যে প্রায় জন্ম-সূত্রেই প্রাপ্ত, তা বিদ্যাসাগর রচিত 'বোধোদয়' পাঠে এবং নর-নারীর দাম্পত্যজীবনেই সুপরিস্ফুট। অতএব "মনুষ্যের পশুত্ব—এখন ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কাজেই স্বদেশী-বিদেশী মহামহা পণ্ডিতগণের নির্দেশ-অনুসারে, আর পিতামহীর প্রখর দূতীত্বে অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, আমরা একরূপ জন্তু-বিশেষ,—আমরা নিতান্ত পশু-ধর্মী। * * * জন্তু নানাবিধ ; মনুষ্য-জন্তুও নানাবিধ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য-জন্তু আছে।" (ঐ, পৃঃ ৫১০)

এরপর লেখক শুক পাখীর সঙ্গে সৌখীন মানুষের, বিড়ালের সঙ্গে স্বার্থান্বেষী মানবের এবং সাপের মত ক্রুর-স্বভাব মানবের যে পৃথিবীতে অভাব নেই, তাই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনের আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বঙ্কিমবাবুর কলুটোলার বাসভবনে এবং ক্রমে তা গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হ'য়েছিল। 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর একটি প্রবন্ধ অক্ষয়চন্দ্রের দ্বারা* পরিমার্জিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। তারাপ্রসাদ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য ; 'বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য সঙ্গত হয়। * * * মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসাতের ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।'[১৫]

'আর্যধর্মের ভাবীরূপ' (নবজীবন ১২৯২, মাঘ, চৈত্র) তারাপ্রসাদের উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ। রচনাটি দীর্ঘ হ'লেও এতে লেখকের চিন্তাশক্তির পরিচয় সুস্পষ্ট।

---

* 'আর্যধর্মের ভাবীরূপ' সম্পূর্ণভাবে তারাপ্রসাদবাবুর নহে, উহাতে আমার যৎসামান্য সংস্রব আছে। —নবজীবন সম্পাদক, ১২৯২ চৈত্র।

প্রবন্ধটিতে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সনাতনী' (১৯১১), বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও কোঁতের 'ধ্রুববাদ'—এই তিনের আদর্শ সমন্বয়ে সনাতনধর্মের নব-ভাষ্য আলোচিত হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন, বঙ্কিম-অক্ষয় যেমন শশধর তর্কচূড়ামণির (১৮৫১-১৯২৮) অন্ধ প্রাচ্য-গোঁড়ামি থেকে মুক্ত ছিলেন তেমনি তারাপ্রসাদ শশধর তর্কচূড়ামণির অন্ধ-প্রাচ্য-গোঁড়ামিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। তারাপ্রসাদের প্রতিবাদে লেখনী ধরেন নীলকণ্ঠ মজুমদার।[১৬] নীলকণ্ঠ বাবুর জবাবে নবজীবন—সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র লেখেন [১৭]:—

১) "ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে * * * শিক্ষাবিভ্রাট।"
এই লেখায় এমন বুঝায় না, যে, লেখক মনু ও বেদ-
ব্যাসের উপদেশকে শিক্ষাবিভ্রাট বলিতেছেন। বরং
"আমরা অধঃপাতে যাইতেছি না" ইহাই প্রতিপন্ন
করিতে তারাপ্রসাদবাবু যখন বিশেষ যত্নশীল,
তখন ইহাই বুঝা উচিত যে ঐ শিক্ষাকে তিনি
শিক্ষা বিড়ম্বনা বলেন না।

২) মনু এবং বেদব্যাস সম্বন্ধে তারাপ্রসাদ বাবু
প্রবন্ধের অন্যত্র বলিয়াছেন। —"মনুর প্রতি
আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের
আদি শিক্ষাগুরু। মনু ও বেদব্যাসের ন্যায় মহাপুরুষ
এই পৃথিবীতে অত্যল্প জন্মিয়াছেন।" নীলকণ্ঠবাবু
কি এটুকু লক্ষ্য করেন নাই ?

৩) "যাহা হোক, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা
আর কিছু না শিখি ইত্যাদি।" ঐ "যাহাই
হোক" পদটি থাকাতে বুঝা যায়, সে যাহাই
হোকের পূর্বের কথাগুলি, লেখকের প্রতিপাদ্য বা
উদ্দেশ্যব্যঞ্জক নহে, পরের কথাগুলিই—অর্থাৎ
পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সফলতা প্রদর্শনই—লেখকের প্রতিপাদ্য।

বঙ্গদর্শনের অন্য লেখকদের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। অন্য সকলেই ছিলেন নানা পেশায় যুক্ত, সাহিত্য চর্চা তাঁদের স্বভাবগত প্রেরণার ফল। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের কোন পেশা ছিল না; অল্পকাল ওকালতীর পর তিনি মাতৃসেবা ও সারস্বতব্রতেই আত্মনিয়োগ করেন। মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের

(১৮৫৮-১৯৩২) উক্তি যথার্থ ; "বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গদের মধ্যে, অক্ষয়চন্দ্রই যেন, আমার মনে হয়, সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ছিলেন। তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আর সকলেই অবসরমত সাহিত্যসেবা করিতেন। একমাত্র অক্ষয়চন্দ্রই সাহিত্যসেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য একসময়ে অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের প্রধান সহায় হইয়া উঠেন।"[১৮]

বঙ্গদর্শনের আর কোন লেখক পাশাপাশি আর একটি পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনায় সাহসী হ'ন নি। কেবল বঙ্গদর্শনে নিবন্ধ প্রকাশ করা নয়, অক্ষয়-চন্দ্রের দেশ, জাতি ও সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে নিজের কিছু বক্তব্য ছিল। সেই বক্তব্য প্রকাশের তাগিদেই প্রথমে 'সাধারণী', পরে 'নববিভাকরের সঙ্গে সংযুক্ত সাধারণী' এবং 'নবজীবন' বার করেন। 'সুবোধিনী'র সহায়তাও এই সূত্রে আলোচ্য। উক্ত পত্রিকা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য ; "সুবোধিনী', সূতিকগারে, যখন রক্তমাংসের ডেলার মত,—উহাকে কেহ দেখে না, ছোঁয়না, তখন আমি উহাকে লাটা-ঘাঁটা করিয়াছি। এখন বেশ ডাগর ডোগর হইয়াছে, দশজনে কোলে-পীঠে করিতেছে, আমার আহ্লাদ হইবারই কথা। * * * আশীর্বাদ করি—বালিকা যেন কলহপ্রিয়া না হইয়া আমোদপ্রিয়া হয়, মুখরা না হইয়া সুভাষিণী হয়, আলু-থালু না হইয়া, যেন কোমলা ও সরলা হয়।"[১৯] এই পত্রগুলিতে মূলতঃ অক্ষয়চন্দ্রের সাংবাদিক সত্তার এবং বঙ্গদর্শনে তাঁর সাহিত্যিক সত্তার পরিচয় বিধৃত।

পাদটীকা

১) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ) পিতাপুত্র পৃ ৫০
২) ঐ, ঐ পৃ ৫৯
৩) বঙ্গভাষার লেখক—(১ম) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃ ৫৩৭
৪) ঐ, ঐ পৃ ৫৪৩
৫) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ) পৃ ৪৯
৬) পূর্ণিমা ১৩০৪, ৫ম বর্ষ পৃ ২৯৬-৯৮
৭) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ) 'জয়দেব' পৃ ১৩৭-৩৯

৮) বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড (শেষাংশ) পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃ ১২১৫

৯) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ) 'লর্ডরীপন' পৃ ১৫৫

১০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাঙ্গালার সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর ১২৮৭ ফাল্গুন

১১) "হেমচন্দ্রের সমালোচক প্রথিতযশা "সাধারণী" ও "নবজীবন" সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়। হেমচন্দ্রকে জানিতে হইলে সরকার মহাশয়ের লিখিত "হেমচন্দ্র" নামক পুস্তক সকলেরই পাঠ করা উচিত।" মদনমোহন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসংবাদ ১৩২৩ পৌষ, পৃ ৩০৯

১২) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (শেষার্ধ), 'কবি হেমচন্দ্র' পৃ ৫৭৯

১৩) ঐ, ঐ পৃ ৫৮১

১৪) ঐ, (প্রথমার্ধ) পৃ ১০৮

১৫) বঙ্গভাষার লেখক—(১ম) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃ ৬৪৫

১৬) নীলকণ্ঠ মজুমদার (১৮৫৫-১৯০১)
"নীলকণ্ঠ মজুমদার গীতারহস্য, বিবাহ ও নারীধর্ম প্রভৃতির রচয়িতা। ইনি এক অভিনব প্রথায় গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ও সহজভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।"—জহরলাল বসু, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস। পৃ ২৪৯

১৭) নবজীবন, চৈত্র ১২৯২ পৃ ৫৬১-৬২

১৮) বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) বৈশাখ ১৩২০

১৯) সুবোধিনী ১২৯৭, ৩০শে চৈত্র

অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমের সহযোগী ও বঙ্কিম পর্বেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার। কিন্তু পরবর্তীযুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। ১২৮২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গুণেন্দ্রনাথের 'বিদ্বজ্জন সমাগম' সভায় আহূত অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে একটি স্বরচিত কবিতা শুনেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৪ বছর। কবিতাটির নাম "প্রকৃতির খেদ"। এ সম্পর্কে তিনি সাধারণীতে লেখেন; "গত রবিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' হইয়াছিল। প্রায় একশত গ্রন্থাকার ও বিদ্বানব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সাহিত্য ও সঙ্গীতের আমোদ এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। সভাগৃহ তরুরাজি, পুষ্পমালা, আলোকাবলি ও সুন্দর আসনে সুশোভিত হইয়াছিল।

প্রথমে বাবু রাজনারাণ বসু বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি এবং বঙ্গকবি ও গ্রন্থকার-দিগের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন, পরে প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পঠিত হয়। তাহার পর রাজনারায়ণ বাবু কবি কঙ্কণের চণ্ডী হইতে একটুকু পাঠ করেন। অনন্তর 'হুতোম প্যাঁচা' ও 'নবীন তপস্বিনী' হইতেও কিছু পাঠ করা হয়। তদনন্তর বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্য প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্ত্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।"[১]

নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) 'আমার জীবন' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-অক্ষয়চন্দ্র সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ আছে। ১৮৭৭ সালে হিন্দুমেলার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা পাঠ করেন এবং একটি গান গেয়ে শোনান। অক্ষয়চন্দ্র সেই কবিতা ও গানে যে কত অভিভূত হয়েছিলেন তার পরিচয় পাই সাধারণীর প্রতিবেদনে (৪ঠা মার্চ ১৮৭৭);—"আমরা প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষচ্ছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্রের কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের

অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠে আবৃত্তির মাধুর্য্যে আমরা বি-মোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমার শিশু ভারতের জন্য এই রূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাঁহার কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি 'আয় ভাই আমরা গাইব অন্য গান।' একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে তখন দুঃখিনীবঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"

অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশিত হ'ত। প্রথম সংখ্যাতেই 'রাজপথ' এবং 'ভানুসিংহের জীবনী' বেরিয়েছিল।[২] সারদাচরণ মিত্রের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র যে 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' খণ্ডশঃ প্রকাশ করেছিলেন, সেই সংগ্রহ পড়েই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ জন্মায়। এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরা গেল ; "শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয়-সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"[৩]

পদাবলীতে প্রযুক্ত 'পহুঁ' শব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এখানে উদ্ধারযোগ্য। 'বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন পহু অর্থে প্রভু এবং পহুঁ অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয়-অর্থেই পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে, নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।'[৪]

১৮৮২ থেকেই যুবক রবীন্দ্রনাথ (২১ বছর বয়স) বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে

যাতায়াত শুরু করেছেন। অনেক উপলক্ষে বঙ্কিমের বৈঠকখানাতেই অক্ষয়চন্দ্র -রবীন্দ্রনাথের আলাপ আলোচনা জমে উঠেছিল। সেই আলাপ-আলোচনারই পরিণতিতে নবজীবনে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ। নতুবা নবজীবনের মূল বক্তব্য অর্থাৎ ধর্মালোন্দনের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ধর্ম-ধারনার কোন মিল ছিলনা।

অক্ষয়চন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বিরোধের প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখযোগ্য। তরুণ-রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সকলের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করছে দেখে অক্ষয়চন্দ্র শঙ্কিত হ'য়েছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল; অতিশয় স্তাবকতা রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশে অন্তরায় হ'তে পারে। 'ভাই হাততালি' (নবজীবন ১২৯১ মাঘ) নামক রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে যেন হাততালির অপকারিতার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। সরস ব্যঙ্গরসাশ্রয়ী রচনাটি অক্ষয়চন্দ্রের অপূর্ব গদ্য ভঙ্গীর নিদর্শন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমাবাঈ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির তুলনা দিয়ে বলেছেন, হাততালিতে আত্মতুষ্টি জন্মায়, কৃতি পুরুষের যোগ্যতার লাঘব ঘটে। হাততালির 'অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনে' বয়স হয়েছে বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের। "বয়স-বিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই। —তাই হাততালি, তাঁহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।"[৫]

"রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা; ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারি দিক্ আলোকিত করিবে; প্রাচীন হিন্দুর সুগন্ধ-তৈল-নিষেবিত দীপের ন্যায় সেই অমল আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধে চারি দিক্ আমোদিত করিবে। *** না, এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সংবল; তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চট্‌চটি একবার প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ-সন্তানের কি আর স্থৈর্য থাকিবে? ভাই! স্বীকার করিলাম তুমি বাহাদুর,—তুমি মনে করিলে বীরপাত করিতে পার, কিন্তু তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি,— তুমি দিন কতক ক্ষান্ত থাকিবে না কি?" (অক্ষয় সাহিত্য-সম্ভার, শেষার্ধ, পৃঃ-৪৮৫)

তরুণ রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতর মনে এর অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া ভাল হয়নি। তাঁর প্রতি এতে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে ভেবেই রবীন্দ্রনাথ নবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র তারপরেও রবীন্দ্র রচনা বিষয়ে

ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ‘ভাই হাততালি’ রচনাতেও সুদর্শন রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, “সেই অমল, কোমল, কমল-শোভা-সমন্বিত মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল, সলজ্জ, ভাসা ভাসা, ভ্রমর-ভরস্পন্দিত পদ্মপলাশ লোচন —সেই ঝামর-চামর-নিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণী-বিনায়িত-চিকুর-ঝল-ঝল মুখমণ্ডল—সেই রহস্যে আনন্দে মাখানো হাসি-খুসী-ভরা-অধর-প্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর-ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র, পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।”[৬]

আবার রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি উপলক্ষে সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অভিভাষণে বলেন,—

> “রবিবাবুর কবিতা, এটি না-হয় ওটি, সকলকেই কখনও না কখনও মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সম্মান করিতে তাঁহার দেশবাসী পরান্মুখ হয় নাই—স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নিজ গলদেশে গ্রহণ না করিয়া কুসুমমালারূপিণী যশের মালা রবিবাবুর গলদেশে দিয়াছিলেন; প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে রবিবাবুই সভাপতি হন; সাহিত্য-পরিষৎ এবং এই টাউনহলের সভা তাঁহার উপযুক্ত সংবর্ধনা করিয়াছে।*** তাঁহার একটি ক্ষুদ্র কবিতাকণিকা ‘গীতাঞ্জলি’ যাই বিলাতি বাটখারার ওজনে চড়িয়া আপনার গৌরব কাঞ্চনমুদ্রায় স্থির করিল, অমনই মহা শোরগোল পড়িয়া গেল।*** কিন্তু বাস্তবিক মনীষিমাত্রই বুঝিতে পারিতেছেন, রবিবাবু বেশি সার্থকও হন নাই, তাঁহার সর্বনাশও হয় নাই। তিনি আমাদের যে রবিবাবু, সেই রবিবাবুই আছেন; তাঁহার ‘নৈবেদ্য’ প্রকৃতই নৈবেদ্য; তাহার ভিত্তি পৃথিবী—’পরে হইলেও, কাঞ্চনশৃঙ্গের মত উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি লইয়া সেই কাব্য নিয়তই রাজরাজেশ্বরের স্বর্গস্থ সিংহাসনাভিমুখে উন্নীত হইয়া আছে। তাঁহার ‘গীতাঞ্জলি’ পরমপিতার পূজার উপকরণ, সাধকের সাধনার সামগ্রী, ধাতুচক্রে তাহার গৌরব বাড়াইতে কমাইতে পারিবেনা।’[৭]

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথেরও অক্ষয়চন্দ্র বিষয়ে কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। তাই পিতা গঙ্গাচরণ সরকার এবং অক্ষয়চন্দ্রের জীবনী লেখার জন্য তিনি অক্ষয়চন্দ্রকে অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধের ফল অক্ষয়চন্দ্রের “পিতাপুত্র”। প্রসঙ্গত লেখকের উক্তি স্মর্তব্য; “আমার ও পিতৃদেবের জীবনী লিখিতে আমি অনেকদিন হইতে অনুরুদ্ধ ছিলাম; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আমাদের সাহিত্য-জীবনের কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল অনুরোধ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছি।"[৮]

এছাড়া 'নৈবেদ্য' প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি; "রবিবাবুর নৈবেদ্য আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ—সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি"[৯]—নিঃসন্দেহে গভীর প্রশংসাসূচক। আবার বিচিত্র প্রসঙ্গে লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন, "যে নৈবেদ্য মাথায় করিয়া লইয়া বঙ্কিমবাবুর সমসাময়িক প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার আনন্দে নৃত্য করিতে পারেন, তাহার তুলনা আমাদের সাহিত্যে মেলে কি?"[১০]

১৩২২ বঙ্গাব্দের ২০শে বৈশাখ 'প্রবাহিনী'তে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র অক্ষয়চন্দ্রের স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করেন। সমকালের বাংলা সাহিত্যের অবস্থা, ঐতিহাসিক গবেষণা, নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ-প্রসঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথের কথা ওঠে।

> "তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু বলিলেন আমরা সাহিত্য চর্চ্চায় রত হইবার পর, রবীন্দ্রবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য আসরে দেখা দেন। তখন তাঁহার বয়স অল্প। তখনও তাঁহার লেখার আড়্ ভাঙ্গে নাই। রবীন্দ্রের তখন নবীন উদ্যম, নবীন বয়স, নবীন সাধনা। কিন্তু সাহিত্যে যশস্বী হইবার মত প্রতিভা যে তাঁহার আছে, আমরা তখনই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমরা বলিতে, আমি বঙ্কিমবাবুর কথাই বলিতেছি। তিনি তাঁহার সম্বন্ধে প্রথমে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। আজ তাহা সফল হইয়াছে। এযুগের লোকের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব থাকিবার অনেকগুলি কারণ আছে। তিনি আপনার বক্তব্যগুলি বেশ গুছাইয়া বলিতে পারেন। তাঁহার ভাষা মিষ্ট—যেন একটা ঝঙ্কার, সত্যসত্য একটা সঙ্গীত। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়া গেলেও তাহার রেশ মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ রিশ রিশ করিতে থাকে। তাহার পর, তাঁহার গলা মিষ্ট, তাঁহার ভাষারই উপযোগী। এবং তিনি দেখিতেও সুপুরুষ। যখন তাঁহার স্বভাব সৌন্দর্য্যের সহিত ভাষার সৌন্দর্য্য মিশিয়া, সভার গৃহে তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠ বাজিয়া উঠে, তখন সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়, যুক্তি-তর্ক ভাসিয়া যায় একেবারে সকলকে হিপ্‌নটাইজ করিয়া ফেলে। এবিষয়ে একটা সুন্দর গল্প

আছে। একবার তাঁহার সহিত শ্রদ্ধেয় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের শব্দের শক্তি আছে কিনা এই লইয়া তর্ক হয়। শব্দের অর্থ লইয়াই কথা, যাহার অর্থের যত গভীরতা, তাহাই তত শ্রোতাকে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রবাবু বলেন শব্দের অর্থ থাক বা না থাক, তাহার একটা নিজস্ব শক্তি আছে। অনেক সামান্য অর্থহীন শব্দও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে, এই বলিয়া তিনি উদাহরণ-স্বরূপ একটা গান গাহিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠস্বরে সভাগৃহ যে মূর্চ্ছনায় ভরিয়া উঠিল, তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সমস্ত যুক্তি তর্ককে ভাসাইয়া দিল। শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই সায় দিলেন, এমন কি ব্রজেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত। কিন্তু তোমরা জান, যুক্তির নিকট রবীন্দ্রবাবুর একথা খাটে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা একটা কুহকের সৃষ্টি করে। বর্তমান সময়ে আমার মনে হয়, আমাদিগের দেশে এরকম সাধনা, অতি কম লোকেরই আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে এ বিদ্যায়, তিনি অদ্বিতীয়।"[১১]

ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হ'লে অক্ষয়চন্দ্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে, একটি প্রবন্ধ লেখেন।[১২] তাঁর মূল কথা বাঙালীর স্বদেশ-ভাবনা ভারতকে ছেড়ে বঙ্গকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এবং সেই পাপেরই ফল রাজধানী স্থানান্তর। 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানের ভারতচিন্তা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-এ সঙ্কুচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য স্মর্তব্য ; "কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশের পরিধি কমাইয়া ভারতপ্রীতিকে বঙ্গপ্রীতিতে পর্য্যবেশিত করিতে ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন।*** আমরা পুরাণ' পাপী, ভারতমাতার ভিখারী সন্তান। আমরা কিন্তু সেই গরীয়সী জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিয়া নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে আমাকে রাখীসূত্র এবং মন্ত্রসূত্র পাঠাইয়াছিলেন। রাখী বাঁধিলাম, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলাম না।"[১৩]

বলা বাহুল্য, বঙ্গসর্বস্বতা রবীন্দ্রনাথের দেশানুরাগের মূল কথা নয়। রাখী-বন্ধন আন্দোলন একটি সাময়িক ব্যাপার ; ভারতের জাতীয়-আন্দোলনের একটি সন্ধিপর্ব। রবীন্দ্রনাথ বস্তুত ভারত ভাবনাকেই পরে বিশ্বমানবচেতনায় রূপান্তরিত করেন। তবে সে-পর্যন্ত রবীন্দ্র মানসের বিকাশ-বিবর্তন অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনুধাবন করার সুযোগ পাননি। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯১৭ সালে। রবীন্দ্র-

প্রতিভা ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সৃষ্টিকর্মে নিরলস নিয়োজিত ছিল। কবির স্বদেশ-ভাবনা বঙ্গভঙ্গের সাময়িক মুহূর্ত বাদ দিলে আর কখনই বঙ্গসীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েনি। আবার, ঐ বিশেষ সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে অক্ষয়চন্দ্র যে সমালোচনা করেন, তার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াও তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

পাদটীকা

১) ১২৮২, ৩রা জ্যৈষ্ঠ পৃষ্ঠা—৫৬

২) এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় নবজীবন মাসিক পত্র বাহির করিয়াছেন —আমিও তাহাতে দুটা-একটা লেখা দিয়াছি। —জীবনস্মৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ১০ম খণ্ড পৃঃ-১০৫

৩) রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ১০ম খণ্ড জীবনস্মৃতি, ঘরের পড়া, পৃঃ-৫৬

৪) ঐ ঐ ১৪শ খণ্ড 'শব্দতত্ত্ব' পৃ-৭৩

৫) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (শেষার্ধ) পৃঃ-৪৮৫

৬) ঐ ঐ

৭) ঐ পৃঃ-৬৮১

৮) বঙ্গভাষার লেখক—(১ম) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃঃ-৪৬৫

৯) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ) পৃঃ-২১

১০) বিচিত্র প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে' পৃঃ-২৯৬

১১) প্রবাহিনী পৃঃ-১৮২-৮৩

১২) মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯

১৩) ঐ, পৃঃ-৪৫-৫০

এডুকেশন গেজেট বনাম নববিভাকর—সাধারণী

ভূদেবচরিত পাঠে জানা যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২১-৯৪) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রবল মত পার্থক্য ছিল। বস্তুতঃ এডুকেশন গেজেটের সঙ্গে নববিভাকর সাধারণীর (সংযুক্ত পর্যায়) অনেক বিষয়ে বিরোধ ঘটেছিল। আলোচ্য অংশে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

২৩।৪।৮৪ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার প্রস্তাবিত মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। —ভূদেবচরিত, (২য়) পৃষ্ঠা-৩৫৭

১০।১।৮৯ তাঁহার তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"সূক্ষ্ম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খবিচার দ্বারা যে বিষয়ে স্থিরীকৃত, তাহাভিন্ন অন্যবিষয়ে উত্তেজনা পূর্ণ কিছু লেখা ঠিক নহে। ইহাতে যতসামান্যই হউক সত্যের কিছু অপলাপ ঘটে, আর সেটুকু দুর্ব্বলতা। নববিভাকর-সাধারণী তাহার শেষ সংখ্যায় এডুকেশন গেজেটের কথার কোন উত্তর দেন নাই।"—ঐ, (৩য়) পৃ-২৫২-৫৩

এই সময়ে এডুকেশন গেজেটে "সারসংগ্রহ" নাম দিয়া অন্যান্য সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া ভূদেববাবু উত্তেজনাপূর্ণ বা "চুটিয়ে লেখা" প্রবন্ধে দোষ দেখাইতেন। তাহার দুই একটীর নমুনা দেওয়া হইতেছে :—

"এডুকেশন গেজেটের প্রবীণ সম্পাদকের" "সামাজিক প্রবন্ধের" সারবান উপদেশের পরিবর্তে "সার সংগ্রহের" অসার ওকালতী বাক্য পাইতেছি কেন ?" (নববিভার সাধারণী ১০ই পৌষ ১২৯৫)

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেটে লেখা হয় :—অদ্য একবিংশবর্ষ যাবৎ যেভাবে চলিয়াছিল এখনও এডুকেশন গেজেট সেইভাবে চলিতেছে ; তাহার ঘুণাক্ষরেও ভাবান্তর ঘটে নাই। যদি এতদিন ইহার অস্বাধীন ভাব বা পক্ষপাতিতার কোন লক্ষণ প্রকট না হইয়া থাকে, তবে এখনও হইতেছে না। আমরা ইদানীং "সার সংগ্রহ" শীর্ষক দিয়া অন্যান্য সংবাদপত্র হইতে যে সকল প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া তদ্বিষয়ে আপনাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, তাহার কারণ সম্প্রতি 'চুটিয়ে লেখা'র এবং অত্যুক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের নিতান্তই বাড়াবাড়ি

দৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলা সংবাদপত্রসকল শান্তভাবে এবং বিবেচনাপূর্ব্বক কথাগুলি বলিলে যতটা কার্য্যকরী হইতে পারে শুদ্ধ লেখার "চোটে" তাহা হইতে পারেনা।

অত্যুক্তি এবং হঠোক্তি প্রভৃতির দোষ প্রদর্শনে উপকার দর্শিতে পারে এই আশা প্রণোদিত হইয়াই "সার সংগ্রেহের" ব্যবস্থা করা গিয়াছে এবং কোন কোন সহযোগী ঐ উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। নববিভাকর-সাধারণী ঐ গুলিকে "অসার ওকালতী" বলিয়া নিন্দা করিলেন, কিন্তু যদি সার সংগ্রহের মধ্যে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী কথাও অযথা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার ঐ ব্যঙ্গোক্তি ন্যায়সঙ্গত হয়। আমরা একমাত্র সত্যকেই সারবান বলিয়া মনে করি। সত্যই স্থায়ী, আরোপিত কোন বস্তু স্থায়ী বা সারবান হয় না। সহযোগী ভাবিয়া দেখুন যে "চুটিয়ে লেখা" এখনকার ইংরাজী সংবাদপত্রের অনুকরণজাত। ওটা ভাল জিনিস নয়। চোটের লেখায় যে সকল দোষ অবশ্যই ঘটে, তাহা প্রদর্শন করায় উপকার বই অপকার হয় না। ইংরাজী পাইওনিয়ার পত্র বাঙ্গালী বাবুদিগকে গালি দেন। সে গালি দেওয়া অনুচিত বলিয়া সকলেই মনে করিয়া থাকি। কিন্তু কোন কোন বাঙ্গালা পত্রও ঐ বিষয়ে পাইওনিয়ারদিগকে সুদূর পরাহত করিতেছেন। ঐরূপ কার্য্য কি বিধেয়? চুটিয়া লেখায় লেখার দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকেনা।" —ভূদেব চরিত (৩য়), পৃঃ ২৫৩-৫৪

ইহার উত্তরে নববিভাকর সাধারণী লেখেন—'গেজেট ভ্রূকুটী করিয়া বলিয়াছেন 'কিন্তু যদি সার সংগ্রহের মধ্যে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটী কথাও অযথা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার ঐ ব্যঙ্গোক্তি ন্যায়সঙ্গত হয়।' আমরা বলি বঙ্গবাসী লবণের মাসুলের সম্বন্ধে ডিণ্ডিম দিবার প্রস্তাব করিলে গেজেট তাহার যে প্রতিবাদ করেন, আমরা তাহা সমস্তই অসার বলিয়াছিলাম, তখন তাহার উত্তর নাই। গেজেট সেই কথার উত্তর দিয়া আপনার সাহঙ্কার ভ্রূকুটীর মর্য্যাদা বহন করিতে পারিবেন কি? তাহার পর চুটিয়া লেখা সেটা কি এমন বেশী হইল?'—ঐ, পৃঃ ২৫৪-৫৫

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছে—

"নববিভাকর সাধারণী আমাদের ললাটে ভ্রূকুটী এবং বাক্যে গর্ব্বের বৃথা আরোপ করিয়াছেন। ওরূপ চিত্তবিকারের কোন হেতুই উপস্থিত হইতে পারে

না। যাউক, তাঁহার প্রকৃত কথা এই যে, বঙ্গবাসী পত্রের একটী প্রস্তাবের আমরা যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহা "নববিভাকর সাধারণী"র মতে অযৌক্তিক হইয়াছিল। বঙ্গবাসীর প্রস্তাব এই যে, লবণ বিক্রেতারা লবণের মূল্য অতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল, অতএব বাজারে ডিণ্ডিম প্রচার পূর্ব্বক লবণের মূল্য অবধারিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আমরা বলিয়াছিলাম যে ওরূপ করা ভাল নয়, যেহেতু ঐরূপ ডিণ্ডিম প্রচারের পরেও যদি কোন বিক্রেতা অধিকতর মূল্য চায় তবে কি তাহার দণ্ড করা হইবে? মনে করিয়াছিলাম যে, আমাদের কথাটীর সারবত্তা এবং যৌক্তিকতা অনায়াসে বোধগম্য হইবে; কিন্তু তাহা হয় নাই। (১) লঙ্ঘনে দণ্ড দিব না, অথবা লঙ্ঘন হইবে না, কিম্বা অল্পস্থলেই হইবে, এরূপ মনে করিয়া রাজা কি রাজপুরুষ কোন আজ্ঞা প্রচারিত করিতে পারেন না। আজ্ঞার ভঙ্গে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল "দণ্ড" হওয়া চাই। এটা একটা নিতান্ত মোটা কথা। (২) অপর একটা মোটা কথা এই যে, ব্যবস্থাপিত বিধি সকলের বহির্ভাগে দণ্ডপ্রণয়ন হইতে পারে না। (৩) এই দুইটা মোটা কথা মনে করিয়া স্মরণ করিতে হইবে যে, লবণের দর বাড়াইলে বিক্রেতার দণ্ড হইবে এমন কোন আইন প্রচলিত নাই এবং সেরূপ আইন প্রচলিত করা হউক অথবা গবর্ণর জেনারেলের তাদৃশ আদেশ হউক, একথাও বলা হয় নাই। (৪) কাজে কাজেই ডিণ্ডিমপ্রচার অকর্ত্তব্য এবং অকিঞ্চিৎকর। (৫) তদ্ভিন্ন কোন দোকানদার তাহার পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিলে যদি সে দণ্ডার্হ হয়, তবে তাহার সত্ত্বের হানি করা হয়। এইজন্য তথাবিধ ব্যবস্থা প্রণয়নও হইতে পারে না।

ইংরাজ জাতি বাণিজ্য বিষয়ে সুপণ্ডিত। এইজন্য ইংরাজ কি স্বদেশে কি এই দেশে কোথাও কখন পণ্য দ্রব্যের নিরিখ বাঁধিয়া দেন না। তথাপি দুই চারিজন ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ সময়ে অযথা লবণ বিক্রয়ের নিরিখ বাঁধিয়া দিবার জন্য মনন এবং চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতার বণিকসভা তাহা জানিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাবধান করেন। বণিকসভার পরামর্শই যে প্রকৃত সৎ পরামর্শ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয়ই হইতে পারে না। দোকানীরা লবণের দর বাড়াইতেছে বলিয়া আর কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বিক্রেতৃগণের পরস্পর প্রতিযোগিতায় পণ্য দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। লবণের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়া গিয়াছে। অতএব যাহারা আপনা হইতেই ঐরূপ হইতে দিবার পরামর্শকে সাধু পরামর্শ মনে

করিয়াছিলেন তাহাদিগের বিবেচনায় অসমীচীন হয় নাই। বণিকসভার পত্র প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সময়ে আমরা নববিভাকর সাধারণীর মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক হইবে মনে করি নাই।

নববিভাকর সাধারণীর আর একটী কথা এই যে "চুটিয়ে লেখা" গত ১৮৭৭ অব্দ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, ঐ দোষটার অতি প্রাবল্য আজি কালই বিশেষ রূপে আমাদের লক্ষিত হইয়াছে; পূর্ব্বে ইহার সংক্রামক লক্ষণ এত প্রবল বলিয়া বোধ হয় নাই।" —ঐ পৃষ্ঠা-২৫৫-২৫৬

এডুকেশন গেজেটের সার সংগ্রহে (৩০।৫।১২৯৫) লিখিত হয়:— "সহজেই কোমলহৃদয় ভারতবর্ষীয় সন্তানদিগের মধ্যে দয়াবৃত্তির যত প্রাবল্য, কোন ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে সেরূপ হইতে পারে না। ব্যবস্থাপক সমাজ সকল এখন যেরূপে গঠিত তাহাতে দেশীয় সভ্যদিগের ক্ষমতা প্রয়োগের অবসর হয় না। স্বদেশীয় বড়লোকদিগের নিন্দা করায় মহাপাপ জন্মে এবং নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়।"

"কত কত পল্লীগ্রাম আছে যাহারা রোড কমিটির সৃষ্টি-অবধি পথকর দিয়া তাহা হইতে সিকি পয়সার উপকার পায় নাই।" —নববিভাকর সাধারণী

ইহার উত্তরে এডুকেশন গেজেটে ২০।৬১।২৯৫ লিখিত হয়:—

"কিন্তু রোডসেস হইয়া অবধি যে রাস্তা পুল প্রভৃতি পূর্ব্ব অপেক্ষা ভাল হইতেছে না একথা কোন জেলার পক্ষেই খাটে না।" —ভূদেবচরিত (৩য়) পৃঃ-২৫৮

৩০।১২।১৮৯০ মুকুন্দ লিখিয়াছে যে, নিমাইয়ের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়াই ইন্দ্রকুমারকে এবং লালমোহন বিদ্যানিধিকে পত্র লিখিয়াছে। নিজেও এডুকেশন গেজেটের জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়াছে এবং উহাদের ও আমার সাহায্যে গেজেটের জন্য লিখিয়া পাঠাইতে বলিয়াছে। গোবিও একজন লোক ঠিক করার চেষ্টা করিতেছে। নৈহাটীর শ্রীযুক্ত নিবারণ ভট্টাচার্যকে গোবিন্দদেব বাবুই কিছুকাল পরে ঠিক করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি ঐসময় হইতেই অনেকদিন পর্য্যন্ত এডুকেশন গেজেট আফিসে কার্য্য করেন এবং এই জীবনচরিতের প্রথম কতকটা অংশের প্রস্তুতে সহায়ক হইয়াছিলেন। এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশের পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অনেকে দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতেন। —ঐ, পৃঃ-৩১৪

২৮।৮।৯২—সামাজিক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে পড়িয়া কেহ কেহ বলেন

যে, উহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরোধী কথা আছে,—পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আমার মনে হয়, সেরূপ কিছু নাই এবং সেইজন্য উহার মুদ্রণ শেষ করাইয়াছি। তথাপি সাধারণের নিকট প্রকাশ সম্বন্ধে মতামতের জন্য এক একখানি মুদ্রিত সামাজিক প্রবন্ধ গোবিকে, চন্দ্রনাথ বসুকে, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে এবং সারদামিত্রকে পাঠাইলাম।" —ঐ, পৃঃ-৩৪৬

১৷৯৷৯২ অক্ষয় সরকার আসিয়া বলিলেন—"সামাজিক প্রবন্ধ খুব সাবধানতার সহিতই লিখিত ; তিনি পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।" —ঐ, পৃঃ-৩৪৬-৪৭

বাইরের পার্থক্য সত্ত্বেও ভূদেব ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভূদেবের 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগের (১৩১১ বঙ্গাব্দ) সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী' (১৯১১) গ্রন্থের মূল বক্তব্য অভিন্ন। দু'জনেই মনুবিহিত হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই অগস্ত কোঁতের 'পজিটিভিজমের' সঙ্গে পরিচিত ছিলেন ; আবার তাঁরা উভয়েই কোঁতের চেয়ে হিন্দুশাস্ত্রকেই সমর্থন জানিয়েছেন। সুতরাং কয়েকটি সাময়িক প্রসঙ্গে 'এডুকেশন গেজেটের' সঙ্গে 'নববিভাকর—-সাধারণী'র মতান্তর ছিল মাত্র। দুই পত্রিকার দুই কর্ণধার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংঘর্ষের মুখে একই সিদ্ধান্ত বিন্দুতে দাঁড়িয়েছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও পরবর্তী লেখকগণ

অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনের লেখক গোষ্ঠীর একজন এবং বঙ্কিমের অনুগামী রূপেই বাংলা সাহিত্যে সুচিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু সমালোচক ও প্রবন্ধকার অক্ষয়চন্দ্রের ব্যক্তিত্বও পরবর্তীকালে বহু তরুণ চিত্তকে সারস্বত সেবায় আকৃষ্ট করে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের সাহিত্য ভাবনায় অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাব প'ড়েছে। তাঁদের স্বদেশানুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, এমনকি কারো কারো রক্ষণশীলতাও অক্ষয়চন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। এখন পর্যায়ক্রমে কয়েকজন সাহিত্যিকের নিজস্ব বিবৃতি তুলে ধরা হ'ল।

'বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু যে অক্ষয়চন্দ্রের 'হাতেগড়া শিষ্য' ছিলেন তা 'মানসী' পত্রিকা ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়। 'মানসী' সম্পাদক এ বিষয়ে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন; "তিনি (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু) কলেজ ছাড়িয়া শীঘ্রই আপনার গন্তব্যপথ বাছিয়া লয়েন,—তিনি চুঁচুড়ায় 'সাধারণী' সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে বঙ্গের বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট সংবাদপত্র সম্পাদন কার্য্য শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।"[১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য; "যোগীন্দ্র বোস্ তাঁহার হাতেগড়া শিষ্য। তিনি অনেকদিন "সাধারণী"-র সহিত কাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন। সকল কাজেই তাঁহাকে অক্ষয়বাবুর পরামর্শ লইতে হইত, অক্ষয়বাবুও অকাতরে তাঁহাকে পরামর্শ দিতেন ও লেখাপড়ার বিষয় সাহায্য করিতেন। অনেক সময় তাঁহার কাগজে লিখিতেনও। শক্ত সমস্যা হইলে যোগীনবাবু গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।"[২]

বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বল্প কথায় অক্ষয়চন্দ্রের ঋণের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, "অক্ষয়বাবু, আপনার কাছে আমরা যত পাইয়াছি, এত আর কাহারও কাছে পাই নাই, তাই আপনি আমাদের আচার্য্য। তাই আপনি আমাদের পূজ্য, তাই আপনি আমাদের হৃদয়ে এত অধিক স্থান অধিকার

করিয়া আছেন। *** অক্ষয়বাবু আমার আর একখানি বইয়ের বেশ সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেখানিই আমার প্রথম বই, ১৮৭৪ সালে লেখা। ছাপা অনেক পরে হইয়াছিল, সমালোচনা আরও অনেক পরে। অক্ষয়বাবু বলিয়াছিলেন 'এই গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষা বলিয়া একটা ব্যবধান নাই।' আমি সোজা বাঙ্গালা লিখি বলিয়া তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই প্রস্তাবে একবার এই সাহিত্য পরিষদে সভাপতি হইয়াছিলাম।"[৩]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়চন্দ্রের অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। 'কবি হেমচন্দ্র' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন; 'ঋষি ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতেছি।'[৪] এছাড়া অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন; 'আমাদের সাহিত্য জীবনের একটা বড় অবলম্বন, বড় সহায় চলিয়া গেল। কোনকিছু লিখিলে, কোনকিছু বলিলে, যাঁহার মুখের স্তুতিনিন্দা শুনিবার জন্য আমরা আশাপথ চাহিয়া থাকিতাম, যিনি পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মতন শাসন করিয়া, পড়াইয়া—লেখাইয়া—বুঝাইয়া আমাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী করিয়াছিলেন,—সখা, মিত্র, দাদা, গুরু, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র আমাদের সাহিত্য জীবনের এক প্রধান অবলম্বন ছিলেন।'[৫]

বিপিনচন্দ্র পাল চট্টগ্রাম ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিকে সম্মানিত করে তাঁর জীবনে অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাবের কথা বলেছেন; 'আচার্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্যগুরু নহেন,—তাঁহার সাধারণী পড়িয়াই আমি রাজনীতির ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষপড়া পর্য্যন্ত শিখিয়াছি।'[৬]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্ষয়চন্দ্রের অন্যতম সাহিত্য শিষ্য ছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন;—

> 'অক্ষয়বাবুর আর এক চেলা আমাদের স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। নবজীবনেই তাঁহার হাতে খড়ি হয়। তিনি কেমন করিয়া অক্ষয়বাবুর সহিত পরিচিত হন, কেমন করিয়া তাঁহার লেখা সর্ব্বপ্রথম নবজীবনে প্রকাশ হয়, কেমন করিয়া অক্ষয়বাবু রামেন্দ্রবাবুকে আস্তে আস্তে আপনার করিয়া লন—সে কথা রামেন্দ্রবাবু নিজেই অনেক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রামেন্দ্রবাবু বলিতেন, দেশটা আপনার; দেশকে মা বলিয়া পূজা করিতে হইবে—বঙ্কিমবাবু একথার উদ্বোধন করিয়া যান, কিন্তু

একথার প্রচার ও বিস্তার অক্ষয়বাবুর নবজীবনে হয়। আর বর্ত্তমান সময়ের যে দেশপ্রীতি, সেও নবজীবনের লেখার ফল। রামেন্দ্রবাবুর মত চেলা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। অক্ষয়বাবু তাহা পাইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি ধন্য হইয়াছেন।'[৭]

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাহিত্য জীবনে অক্ষয়চন্দ্রের প্রভাবের কথা স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। তিনি 'চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে নিবেদন' নামক অংশে এই প্রভাবের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ; —"স্বর্গগত কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সম্পর্ক লাভে চট্টগ্রাম বাঙ্গালার সাহিত্য ভক্তদিগের সকলের পক্ষেই তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। আজিকার এই শুভযোগ উপলক্ষে যাঁহারা চট্টগ্রামে তীর্থযাত্রী, তাঁহাদের সাহচর্য্যলাভে বঞ্চিত হইয়া আমি ক্ষুব্ধ ও পরিতপ্ত। আমার ক্ষোভের আর একটা প্রবল হেতু আছে। গত বৎসর হুগলী নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে যিনি হুগলীর পক্ষ হইতে বঙ্গের সাহিত্য সেবকগণের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তিনিই আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চট্টগ্রামের এই ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সম্মিলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি আমাকে তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া সভাস্থলে প্রকাশ্যভাবে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু এইস্থলে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন ইতিহাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারই প্রকাশিত 'নবজীবন' পত্রিকায় বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি হইয়াছিল। আমার তখন পঠদ্দশা। ছাপার হরফে নিজের রচনা প্রকাশিত দেখিবার প্রবল চাপল্য আমি দমন করিতে পারি নাই ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্ত মাসে মাসে যে পত্রিকার জন্য অলঙ্কার রচনা করিত, সেই পত্রিকায় নিজের মসী অঙ্কিত নাম জাহির করিতে চপল বালক যারপরনাই শঙ্কা বোধ করিয়াছিলাম। নবজীবনে আমার প্রথম রচনা ও পরবর্ত্তী আরও কয়টি রচনা আমি বেনামিতে পাঠাইয়াছিলাম। আমার প্রথম রচনা নবজীবনে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকাশের পর দেখিতে পাইলাম যে, নবজীবনের সম্পাদক প্রবন্ধটিকে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ছাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া উহার স্ফীত-কলেবর শীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মনে বুঝিলাম যে, সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে আমার পৃষ্ঠদেশ নিশ্চিতই আমার সাহিত্য গুরুর নিকট বেত্রাঘাতের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক সেই হাতে খড়ির দিনে

গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক পরোক্ষ প্রেরিত বেত্রাঘাত আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবনে সংযম সাধনায় সাহায্য করিয়াছে। সেদিনের সেই সংযম শিক্ষা না ঘটিলে, আমার পরবর্ত্তী সাহিত্যিক জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিত, ইহা আমি প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়া থাকি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে তাঁহাকে উপস্থিত না দেখিয়া আমার হৃদয়ের বেদনা মৎ পঠিত প্রবন্ধ মধ্যে ব্যক্ত করিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। আজি তিনি চট্টগ্রাম সম্মিলনে বঙ্গসাহিত্যের গুরুর আসনে সমাসীন হইয়া একহস্তে বেত্রসঞ্চালন ও অন্যহস্তে অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। আমি চিরানুগত শিষ্যরূপে তাঁহার অনুগমনের অবকাশ পাইলাম না।"[৮]

প্রসঙ্গত বিপিনবিহারী গুপ্ত রামেন্দ্রসুন্দর প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও স্মরণীয় ;—'রামেন্দ্রসুন্দর বলতেন—প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল, তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যায় না এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল ; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশঃ দেখলাম যে, আমি যেসব কথা বলতে চাই তা' ও ভাষায় চলবে না, আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্য উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হোলো। আমি 'নবজীবনে' একটা লেখা পাঠিয়ে দিই ; ভয়ে ও লজ্জায় তাতে নিজের নাম দিই নি। অক্ষয় সরকার কেমন করে কিন্তু আমার নাম জানতে পারলেন ; আমাকে উৎসাহিত করবার জন্য প্রবন্ধটিকে একটু মার্জিত করে কাগজে বার করলেন। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে লোক চেনবার ক্ষমতা অক্ষয় সরকারের আশ্চর্য্য রকমের ছিল। দেখুন না, রবিবাবু যে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে উজ্জ্বল করবেন, একথা তিনি যেমন বুঝতে পেরেছিলেন ও "ভাই হাততালি" প্রবন্ধে সকলকে বলেছিলেন, তেমনটি বোধ হয় বঙ্কিমবাবু ছাড়া আর কেউ পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। পারেন নি।'[৯]

উল্লিখিত প্রথিতযশা সাহিত্যিকগণ ছাড়াও আরও অনেকে অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য সেবায় যারপরনাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ; 'সাহিত্য পরিষদের দলের অনেকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার আচার্য্যগিরি গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে আবার তাঁহার বই পড়িয়া, "সাধারণী," "নবজীবন" পড়িয়া তাঁহার চেলা হইয়াছেন।'[১০]

এতদ্ব্যতীত চুঁচুড়ার লোকেরা বিশেষ করে চুঁচুড়ার শিক্ষিত ব্যক্তিরা অক্ষয়চন্দ্রকে অত্যন্ত আপনজন বলে মনে করতেন। সকল বিষয়ে এই মহণীয় ও ও দেশবরেণ্য সাহিত্যিকের সাহচর্য লাভ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য; "চুঁচুড়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল, উঁহারা তাঁহার ঋণ ভোলে নাই, ভুলিবে না, ভুলিতে পারিবে না।'[১১]

চুঁচুড়ার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক ও লেখক দীননাথ ধর[১২] অক্ষয়চন্দ্রের কাছে যেতেন নিজের লেখা সংশোধনের জন্য। তাঁর অতি বিশ্বাস এবং ধারণা ছিল যে, অক্ষয়চন্দ্র তাঁর লিখিত অংশ না দেখে দেওয়া পর্যন্ত তা অসম্পূর্ণ। প্রসঙ্গত তাঁর মন্তব্য; 'আমি যাহা কিছু লিখিতাম, অক্ষয় একবার না দেখিয়া দিলে আমার তৃপ্তি হইত না।'[১৩]

১৮৪৬ থেকে ১৯১৭— এই ৭১ বছর বয়সের মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক —রাজনৈতিক জীবনে যেমন অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অল্প হয়নি। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-বঙ্কিমের যুগকে অক্ষয়চন্দ্র খুব কাছে থেকে দেখেছেন, সে যুগের কাব্য-নাটক-উপন্যাসের প্রথম প্রকাশের উদ্দীপনা অনুভব করেছেন। হয়ত তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া সকলের প্রতি সমান অনুকূল হতে পারেনি, কিন্তু কোন উল্লেখ্য ঘটনা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। রবীন্দ্র প্রতিভার অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। কাব্য ও কথাশিল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বঙ্কিমী বাতাবরণ ছিন্ন করে নতুন আদর্শে স্থিত হল। উদারদৃষ্টি অক্ষয়চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের এই গতিপরিবর্তন, এই নতুন কালের পদক্ষেপ গভীর অভিনিবেশ সহ লক্ষ্য করেছেন। সাহিত্যপ্রাণ অক্ষয়চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, সমকালীন সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিষয়ে তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল এবং সুপরিণত বয়সেও তিনি নব্যলেখকদের রচনা বিষয়ে সহানুভূতিশীল ছিলেন।

পাদটীকা

১) মানসী—১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা ভাদ্র—১৩১৬ পৃঃ ৩২২

২) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতী—ভাদ্র ১৩২৯

৩) ঐ ঐ

৪) কবি হেমচন্দ্র—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য—চৈত্র ১৩১৯ পৃঃ-১০০৭-১০১৯

৫) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ), পরিচিতি পৃঃ-৪

৬) ঐ ঐ

৭) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতী—ভাদ্র ১৩২৯

৮) মানসী—চৈত্র ১৩১৮ পৃঃ-১৭১-৭২

৯) 'রামেন্দ্রসুন্দর'—বিচিত্র প্রসঙ্গ—বিপিন বিহারী গুপ্ত পৃঃ-৩৯২-৯৩

১০) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতী—ভাদ্র ১৩২৯

১১) ঐ ঐ

১২) দীননাথ ধর—

'পিতৃদেব কতকগুলি উৎকৃষ্ট টপ্পা গীত রচনা করেন। অনেকগুলি সে সময়ে খুব চলিত ছিল। দুই একটি এখনও চলিত আছে। স্বনাম প্রসিদ্ধ সু-লেখক আমাদের স্বগ্রামবাসী, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর গান করিয়া থাকেন।' বঙ্গভাষার লেখক (১ম)—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পৃঃ-৪৯৭

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য ; 'বাঙ্গালা লেখা, বাঙ্গালা গান বাঁধা দীননাথ ধরের একটা বুড়ো বয়সের রোগ।' অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতী—ভাদ্র ১৩২৯

১৩) অক্ষয়চন্দ্র সরকার—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতী—ভাদ্র ১৩২৯

সমকালীন প্রসঙ্গ ; সাংবাদিকতা

'সাধারণী' পত্রিকায় সমকালীন রাজনীতি ও সামাজিক প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই প্রধান স্থান অধিকার করত। সাধারণীর পুরণো পৃষ্ঠাগুলিতে সেকালের সামাজিক চালচিত্র নিখুঁত ধরা পড়েছে। এখানে সব উল্লেখ্য বিবরণগুলি উদ্ধৃত করবার প্রয়োজন নেই। মাত্র কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে নির্বাচন করে নেওয়া হয়েছে। সেগুলি থেকেই বোঝা যাবে সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সমকালীন সমাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে কত উৎসাহী এবং সেগুলির ভবিষ্যৎ সামাজিক তাৎপর্য বিষয়ে কত সচেতন ছিলেন।

১. মোহন্ত প্রসঙ্গ ঃ

১৮৭৩ সালে তারকেশ্বরের মোহন্ত ও এলোকেশীর মৃত্যুকে নিয়ে সারা দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে বাংলা নাটক-প্রহসনে ঘটনাগুলি স্থান পেয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র সাধারণীতে সেই মামলার বিবরণ মুদ্রিত করেন। ১২৮০—২রা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় "মোহন্তদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" নামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। তাতে সাময়িক উত্তেজনার লেশমাত্র নেই বরং তিনি সামাজিক অনুশাসনকেই কুপ্রথা বলেছেন। খৃষ্টানদের কন্‌ভেণ্টেও মোহন্ত—দেয়াসীদের মত পাপাচার ব্যাভিচার আছে। অথচ বর্মীয় অবিবাহিত সন্ত সম্প্রদায় ফুঙ্গীদের মধ্যে পাপাচারের কথা শোনা যায় না। কারণ ফুঙ্গী পুরুষ ও ফুঙ্গী নারীর মধ্যে অনুরাগ জন্মালে তারা জ্যেষ্ঠ ফুঙ্গীদের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস ত্যাগ করে গৃহী হতে পারেন। হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্যে সে প্রথা নেই। অথচ নবীন সন্ন্যাসীর মধ্যে যে কোন মুহূর্তে প্রবৃত্তির মোহ জাগতে পারে। তা মোটেই প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়। অক্ষয়চন্দ্রের সিদ্ধান্ত—

১) মোহন্ত বা পূজক বিবাহিত হতে পারবেন।

২) পঞ্চাশোর্ধে কোন পুরোহিতকে সন্ন্যাসী—মোহন্ত পদে বরণ করা উচিত।

তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক্।

"তারকেশ্বরের মোহন্ত প্রকৃত রূপ দোষী হইলে তিনি দণ্ডনীয়, তাঁহার শাসন

নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই যত্ন করিতেছেন অনেকে একত্র হইয়াছেন। আমাদের এই অভাগা দেশে একতার নিতান্ত অসদ্ভাব। *** নবীনকে উদ্ধার করিবার জন্য মোহন্তকে দণ্ড দিবার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই একত্র হইয়াছেন, অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, যত্ন করিতেছেন, এটিও সুখের বিষয়। বঙ্গভূমিতে যে একতা নাই, সেই একতার ইহা অঙ্কুর স্বরূপ। ইহা হইতে ভাবী সুফল প্রত্যাশায় এই অঙ্কুর দৃষ্টে আমরা সুখী হই। *** মানুষেতে যাহা আছে তাহা চিরদিনই থাকিবে, কোনকালে তাহা বিনাশ পাইবে না। অধিকন্তু তাহার বিনাশ চেষ্টা বিফল মাত্র, নিতান্ত অসঙ্গত এবং অযুক্ত। সন্ন্যাস আশ্রম পরিগ্রহ করিলেই মোহন্ত বা মঠধারী হইলেই মানুষ কামাদি প্রবল রিপুর হস্ত এড়াইলেন এইরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। *** মোহন্ত হইলেই তাঁহাকে অ-দারগ্রাহী হইতে হইবে, কনভেন্ট-বাসী হইলেই পুরুষ বা রমণীকে কামাদি-রিপু একেবারেই বিস্মৃত হইতে হইবে এরূপ বিধান করা নিতান্ত অন্যায়। ইহ সংসারে তৎসমুদায়ের উদ্রেককারী পদার্থ প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান। *** "জ্ঞানতরুর ফল তোমরা খাইওনা"—আদম এবং ইভের প্রতি এরূপ ঈশ্বরাদেশ না থাকিলে হয়ত বাইবেল কথিত মনুষ্যের অধঃপতন ঘটিত না। মোহন্ত ও মঠধারীরা দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন না, চিরকৌমার ব্রত পালন করিবেন, এই নিষেধ বিধি থাকার জন্য পবিত্র তীর্থ এবং মঠসমূহে পাপের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। শাস্ত্রের বা দেশাচারের এই কঠোর আদেশ নিতান্ত অসঙ্গত এবং জ্ঞানবিরুদ্ধ।

"পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ"—এই বিধিতে যুবাদের সন্ন্যাস আশ্রম আশ্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আজকাল প্রায়ই ইহার বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। *** পূর্বে মোহন্ত বলিলে শুভ্রজটাধারী সর্বদেহ ভস্মভূষিত কাষ্ঠপাদুক শুদ্ধাচার সন্ন্যাসীর ভাব হৃদয়ে উত্থিত হইত।"

অক্ষয়চন্দ্রের অভিমত—তীর্থ-দেবালয়-মঠ প্রভৃতির পরিচালনা স্কুল কমিটি বা হাসপাতাল কমিটির মত নির্বাচিত কমিটির হাতেই থাকা উচিত। তিনি মামলার বিবরণ মুদ্রিত করে ১৬ই অগ্রহায়ণ (১২৮০) লেখেন ; "মোহন্তকে ঘানি টানিতে দেওয়া হইয়াছে, আমরা পূর্বে জানিতাম যে এরূপ অধিক দিনের জন্য কারাবাসীদিগকে প্রথমে কখনই ঘানি টানিতে দেওয়া হয় না ; মোহন্তের সম্বন্ধে কেন সে নিয়মের পরিবর্তন করা হইল, বলিতে পারি না।"

এখানে লক্ষণীয় যে অক্ষয়চন্দ্র হুজুগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। তিনি

নীতিনিষ্ঠ, সমাজ সংস্কারে আগ্রহী। কিন্তু অসৎ হবার সামাজিক ও আর্থিক উপকরণকে তিনি যতটা দায়ী করেছেন, ততটা বিশেষ ব্যক্তি মোহন্তকে নয়।

২. শক্তিসাম্য :

শক্তিসাম্য নামে সাধারণীতে একাধিক প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এখানে সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র এমন একটি রাজনৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, যার বিশ্ব-ব্যাপী ধ্বংসাত্মক চেহারা বিশ শতকের আগে প্রকাশ পায়নি। ব্যক্তি-চরিত্রে যেমন অসূয়া, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতার সঙ্গে করুণা-প্রীতি-উদারতার সামঞ্জস্যবিধান প্রয়োজন, অন্যথায় পরিবারে অশান্তি, অমঙ্গল অনিবার্য। বিশ্বের বৃহৎ-পটভূমিতে দেখলে এই সামঞ্জস্যের সম্বন্ধটিকে 'শক্তিসাম্য' বলা যায়। সব মানুষ যেমন সমান নয়, তেমনি বিশ্বের সব জাতিও সমকক্ষ নয়। বিজ্ঞানের বলে উন্নততর, সমরশক্তিতে প্রবলতর কোন জাতি অনুন্নত, দুর্বলতর জাতিকে আক্রমণ করে সহজেই পদানত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের উপায় কি ? অক্ষয়চন্দ্রের মতে শক্তিসাম্য বিষয়ে বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হলেই এর সমাধান হতে পারে।

বিশ্বের মানব সমাজে স্থায়ী শান্তি ও মঙ্গলের জন্য চাই Balance of power বা শক্তিসাম্য। নেপোলিয়নের আগ্রাসী অভিযান এবং তৈমুর-চেঙ্গিসের ভারত অভিযান সমগোত্রীয়। প্রবলের শক্তিমদমত্ততা, আগ্রাসী ক্ষুধা, নিষ্ঠুরতা এবং দুর্বল জাতির প্রতি অহেতুক ঘৃণা উভয়ক্ষেত্রেই অভিযান কারীদের উদ্দীপিত করেছিল। ইংলণ্ড ও অন্যান্য জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল বলে নেপোলিয়ন ওয়াটারলু যুদ্ধে পরাজিত হলেন। শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা পেল। ভারতে একতা ছিল না। তাই তৈমুর-চেঙ্গিসের একতরফা নিধন যজ্ঞ চলেছিল।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখ্য অক্ষয়চন্দ্রের দূরদর্শিতা। তাঁর নেপোলিয়ন তৈমুর-চেঙ্গিসের দৃষ্টান্ত 'শক্তিসাম্য'-বিষয়ের মূল কথা নয়। মূল কথা হ'ল, দেশপ্রেমিক অক্ষয়চন্দ্রের ইংরেজ শাসনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি। প্রথমে বঙ্কিমী-কৌশলে ইংরেজ শাসনের জয়গান করেছেন। তারপরেই ভারতীয় সমাজের প্রতি ইংরেজ শাসকবর্গের উদাসীনতার কথা বলেছেন। এখানেই ইংরেজের ভারতীয় সম্পর্কে শক্তিসাম্যের অভাব। তাঁর কথায়, "যে রাজ সমাজের শক্তি-প্রভাবে বাণিজ্য পোতসমূহ নিরন্তর বিস্তীর্ণ মহাসাগরের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিতেছে—যে রাজ সমাজের শক্তিপ্রভাবে সুবিখ্যাত নীলনদের উদ্ভবস্থান

আবিষ্কৃত হইয়াছে—যে রাজ শক্তিপ্রভাবে ব্যোমযান প্রভৃতি উদ্ভূত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত সেই রাজ সমাজের ক্ষমতার সমতুলতা বিধান করা কর্তব্য।

এইরূপে সামাজিক শক্তিসাম্য রক্ষা করিলে বিশিষ্ট উপকার সাধিত হয়। এতদ্বারা পরস্পরের ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু সমাজ আর গর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া নিম্নসমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেপারে না।" (১২৮০-৯ই অগ্রহায়ণ)

ইংরেজ-ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে এই অসম দৃষ্টি যে মানবমূল্যেরই অপলাপ, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে শক্তিমদমত্তের আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা যে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধেই প্রশমিত হতে পারে, এই সিদ্ধান্তটি অক্ষয়চন্দ্রের বিচক্ষণ রাজনৈতিকবোধ ও ইতিহাস চেতনার পরিচয়বহ।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশপ্রণালী :

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ নিয়ে সেকালে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। অধিকাংশ ইংরেজ রাজপুরুষ এবং শিক্ষক ছিলেন শীতাবকাশের পক্ষে ; কেবল মেডিকেল কলেজে ছিল গ্রীষ্মাবকাশ। 'সাধারণী' ইংল্যাণ্ড ও ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন, গ্রীষ্মাবকাশই এদেশের ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কল্যাণকর। ইংলণ্ডীয় 'সামার' এবং ভারতীয় 'গ্রীষ্ম' ঋতুধর্মে ভিন্ন। ইংলণ্ডের শীত যত তীব্র, আমাদের দেশে তেমন নয়। বরং শীতেই পরিশ্রমের অনুকূল পরিবেশ থাকে। গ্রীষ্মে গলদঘর্ম হয়ে সহজেই ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লক্ষণীয় যে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভিমতও ছিল গ্রীষ্মাবকাশের অনুকূলে।

এখানে অক্ষয়চন্দ্রের ভাষাতেই সাধারণীর অভিমত উদ্ধৃত হল ; "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ছাত্রগণ অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। পরীক্ষান্তে কি ছাত্র কি অধ্যাপকবর্গ সকলেই এক এক মাস করিয়া অবকাশ পাইবেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য আছে, এই স্থানেই তাহা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কোন চিরন্তন নিয়মের অনিষ্টকারিতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইলে স্বার্থপর গোঁড়াদিগের নিকট অনেক সময়ে উপহসিত হইতে হয়। কিন্তু আমরা এরূপ উপহাসকে তুচ্ছজ্ঞান করি। ব্যক্তি বিশেষের সুখ ও সুবিধার জন্য সাধারণের অনিষ্ট করা আমাদিগের একান্ত অরুচিকর।

সকলেই বলেন, শীতকালে পরিশ্রম যোগ্য সময়। এসময়ে বিশিষ্ট পরিশ্রম করিলেও শারীরিক গ্লানি অনুভূত হয় না। প্রত্যুতঃ শরীর দ্রঢ়িষ্ট ও বলিষ্ট হইয়া থাকে। কেহই এই সর্ব্ববাদি-সম্মত মতের বিরোধী নহেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ জানিয়া শুনিয়া এই সর্ব্ববাদি-সম্মত মতের অন্যথাচরণ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতাবকাশ প্রণালী এই মতের একান্ত বিরোধী। ছাত্রগণ পরিশ্রমযোগ্য শীতকালে দপ্তর বাধিয়া লেপের তলে হাত, পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, ওদিকে চৈত্র-বৈশাখ মাসের দুরন্ত রৌদ্রে স্কুলে যাতায়াত করিয়া গলদ্ঘর্ম কলেবর হয়; এবং দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া শরীর জীর্ণ ও রুগ্ন করিয়া থাকে।

এই অনিষ্টের প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক। পরিশ্রমযোগ্য শীতকাল বৃথায় অতিবাহিত হইতে দেওয়া বিধেয় নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতাবকাশ-প্রণালী একেবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে মেডিকেল কলেজে যেরূপ হইয়া থাকে, সেই নিয়মের অনুসারী হওয়া অনুচিত নয়। মার্চ্চ মাসের শেষার্দ্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া একেবারে দুইমাস অবকাশ দেওয়া একান্ত বিধেয়।

অনেক স্বার্থপর ইউরোপীয় অধ্যাপক এই মতের প্রতিবাদ করিতে পারেন। শীতাবকাশ প্রণালী রহিত হইলে তাঁহাদিগের মৃগয়া প্রভৃতি আমোদের ব্যাঘাত হয়। গ্রীষ্মকালে দুই এক ঘণ্টাকাল তাঁহাদিগের যৎসামান্য পরিশ্রম করিতে হয়। কালেজে যাতায়াতের কষ্ট নাই—অধ্যাপনার কষ্ট নাই, অতএব তাঁহারা শীতকালের আমোদ ছাড়িবেন কেন? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির জন্য সমুদয় লোককে কষ্ট দেওয়া উদারতা ও ন্যায়পরতার লক্ষণ নহে।

কেহ কেহ ইংলণ্ড প্রভৃতির উদাহরণ দেখাইয়া শীতাবকাশ প্রণালীর প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ড শীত প্রধান দেশ। শীতের আধিক্য হেতু তথায় শীতকালে কাজ করিতে কষ্ট হয়। এতন্নিবন্ধন সেখানে শীতকালে অবকাশ দেওয়া হয়। শীতাতপ বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এক লক্ষণাক্রান্ত নহে। সুতরাং এখানে ইংলণ্ডের উদাহরণ প্রদর্শন বিড়ম্বনা মাত্র। সমুদয় বিষয়েই ইংলণ্ডের পুচ্ছধারী হওয়া অমানুষতার পরিচায়ক।

প্রধান প্রধান রাজ পুরুষগণের ব্যবহার দর্শন করিলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের আবশ্যকতা অনেকাংশে উপলব্ধ হয়। মার্চ্চ মাস পড়িতে না পড়িতেই রাজ-পুরুষগণ শৈল বিহারার্থ বহির্গত হন। কেহ সিমলা, কেহ দার্জিলিং কেহ

নীলগিরি আশ্রয় করিয়া পার্বত্য শীতল সমীরণ সেবন করিয়া থাকেন। এরূপস্থলে হতভাগ্য সুকুমার দেশীয় বালকদিগকে কষ্ট দেওয়া যারপরনাই অন্যায়। আমরা সর জর্জ্জ ক্যাম্বেলকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছি, তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অবকাশ প্রণালীর পঙ্কোদ্ধার করুন দেশের আশীর্বাদ ভাজন হইবেন। জনৈক কবি গঙ্গা-র স্তবকালে কহিয়াছেন ঃ—

"সুরধনী মুনিকন্যে তারয়েঃ পুন্যবন্তং
স তরতি নিজ পুন্যৈঃ তত্র কিন্তে মহত্বং।
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিতি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং ॥"

"হে জহ্নু কন্যে গঙ্গে! যদি তুমি পুণ্যবান ব্যক্তির উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার মহত্ত্ব নাই। কারণ পুণ্যবান ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলেই উদ্ধার হইয়া থাকেন। যদি তুমি গতিবিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর তাহা হইলে তোমার মহত্ত্ব, সেই মহত্ত্বই মহত্ত্ব ॥"

যাঁহাদিগের ধন ক্ষমতা আছে, ইচ্ছানুসারেই যাঁহারা আপনাদিগের সুবিধা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা গতিহীন দুর্বলদিগের উপকার সাধন করা সমধিক শ্রেয়স্কর।" (১২৮০-৯ই অগ্রহায়ণ, পৃষ্ঠা ৫১-৫২)

৪. সর্ জর্জ ক্যাম্বেল ঃ

একজন বড়লাটের শাসনকাল শেষ হলে, সে বিষয়ে তখনকার সাময়িক পত্রে একটি হিসাব নিকাশ করা হ'ত। আমাদের সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় উইলিয়ম বেন্টিক, লর্ড ক্যানিং, লর্ড কার্জন, লর্ডরীপন, সর্ জর্জ ক্যাম্বেল, গ্রে, রিচার্ড টেম্পল প্রমুখের শাসনকাল বিষয়ে সমকালীন মানুষের মনোভাব বিধৃত হয়ে আছে।

জর্জ ক্যাম্বেলের পর স্যর রিচার্ড টেম্পেলের নিয়োগ নির্ধারিত হলে সাধারণীতে অক্ষয়চন্দ্র এবং বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র জর্জ ক্যাম্বেলের মূল্যায়ন করেন। সেকালের অধিকাংশ সাময়িক পত্রেই ক্যাম্বেল সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু "নিরপেক্ষ" সাধারণীর ধারণা—"এ সময়ে তিনি থাকিলেই ভাল হয়।" কারণ অক্ষয়চন্দ্রের ধারণা "ক্যাম্বেল সাহেব নিতান্ত নরাধম না হইবেন।" ক্যাম্বেলের বৈশিষ্ট্য তাঁর "বেগস্পৃহা" ও "আলস্যে ঘৃণা"। লেখকের মতে, "ক্যাম্বেল সাহেব আর যদি কিছু না করিয়া থাকেন, আমাদের একটি মহদুপকার

করিয়াছেন ; জড় বঙ্গসমাজে তিনিই প্রথমে জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন। গ্রাণ্ট, বীটনে তাহা পারেন নাই। কেবল এই উপকারের জন্য বাঙ্গালীকে ক্যাম্বেল সাহেবের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে।" (১২৮০ ২৩শে অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৭৫-৭৬)

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্ জর্জ ক্যাম্বেল কয়েকটি পরিবর্ত্তন করেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, গ্রামের কৃষক, কামার প্রভৃতি বৃত্তিজীবী সাধারণ লোকেরা নিজেদের বৃত্তি ত্যাগ করে "উচ্চ পদাভিলাষী" হবে না। তাই গ্রামের পাঠশালা-গুলিতে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া অন্যবিষয়ে শিক্ষণ বাহুল্য বোধে নিষেধ করেছিলেন। অবশ্য ব্যতিক্রমের জন্য পথও খোলা ছিল। তার জন্য ক্যাম্বেল সাহেব ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তবু যে তিনি "জনসাধারণের যশভাজন" হতে পারেন নি, তার মূলে আমাদের দেশবাসীরই অজ্ঞতা। পূর্ববর্তী লেঃ গবর্নর গ্রাণ্ট সাহেবেরও পাঠশালা সংস্কারের অভিপ্রায় ছিল, অর্থাভাবে সে অভিপ্রায় তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি—সাধারণের এই বিশ্বাস সাধারণী সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র পোষণ করতেন না। ক্যাম্বেলের আমলে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা কমেছিল, তিন প্রেসিডেন্সীর সমস্ত আয় কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হ'ত, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার অর্থব্যয় করতে পারতেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সত্ত্বেও গ্রাণ্ট 'অর্থাভাবে' যা পারেননি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন বাধকতা সত্ত্বেও ক্যাম্বেল তা পেরেছেন। তাঁর আমলে ষাট হাজার টাকা ছাত্র বৃত্তি নির্ধারিত হয়েছিল। পরীক্ষা পদ্ধতিরও উন্নতি-মূলক রদ বদলের জন্য ক্যাম্বেল প্রশংসা পেতে পারেন। তাঁর আমলেই পাঠ্য গ্রন্থের বাইরে রচনাশক্তির পরীক্ষা দিতে হ'ত। হাতে লেখা ও নির্ভুল পঠন পরীক্ষার বিষয় হয়েছিল। জমী-জরিপ এবং পরিমিত সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ সন্নিবেশিত হয়েছিল। সারা পৃথিবীর ভূগোল, বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ভারতের ভূ-বৃত্তান্ত পাঠই পর্যাপ্ত বলে গণ্য হ'ল। এল, এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রদের মাসিক বৃত্তি তিনি ৩২ টাকা থেকে কমিয়ে ২৫ টাকা করেছিলেন, কিন্তু বৃত্তির সংখ্যা ৫০টি থেকে বাড়িয়ে তিনি ৬০টি করেছিলেন। এছাড়া ক্যাম্বেল বিশেষ বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় জর্জ ক্যাম্বেল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'সর্ উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ কাম্বেল' প্রবন্ধে দেশবাসীর ক্যাম্বেল বিরূপতার সম্পর্কে লিখেছেন, 'অসাধারণ দোষে দোষী, না অসাধারণ গুণে

গুনবান, বলিয়া তাঁহার এই নিন্দাতিশয্য হইয়াছিল।' তাঁর মতে, জর্জ ক্যাম্বেলের পূর্ববর্তী শাসকগণ 'কলের শাসন' দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করতেন, কিন্তু তিনি প্রশংসা বা নিন্দার বশবর্ত্তী না হয়ে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার গুণে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন বলেই 'লোকের বড় অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।' প্রসঙ্গত বঙ্কিমের মন্তব্য; 'জর্জ ক্যাম্বেল আপন বুদ্ধিতে চলিতেন; এ বৃহৎ রাজ্যশাসন জন্য চিন্তা করিতেন; উদ্দেশ্যগুলি স্থির করিয়া, তাহার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতেন; যে কার্য্য কর্ত্তব্য এবং সাধ্য বলিয়া বুঝিতেন, কিছুতেই তাহা হইতে বিরত হইতেন না। *** সর্ জর্জ ক্যাম্বেল, কাহারও নিকট সুখ্যাতি খুঁজিতেন না, কাহারও অনুরোধ রাখিতেন না। সম্বাদপত্র সকলকে ঘৃণা করিতেন, ব্রিটিশ ইঃ আসোসিয়েশনকে ব্যঙ্গ করিতেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র দোষ-গুণের ভিত্তিতে ক্যাম্বেল চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনি 'অত্যন্ত গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী, কৃষ্ণচর্ম্মে ঘৃণাবিশিষ্ট, পরোপদেশে বিরক্ত, স্বেচ্ছাচারী, অপ্রিয়বাদী, অপ্রিয়কারী, অন্যায়পর শাসনকর্তা' হলেও দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে তাঁর 'ক্ষিপ্রকারী এবং দূরদর্শী' মনোভাব সর্বজনবিদিত। এ ছাড়া ক্যাম্বেল ছিলেন 'বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত, পরিশ্রমী, এবং অধ্যবসায় সম্পন্ন।' বঙ্কিমের ধারণা; 'প্রজার কোন মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া থাকুন, বা না থাকুন, তিনি প্রজার হিতৈষী।' *** সর্ ক্যাম্বেলের মত বহুগুণে গুণবান ও বহুদোষে দোষী শাসনকর্ত্তা কেহই এদেশে আসেন নাই।'

এরপর লেখক কাম্বেলের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কেবলমাত্র সরাসরি বিচার প্রথার ব্যবস্থাপনায় ও জুরি আইনের কিঞ্চিৎ সংশোধন ছাড়া রোডশেষ আইন প্রবর্ত্তনে, দেশীয়-বিদেশীয় বিচারাগারে বৈষম্য দূরীকরণে এবং সর্বোপরি উচ্চশিক্ষায় ধনী-নির্ধনের সমান সুযোগদানে—তাঁর মহান দায়িত্ববোধের পরিচয়ই সুপরিস্ফুট।

৫. নাটকাভিনয়ঃ

সমকালীন শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কারের অঙ্গরূপেই সাধারণীতে নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নাটক কেবল নাটক নয়, তার বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য্য আছে। এ কথাটি এমনকি দেশহিতৈষী হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও বঙ্গদর্শনও যে উপলব্ধি করেননি, সে বিষয়ে আন্তরিক খেদ প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ১২৮০-১৮ই ফাল্গুন ও ১২৮১-২৪শে ফাল্গুনের দুটি বিশিষ্ট রচনার সারমর্ম দেওয়া হল।

আমাদের দেশের হিতৈষী সংবাদপত্রও বর্তমান কালের নাটক-অভিনয়ের গুনাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করেন না বলে সম্পাদক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কেননা অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসের মত নাটকাভিনয়ও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে পেশাদার গোষ্ঠীভুক্ত চারটি সংস্থা ছাড়াও আরও কত যে সকের নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে সে কথা গণনাতীত। ফলে এসকল নাট্যগোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের মনোরঞ্জনে এক বিরাট স্থান অধিকার করেছে। এবং এর ফলে নাটকাভিনয় যে আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করেছে সেকথা অক্ষয়চন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন এবং প্রসঙ্গত এই সমস্ত নাটকাভিনয়ের যে যথোচিত সমালোচনা করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য সে কথা স্মরণ করে দিয়েছেন।

কাব্য-উপন্যাসের চেয়ে নাটকের শিক্ষা ব্যাপকতর। লেখকের কথায়—"মনুষ্যত্বে দুঃখ কিরূপ জড়িত তাহা তুমি হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য তুমি শোকার্ত্ত হইলে; তুমি সকল মানবের জন্য দুঃখ করিতে শিখিলে; তুমি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করিয়া রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিলে। এ শিক্ষা সহস্র বিদ্যালয়ে দিতে পারে না।"

প্রসঙ্গত সম্পাদক বর্তমান কালে হাল্‌কাচালের নাটক যত্র তত্র অভিনীত হ'তে দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, সমাজের কৃতবিদ্যগণের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা একান্ত কর্তব্য। কেবলমাত্র রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছাড়া আর কেউ এ ব্যাপারে অগ্রসর না হওয়ায় বঙ্গীয় অভিনয় সমাজ যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে অনুরূপভাবে মানুষও এসকল প্রদর্শিত নাটক থেকে কোন বিশেষ শিক্ষা লাভ করতে পারছে না।

তাঁর ধারণা, ধর্মবেত্তাগণ যা পারেন, ভালো নাটকের অভিনয় সেই কাজ আরো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ সমাজ সংস্কার, চরিত্রগঠনে ভালো নাট্যাভিনয়ের ফলশ্রুতিরূপে সমাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি, "আমাদিগের বিবেচনায় গ্রন্থকারগণ যদি সমাজ সংস্করণে যত্নবান্ হয়েন, তবে অসার ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণাপেক্ষা তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা অধিক হয়। সমাজ সংস্করণ করিতে গেলেই সমাজস্থ লোককে সৎশিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। সেই শিক্ষা ধর্ম্মশালায় ও তৎসদৃশ স্থানে যে ভাষায় ও যে প্রকরণানুসারে প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী না হইয়া, বরং অনেকস্থলে ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির হইবা মাত্র ভুলিয়া যাইতে হয়।"

সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত "সেইজন্যই আমরা এরূপ প্রত্যশা করি যে, তাঁহারা যত্ন কারলে সমাজের যে পরিমাণে হিতসাধন করিতে পারেন, অন্য কেহই তেমন পারেন না।"

৬. বিচারক মনোনয়ন :

সেকালে দেশীয় লোকেদের সহজে জজয়তি দেওয়া হত না। ১৮৬১ সালে যখন হাইকোর্ট চার্টার তৈরী হল, তখন ঠিক হয়েছিল প্রধান বিচারালয়ে যতগুলি জজ থাকবেন, তার এক তৃতীয়াংশ ব্যারিষ্টার, এক তৃতীয়াংশ সিভিলিয়ানদের থেকে নেওয়া হবে। বাকী জজ হাইকোর্টের উকীল বা অচিহ্নিত কর্মচারী থেকে মনোনীত হবেন। এইভাবে প্রথম মনোনীত বাঙালী জজ রমাপ্রসাদ রায়, তিনি "বড় বাপের বেটা" (রামমোহন রায়ের পুত্র), তারপর শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং তাঁর মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ মিত্র ঐ পদে মনোনীত হন। যেহেতু এঁরা সকলেই প্রশ্নাতীত ভাবে সুযোগ্য ব্যক্তি তাই নিয়োগের পূর্বে সংবাদপত্রে কিছু বাদানুবাদ হলেও নিয়োগের পরে বিশেষ আলোড়ন হয়নি। দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পরে প্রশ্নটি আবার উত্থাপিত হয়। সদরআলা বনাম উকীলদের পক্ষ নিয়েই তুমুল বাদানুবাদ। অক্ষয়চন্দ্র মনে করেন উকীলদের দাবি-ই যুক্তি সম্মত। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি ; "বাস্তবিক কোন কোন বিষয়ে, সবজজের অপেক্ষা উকীল অধিকতর উপযুক্ত হইবারই সম্ভাবনা। ফৌজদারী কার্য্যে,একজন মফস্বলের দেওয়ানী হাকিম অপেক্ষা একজন সামান্য হাইকোর্টের উকীল যে বিশেষ পারদর্শী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন সবজজ এবং উকীলের আর একটি বিশেষ প্রভেদ এই যে, সবজজগণ ধীর, উকীলেরা দক্ষ। সদর আলাগণের এই ধীরতা হইতে ক্রমে গাম্ভীর্য, সংশয়, আলস্য, শৈথিল্য প্রভৃতি গুণ-দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ***তাহাদিগের অন্তর্বাহে কোথাও যে তাড়িত পদার্থ কিছুমাত্র আছে তাহা বোধ হয় না ; এদিকে উকীলেরা দক্ষ ; এই দক্ষতায় বাচালতা প্রভৃতি অনেক দোসের উৎপত্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যথার্থ গুণের সহিত এই দক্ষতা যখন জড়িত হয় তখন যে উকীলেরা সকল বিষয়ে প্রশংসাভাজন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?"

মহেন্দ্রনাথ বসু বনাম গিরিশচন্দ্র ঘোষের দাবি নিয়েই সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র মহেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যে 'ন্যূনকল্প' নন, সে বিবয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৭ হিন্দুবিবাহ প্রথা নিয়ে সেকালে বেশ বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ডিরোজিও প্রমুখের একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার নানা অধিবেশনে প্রচলিত বিবাহ বিধির ভাল-মন্দ লক্ষণ নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লাল-বিহারী দে যথাক্রমে 'ক্যালকাটা রিভিউ' ও 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' এ বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর অনুবর্তীরা এবং ব্রাহ্ম-সমাজের সমাজ সংস্কারকগণ প্রাচীন বিবাহরীতি, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহ -সহমরণ প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ। সাবিত্রী লাইব্রেরীতে চন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—'হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ও বয়স।' তারপরেই বিতর্কের সূচনা। টাকীর পটেশ্বরী অধিকারী, মজফরপুরের শিবদাস দেবী, ঢাকার শ্যামাসুন্দরী দেবী তার উত্তরে অনেক কথা লিখে পাঠান। এ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের মত,—'দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, স্ত্রী-মুক্ত হইলেন, তখন পিতা যাঁহাকে দান করিয়া-ছিলেন তিনি আর নাই। তখন অবশ্যই তাঁহার অন্যকে আত্মসমর্পণ করিবার অধিকার হইল। যখন তাহার পূর্ণ বিবাহই হয় নাই, তখন কেন-না সে বিবাহ করিতে পারিবে?' (অ. সা স প্রথমার্ধ পৃঃ—১৭৮)

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় অক্ষয়চন্দ্র বাল্যবিবাহের বিরোধী এবং বিশেষ অবস্থায় বালবিধবার পুনর্বিবাহে তাঁর আপত্তি ছিল না। সেকালের সেরা রক্ষণশীল পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিও এরূপ অবস্থায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি।

আসলে 'সহমরণ নিবর্ত্তক' রাজা রামমোহন রায়ের অভিমতও ছিল বিধবার ব্রহ্মচর্যের অনুকূলে। তাঁর উক্তি 'আহারাদি বিষয়ে নিয়ম-যুক্ত হইয়া সাধ্বী স্ত্রী কেবল ধর্ম আকাঙ্খা করিয়া ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠানপূর্বক থাকিবেন।' (ঐ, পৃঃ ১৭৪)

সামাজিক প্রবন্ধ—পারিবারিক প্রবন্ধের রচয়িতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এবিষয়ে বিশদ আলোচনার পর ব্রহ্মচর্য এবং সংসারের অপর সকলের হিত-চিন্তায় কালযাপন করাকেই বিধবার অনুষ্ঠেয় ধর্ম বলেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের অভিমত অনেকাংশে ভূদেব-প্রভাবিত। তাঁর সিদ্ধান্ত—'বিবাহ—কুললক্ষ্মীর কুলে প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যদ্ গৃহিণীর গৃহে অধিষ্ঠান। বৈদেশিক বিবাহের পরই যুবক-যুবতী মধুমাস—কুলভ্রষ্ট, গোষ্ঠীভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট হইয়া বাস করেন; আমাদের দ্বিরাগমনের

নবোঢ়া সমস্ত পরিবারের সম্রাজ্ঞী-সেবিকারূপে অর্ধহস্ত গুণ্ঠনে গুণ্ঠিত হইয়া কুটনা কুটিতে বসিলেন। হিন্দুর বিবাহ একটি কুলকর্ম—আত্মকৃতি নহে।' (ঐ, পৃঃ-১৭১)

সংক্ষেপে এ কথার সারমর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে, 'একটি পরিবারের সহিত একটি হিন্দু কুমারীর বিবাহ হয় ; কেবল একটি পুরুষের সহিত নহে।' (ঐ, ঐ)

২৮শে বৈশাখ ১২৯২ কলকাতার সাবিত্রী লাইব্রেরীতে অক্ষয়চন্দ্র 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তিনি বিধবা বিবাহের বিপক্ষেই মূলতঃ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য বিশেষ পর্যায়ে বালবিধবা বিবাহ তাঁর মতে শাস্ত্র বিরোধী নহে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১২৯২-৯৩ সালে 'কল্পনা' পত্রিকায় এ লেখাটির একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনাটিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস জানা যায়। তাই এখানে সেটি উদ্ধৃত হল ; হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা—লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। একদিন ইহা লইয়া দেশময় মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। কাগজে কাগজে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে, অনেক তর্ক, অনেক বিচার, অনেক শাস্ত্র মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। বিষয়টি অতি গুরুতর, বিচার করিতে গিয়া অনেক সময়ে মহাপণ্ডিতও নির্বাক হইয়া যান। অক্ষয়বাবু শাস্ত্রে যতদূর পণ্ডিত নহেন, কিন্তু শাস্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়া অতি সোজা কথায় এমনিভাবে তিনি ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে পড়িলে আর কোন পণ্ডিতের কোন যুক্তিই মনে লাগে না। অক্ষয়বাবুর মতে মত দিতেই হয়। লেখকের ইহা সামান্য ক্ষমতা নহে। অক্ষয়বাবুর ভাষায় আমরা চিরকাল প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার ভাষার মোহিনী শক্তি, সেই মোহিনী ভাষায় এ প্রবন্ধ লিখিত। সুতরাং পাঠক সহজেই মুগ্ধ। তিনি দেখাইয়াছেন, হিন্দুদিগের বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। বিবাহকালে কন্যা ধ্রুব-নক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া বলেন—

"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।

পতিকুলে ভূয়াসম্॥" —যে হিন্দুপত্নীকে পতিকুলে অচলা থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, সে কি কখন পতিকুল ত্যাগ করিতে পারে। যে বিবাহের অর্থ, হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায়

মিল, স্বামীর পরলোকগমনে কখন সে বিবাহ বন্ধন কি ছিন্ন হইতে পারে? তবে, অনেকে পরাশরের 'নষ্টে-মৃতে' শ্লোকের দোহাই দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, সে শ্লোক যেমন আছে, তেমনি ইহাও আছে যে, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" এখন দেখিতে হইবে কোন্‌টা শ্রেয়? অবশ্য মুখ্য ব্যবস্থার কাছে গৌণ ব্যবস্থা কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে পুনর্বিবাহ করে, সে ত কেবল আপনার জন্যই বিব্রত, নিকৃষ্ট বৃত্তির ঘোরতর বশীভূত, আর যে নারী মৃত স্বামীর অনুধ্যান করিয়া, বিনামূল্যে সংসারের সেবা করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিতে পারেন, তিনি নারী হইয়াও দেবী। বল দেখি, কোন্ যুক্তি ভাল? যে যথার্থ সতী নারী, সে কি কখনও পুনর্বিবাহের নাম মুখে আনিতে পারে? 'হিন্দুনারী জানেন কেবল একং এব অদ্বিতীয়ং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী, সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।' সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যে ভিন্ন হিন্দু বিধবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর নাই। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতার কথা কেহ কেহ তুলিতে পারেন। অক্ষয়বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, বলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার উত্তরে মোটামুটি এই বলি যে, সকল কাজেই সাধিলে সিদ্ধি। আমরা যদি রমণীদিগকে গোড়া হইতে তাহার উপযোগিনী করিতে পারি তাহা হইলে আর এজন্য ভাবিতে হয় না। নচেৎ যে পিতা কন্যাকে মেমের পোশাক পরাইয়া, চা রুটি খাওয়াইয়া, গড়ের মাঠের বায়ু সেবন করাইয়া তাহার শৈশব হইতেই তাহাকে ঘোর বাবু ও বিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন, সে পিতাকে অবশ্য সে কন্যার জন্য একটু ভাবিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু দোষ কন্যার না পিতার। যিনি সকল দোষ কন্যার ঘাড়ে চাপাইড়া আপনি সাফাই হইতে চান, তিনি ঘোরতর অধর্মী। তাই বলি, শৈশব হইতেই কন্যাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিনী করিলে ভবিষ্যতে আর কোন ভাবিতে হয় না। যে হতভাগিনী দিগের একবার কপাল পুড়িয়াছে, তাহাদিগকে পোড়ার উপর আর পুড়িতে হয় না। (পৃঃ—৫৭০—৭১)

১৮৮৭ সালের ৬ই আগস্ট তারিখে শোভাবাজার রাজ বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সভায় অক্ষয়চন্দ্র 'হিন্দুর পরিণয় প্রথা' (১৮৮৭, ৬ই আগস্ট) নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। সমকালীন কায়স্থ পাত্রদের অর্থলোভের পরিবর্তে কুল ভাঙ্গা দৃষ্টান্তে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। বস্তুত রচনাটিতে সমকালের প্রতিক্রিয়াই বেশি, শাস্ত্রগত বা বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ অল্প।

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন দেশবরেণ্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবনকথা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার' (শেষার্ধ)-এ 'স্মৃতি তর্পণ' নামে এগুলি চিহ্নিত হ'লেও আমরা বর্তমান নিবন্ধে 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' হিসেবে নির্দেশিত করেছি। কারণ এগুলি নিছক স্মৃতি-চারণা নয়। তাছাড়া, 'স্মৃতি-তর্পণ' নামটিও লেখকের দেওয়া নয়। সুতরাং বিষয়ানুসারে 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' নামই আমাদের সঙ্গত মনে হয়েছে। 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার'-এ সঙ্কলিত হয়নি এমন কয়েকটি ব্যক্তি প্রসঙ্গ 'সাধারণী' থেকে এখানে উদ্ধৃত করা গেল। সমকালীন ব্যক্তিদের মূল্যায়ন করা দুরূহ। পক্ষপাতের সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র যথাসাধ্য নিরপেক্ষভাবে ব্যক্তি-চরিত্রের মূল্যায়ন করতে পেয়েছেন। তাঁর 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' পর্যালোচনায় একটি লক্ষ্য বস্তু নির্দেশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরই জীবনে একটা চালিকা শক্তি আছে। কারো দেশপ্রেম, কারো সমাজকল্যাণ, কারো বা ঈশ্বরভাবুকতা, কারো পক্ষে সৌন্দর্যচর্চা। রচনাগুলিই আমাদের ধারণাকে সমর্থন করে।

এই অংশে অক্ষয়চন্দ্রের সাংবাদিক মনের পরিচয়ই উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ পূজনীয় মনস্বীদের জীবন চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এ আলোচনাভাগে সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মানুষের জন্যও তাঁর প্রাণ বিগলিত হয়েছে। বলা প্রয়োজন, প্রত্যেকটি চরিত্র অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এরূপ আলোচনায় লেখকের মহান ও উদার মনের পরিচয় পাই। অক্ষয়চন্দ্র যে সব ব্যক্তির চরিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন তারা যথাক্রমে হলেন,—'মৃত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর' (১২৮০), 'অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র', (ঐ), 'কেদারনাথ দাস' (ঐ) 'মৃত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র' (ঐ), 'মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর' (১২৮১), 'সুবিখ্যাত জমীদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়' (ঐ), 'মৃত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার' (ঐ) 'বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (ঐ), 'মৃত মহাত্মা থোয়েট্‌স্ সাহেব' (১২৮২)। এ ছাড়া 'শিক্ষাবিভাগে মহামারী' (ঐ) নামক শিরোনামায় শিক্ষা জগতের ইন্দ্রপতনে

বিভিন্ন শিক্ষাবিদের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

যে সব ব্যক্তির চরিত্র 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার' (শেষার্ধ)-এ স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন, 'মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার' (পৃঃ-৪১৯-২২), 'অক্ষয়কুমার দত্ত' (পৃঃ-৪২৩-২৮) 'কবি নবীনচন্দ্র সেন' (পৃঃ-৪২৮-২৯), '৺সুরেন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয়' (পৃঃ-৪২৯-৩১), 'হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র' (পৃঃ-৪৩১-৩২), 'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী' (পৃঃ-৪৩৩-৩৪), 'মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি' (পৃঃ-৪৩৪-৩৭), 'প্যারীচরণ সরকার' (পৃঃ-৪৩৭-৩৯)।

'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী' ছাড়া 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারে' স্থান পেয়েছে এমন ব্যক্তি চরিত্রের আলোচনায় বিরত থেকে, অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে অন্য ব্যক্তিদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় একে একে বিবৃত করা গেল।

'মৃত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখকের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির অকাল প্রয়াণে অক্ষয়চন্দ্র তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিজেও শোকে মুহ্যমান। তাঁর অভিমত এই যে দীনবন্ধুর মত সুহৃদ জন্মান্তরেও লাভ করা যায় না। হয়ত তাঁর মত বিদ্বান, রায় বাহাদুর, ইনস্পেকটিং পোস্টমাষ্টার ও নাট্যকার জন্মগ্রহণ করবেন সত্য, কিন্তু এরকম ব্যক্তির সাহচর্য পরম সৌভাগ্যের ফল। পরিশেষে তাঁর কথা স্মরণ করে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "বঙ্গদেশে এমন ভদ্রলোক নাই যে দীনবন্ধু বাবুকে জানেন না। কাহারও মুখে কোনদিন তাঁহার নিন্দা শুনি নাই। সকলেই তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেন। তাঁহার বন্ধু সংখ্যাও বিস্তর। তাঁহার জন রোদন করিতেছে। * * * নীলদর্পণের প্রণেতার জন্য দরিদ্র প্রজারা কাঁদিতে থাকুক, লীলাবতীর জনকের জন্য কুলীনকন্যা কাঁদিতে থাকুক, আমরা দীনবন্ধু বাবুর জন্য কাঁদিতে থাকি।"

সংক্ষিপ্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়চন্দ্র 'অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রে'র পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন। লেখক রামচন্দ্রের বিভিন্নমুখী প্রতিভা অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, রামচন্দ্র মিত্র বেথুন সোসাইটির প্রথম সম্পাদক এবং উনিশ শতকের বহু বিদ্বৎসভার সদস্য ছিলেন।

'কেদারনাথ দাস' প্রসঙ্গে লেখক তাঁর জন্মস্থান, কর্মজীবন ও শিক্ষা জীবনের কথা উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। কেদারনাথ দাস নিম্নশ্রেণী ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ কর্মদক্ষতার গুনে কিরূপে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার সবিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য, "কেদারবাবুর

জন্য আমরা যে সকলকে আন্তরিক দুঃখিত হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কোন কোন বিষয়ে কেদারবাবু অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পদ তাঁহার স্বকৃত সমাজের সর্ব্বাধস্তন স্তর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বাহুবলে তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী বাঙ্গালি কর্মচারীদিগের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

উপরন্তু কেদারনাথ পূর্ব প্রচলিত জাতিগত প্রথার বেড়ি উন্মোচিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, "কেদারনাথ, বীরদর্পে এ শিকল ভাঙ্গিয়া, বিনা টিকিটে এই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের যত্ন রক্ষিত নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকে আজিকালি প্রবেশ করিতেছে বটে, কিন্তু কেদারনাথের মত কেহ না।"

পরিশেষে অক্ষয়চন্দ্র কেদারনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন এরূপ চরিত্র ও মনীষী বাংলাদেশে বিরল। জাতিতে নাপিত হওয়ায় এবং পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের * গৃহে যে ক্ষৌর কর্ম করতেন, একথা কেদারনাথ কখনও ভুলে যায়নি। ফলে সমাজের লোকেরা তাঁর এরূপ উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ও সকলের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারায় লেখকের আক্ষেপোক্তি প্রকাশ পেয়েছে,—"এই যে নাপিতপুত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের সমকক্ষ হইয়া পরিভ্রমণ করিত, ইহাই অনেকের কষ্টকর—আমরা জিজ্ঞাসা করি কেন? নীচজাতি—হাড়ি হউক, মুচি হউক,—সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, এবং বুদ্ধিমান হইলে, বুদ্ধিশূন্য চট্টোপাধ্যায় এবং নির্দ্ধন বসুর উপরে বসিবে না কেন? সমাজের কঠিন জাতিবন্ধন হেতু ইহা ঘটিতেছে না। ইহা সমাজের গুরুতর দোষ। যতদিন না নীচজাতির উন্নতির পথ প্রকৃতরূপে পরিষ্কৃত হয়, যতদিন না সহস্র সহস্র কেদারনাথ দাস দেখিতে পাই, ততদিন ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে না।" এখানে বলা প্রয়োজন যে উপর্যুক্ত মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে জাত্যাভিমান যতদিন পর্যন্ত না সমাজ থেকে দূরীভূত হয় ততদিন যে সমাজ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না সেকথাই প্রকারান্তরে লেখক ব্যক্ত করেছেন।

'মৃত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র'-র মৃত্যু সংবাদের কথা যথোচিত সময়ে প্রকাশ করতে না পারার ঘটনাকে লেখক অতি সুন্দর উপমার সাহায্যে বলেছেন,

* যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:—শ্যামাচরণ-সঞ্জীবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-পূর্ণচন্দ্র প্রমুখের পিতা। তিনি ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন (দ্র. বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। গঙ্গাচরণ সরকারের সঙ্গে তাঁদের সৌহার্দ ছিল।

যে ইন্দ্রজিতের পতন হওয়া সত্ত্বেও কেহই যেমন তা রাবণ রাজের কাছে ব্যক্ত করতে অগ্রসর হয়নি তদ্রূপ 'বঙ্গবাসিগণের সমীপে ভগ্ন দৌত্যে গত সপ্তাহে অগ্রসর হই নাই।'

প্রথমেই অক্ষয়চন্দ্র ১২৮০ সাল যে বাঙালীর পক্ষে বিষম শোকের, তার কথা স্মরণ করে বলেছেন যে 'আমাদের কপালে আরও কত ভোগ আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব।'

এরপর লেখক দ্বারকানাথ সম্বন্ধে আলোচনায় বলেছেন যে, দ্বারকানাথ জাতিতে শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজ যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ের গুণে পরবর্তীকালে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গভীর পড়াশুনোয় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

লেখক বলেছেন যে, ইংরেজ জাতি বাঙালীকে অকর্মণ্য, অযোগ্য, অপদার্থ বিশেষণে ভূষিত করলেও বাঙালী যে তা নয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ দ্বারকানাথ মিত্র। এরূপ ব্যক্তির প্রয়াণে অক্ষয়চন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে এক্ষণে এমন আর কোন ব্যক্তি নেই যিনি বাঙালীর গৌরব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। প্রসঙ্গত অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য,"নিন্দুক ইংরাজ আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া, অযোগ্য বলিয়া, নিন্দা করিলে, আমরা তৎক্ষণাৎ দ্বারকানাথকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিতাম, এখনও তোমার নিন্দা করিতে সাহস হয়? এখন আর কাহাকে দেখাইব? কি দেখাইয়া স্পর্ধা করিব? মহাকাল কায়স্থ কুল নির্মূল করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছে; বাঙ্গালার কৃতকর্ম্মা কৃতবিদ্যগণকে সংহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।"

পরিশেষে লেখক দ্বারকানাথের জন্মস্থান, পিতৃদেবের নাম ও বিদ্যাশিক্ষার উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কারণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

"মৃত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর" প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে ১২৮০ সাল কায়স্থ কুলের ক্ষয়সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে দুর্ব্বৎসর যাইবার কালে কায়স্থকুলচূড়ামণি, কায়স্থ গোষ্ঠীপতি রাজা কালীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" উপরি-উক্ত-উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে লেখকের কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও কায়স্থকুলের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

১২৮০ সালের ৩০শে চৈত্র ৬৭ বছর বয়সে ৺কাশীধামে কালীকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার ও হিন্দু সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে য়ুরোপের

রাজমণ্ডলী তাঁকে স্বর্ণপদক উপহার দেন। মহারাণী ও তাঁর 'জ্যেষ্ঠ তাতঃদ্বয়ের' সঙ্গে কালীকৃষ্ণের পত্র বিনিময় হয়েছিল। উপরন্তু "কাশ্মীররাজ, অযোধ্যারাজ, ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি, জয়পুরাধিপতি, হায়দারবাদাধিপতি, এবং পঞ্জাবাধিপতি মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ ছিল।" বলা বাহুল্য, উল্লিখিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতা কোনদিনের জন্য প্রকাশ পায়নি। ফলে দেশের লোকের ও আত্মীয়গণের কাছে পেয়েছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। মাতৃসেবায় অত্যধিক অনিয়মের দরুণই "দগ্ধকাল তাঁহাকে হরণ করিয়াছে।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সেই মাতা এখনও জীবিতা। পরিশেষে তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "অভাগিণীর কি কষ্ট। শমনের পাত্রা-পাত্র, বর্ষজ্ঞান নাই। কিন্তু আমরা সে কথা একবার ও মনে করিনা। কি আশ্চর্য।"

হুগলী জেলার সুপরিচিত বিখ্যাত জমীদার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীধামে' ৭৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করলে অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী'র পৃষ্ঠায় তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রতিভা সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং তাঁর পুত্রদ্বয় যাতে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে খ্যাতিমান হ'তে পারেন তার কথা উল্লেখ করেছেন।

'মৃত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার' প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সদালাপী, দানশীল ও সর্বোপরি প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বজন পরিচিত ছিলেন তা "এই ভগ্নাবস্থ নগরের পক্ষে এক্ষণে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়।" বলা বাহুল্য, এতদ্বিধ গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাজ নিয়ম অগ্রাহ্য করে ধনবৃদ্ধি করার অপরাধে তাঁর রাজদণ্ড ঘটে। অবশেষে "জীবন নাটকের তৃতীয়াঙ্কের অভিনয় ক্ষেত্র চুঁচুড়ায় আর না বাস করিয়া, কলিকাতার মানব জঙ্গলে, বনবাসে দিনযাপন করেন; এইরূপে একাদিক্রমে বিংশতি বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া, এতদিন পরে 'জলের বিম্ব জ'লে মিশাইয়া গিয়াছে।'

অক্ষয়চন্দ্র দো-দমা বাজীর সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণের চরিত্রের তুলনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দো-দমা বাজীতে অগ্নি সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে সে যেরূপ নিজমূর্ত্তি ধারণ করে সশব্দে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে,পুনরায় উর্দ্ধমুখী হয়ে ভয়ানক শব্দে বিস্ফোরণ ঘটায় 'প্রাণকৃষ্ণ হালদার তাই। ১১ই আশ্বিন নীল আকাশে নীল ফুল মিশাইয়া গিয়াছে।'

এরপর লেখক প্রাণকৃষ্ণের চরিত্রের আলোচনা করেছেন। সাধারণত 'ধর্ম্মোপদেশক' পাপকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকলেও অক্ষয়চন্দ্র তাঁদের মতকে

খণ্ডন করে বলেছেন, "পাপকে ভয় কর; পাপকে ভক্তি কর; পাপকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, পাপের মত মর্ম্মভেদক উপদেষ্টা আর নাই। প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জীবন এই সংসার গ্রন্থের উপদেশ কাণ্ড। প্রাণকৃষ্ণ পাপ, পুণ্য, পরীক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত। তদীয় জীবনের নাম 'চিরদিন কখন সমান না যায়'; তাঁহার জীবনের নাম 'শিক্ষা'; তাঁহার জীবনের নাম, 'উদাহরণ'; তাঁহারই জীবনের নাম, 'মানব জীবন'।" প্রসঙ্গত দুর্যোধনের প্রভূত ঐশ্বর্যের কথা এবং পরিণামে তাঁর শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করে বলেছেন,—'তুমি আমি কবে, কি ঘোরতর পাপ করিব? তাহা কে বলিতে পারে? তাহাতেই বলি পাপের অধঃপতন দেখিয়া উপহাস করিও না।'

উপসংহারে মুকুট মাথায় 'মহানিদ্রায় শায়িত' দুর্যোধনকে যখন ভীম পদাঘাত করেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যুধিষ্ঠির ভীমকে যা বলেছিলেন অক্ষয়চন্দ্রও প্রাণকৃষ্ণ হালদার সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন; 'যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিয়াছিলেন যিনি প্রতিদিন পঞ্চজনকে অন্নদান করেন, তিনি মহাশয় ব্যক্তি, প্রাণকৃষ্ণ যত দোষে দোষীই হউন, প্রাণকৃষ্ণ একজন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি অকাতরে নিত্য নিত্য শত সহস্র লোককে অন্নদান করিতেন, তদীয় বদান্যতা অতুল্য। এই বদান্যতার সহিত পাপের বিবাহ বন্ধন দেখিয়া শিক্ষা কর; সেই বিবাহের ফলস্বরূপ তদীয় জীবনপ্রপাতের বজ্রঘোষ ধ্বনি হইতে উপদেশ শিক্ষা কর।'

সাহিত্য জগতে চিরপরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে একজন চিন্তাশীল ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, অক্ষয়চন্দ্র তাঁর অকালপ্রয়াণে সে কথার উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখা লিখলেও তা তাঁর বন্ধুবর্গ ছাড়া আর বিশেষ কেউ জানতে পারেনি। কেবলমাত্র 'জহুরী ভূদেববাবু এই জহর চিনিতে পারেন; ও তাঁহাকে ডেপুটী ইনস্পেক্টরী কর্ম্ম দেন।' শরৎবাবু ভূদেবের এডুকেশন গেজেটেও লিখতেন।

'মৃত মহাত্মা থোয়েট্স্ সাহেব'-এর আলোচনায় অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন যে, থোয়েট্স্ কেবলমাত্র তাঁর শিক্ষাগুরু হিসেবেই নয়, চুঁচুড়ার প্রতিটি মানুষের অতি আপনজন ছিলেন। ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার ও কর্ম দক্ষতার গুণে তিনি সকলের মন জয় করেছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে 'এতন্নগর বাসী সমস্ত লোক তদীয় বিয়োগ শোকে একেবারে অভিভূত হইয়াছে।'

সিংহরাশির সমস্ত গুণই থোয়েট্‌স্ এর মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ণ। তাই ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে তিনি ছিলেন সর্বদা যত্নবান। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও নগরীর উন্নতি-বিধানে তাঁর প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয়। তিনি চুঁচুড়া হুগলী কলেজে সর্বপ্রথম বি.এ. কোর্স প্রবর্ত্তন করেন। এবং পুস্তকাগারের সমৃদ্ধি ঘটান।

পরিশেষে অক্ষয়চন্দ্র বহুবিধ গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করলেও থোয়েট্‌স্-এর মত গুরুর সাহচর্য্য লাভ করা যে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। ইংরেজের যাবতীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়নি। উপসংহারে গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন ; 'থোয়েট্‌স্ সাহেব সাহেবদিগের মধ্যে অসাধারণ সৌভাগ্যশালী। তিনি অনুকম্পা না করিয়া ভালবাসিতে পারিতেন, ঘৃণা না করিয়া দয়া করিতে জানিতেন, জয়ী-জিতভাব বিস্মৃত হইয়া বাঙ্গালি মধ্যে বিচরণ করিতে পারিতেন। তিনি প্রকৃত সিংহরাশির লোক ছিলেন ; সহজেই কোপনস্বভাব—কিন্তু তিনি 'নীগর' বলিয়া গালি না দিয়া বাঙ্গালিকে ভৎর্সনা করিতে পারিতেন ; আর ধর্ম্মযাজকগণ ভজনামন্দিরের' উচ্চবেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া নীগরগণের নিন্দা করেন,—তাহাতেই বলি থোয়েট্‌স্ সাহেব বিশেষ সৌভাগ্যশালী সাহেব ছিলেন।'

'শিক্ষাবিভাগে মহামারী' নামক শিরোনামায় অক্ষয়চন্দ্র শিক্ষাবিভাগের শোচনীয় দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এই দুরবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে ১২৮২ সাল ভারতবাসীর জীবনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর করালছায়া কি নিদারুণ শেল বিদ্ধ করেছিল তার উল্লেখ একে একে করেছেন। প্রসঙ্গতঃ গণিত শাস্ত্রবিদ অধ্যাপক বিবি সাহেব, উইলসন সাহেব, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা আর্ট কিন্সন, সাহিত্যাধ্যাপক দেশহিতৈষী প্যারীচরণ সরকার, সরস্বতীর বরপুত্র লব সাহেবের কথা বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষাবিভাগের এরূপ অধঃপতনে চিন্তাশীল অক্ষয়চন্দ্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী' প্রসঙ্গটি একটু অভিনব। ইংরেজ আমলে লাঠিখেলা দেখিয়ে স্ত্রীলোক চৌকিদারের পদ পেয়েছে—এরকম ঘটনা বেশি শোনা যায় না। দ্রবময়ী সেইরকম এক বাঙালী বীরাঙ্গনা। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি ; 'জগতে অনেকেই বড়লোকের বড় কথা লইয়া ব্যস্ত, ইতিহাস ত বিশেষ ব্যস্ত। কিন্তু দুই-একটা গরীব-দুঃখী সামান্য লোকের কথা ইতিহাসে থাকিলে ক্ষতি

কি ? *** ইতিহাসে ক্ষুদ্রের স্মৃতি-চিহ্ন থাকিলে ইতিহাসের কলঙ্ক হয় না।' বলা বাহুল্য, দ্রবময়ী এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মানবী হওয়া সত্ত্বেও এক অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে সকলকে বিস্মিত করেছিল।

প্রথমে লেখক তার পরিচয় ও বাসস্থান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এরপর ঘটনা প্রসঙ্গের আলোচনায় লেখক দ্রবময়ীর অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও সাহসিকতার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। এই ঘটনা লেখক দ্রবময়ীর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তাই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

উল্লেখ্য ঘটনা, ৩০।৪০ বছর পুর্বেকার। এ সময়ে দেশে দস্যুবৃত্তি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বৈকুণ্ঠ সর্দার ছিল এ সময়কার গ্রামের সেরা লাঠিয়াল। তার মৃত্যুতে স্ত্রী দ্রবময়ী পদটির জন্য দরখাস্ত করে। কর্তৃপক্ষ বর্ধমান পুলিশের বড় সাহেবের কাছে দ্রবময়ীর মারফৎ সেই দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলে তাকে কঠিন লাঠিখেলায় অবতীর্ণ হতে হয়। দু'জন পুরুষ একত্রিত হয়ে তাকে পর্যুদস্ত করা দূরে থাকুক, গায়ে একটি আঘাত পর্যন্ত করতে পারে নি। তখন হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের বড় সাহেব তার লাঠিখেলায় মুগ্ধ হয়ে মৃত স্বামীর চৌকীদারী পদটি তার নামে মঞ্জুর করেন। 'দ্রবময়ী এখন স্বর্গে।'

এই রচনাটির সমালোচনা 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩১৮, ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা পৃঃ-৯৯) যা বার হ'য়েছিল তা যথার্থ। সেখানে উল্লিখিত হয়েছে ; "প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দ্রবময়ী চণ্ডালিনী' নাম্নী এক বীর নারীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসর আগেকার কথা। এই নারী হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের বড় সাহেবের সম্মুখে লাঠিখেলার অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়া তাহার মৃত স্বামীর চৌকীদারী পদ প্রাপ্ত হয়। দুইজন পুরুষ এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়াও দ্রবময়ীর গায়ে একটি আঘাত করিতে পারে নাই। উপসংহারে সরকার মহাশয় বলিয়াছেন "দ্রবময়ী এখন স্বর্গের চণ্ডাল লোকে।" স্বর্গেও তাহা হইলে ভয়ানক জাতিভেদ এবং ছুতের ভয়। 'সম্ভারে' লাইনটি বাদ পড়েছে। এরকম পংক্তি-বর্জনের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে।

প্রসঙ্গত 'বঙ্গশ্রী' (১৩৪১, ২য় খণ্ড পৃঃ-১৫৮) পত্রিকায় মুদ্রিত মন্তব্যটিও তুলে ধরা গেল ;—'বাঙ্গালা দেশে জন্মাইয়া সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া আজ প্রায় স্বপ্নের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের। *** প্রবন্ধটি একটি চণ্ডালিনী স্মরণে লিখিত। এই পুণ্যস্মৃতি চণ্ডালিনীর নাম

ও কাহিনী আধুনিক বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার অপরিচিত। আশা করি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ নাম সহজে ভুলিবার নয়।'

প্রবন্ধগুলি সাময়িক উদ্দেশে রচিত। এক. গ্রন্থ সমালোচনা দুই. মৃত্যু উপলক্ষে স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন। কিন্তু রচনাগুণে প্রবন্ধগুলি সাময়িকতার সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। কামিনী রায়ের শ্রাদ্ধিকী, বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'চরিতকথা' বা রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রতিভা' এই জাতীয় গ্রন্থ। অক্ষয়চন্দ্রের সামনে ছিল বঙ্কিমের তিনটি রচনা—ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু ও প্যারীচাঁদ। তবে বঙ্কিম সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আর অক্ষয়চন্দ্রের আলোচ্য কেবল সাহিত্যিক চরিতকথা নয়। সেখানে মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে কেদারনাথ দাস এবং চণ্ডালিনীরও স্থান আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের তুলনা নেই। বস্তুত সাময়িক উপলক্ষ্যে রচিত অথচ সামগ্রিক মূল্যায়নে 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বে'র আলোকিত পরিচয় সবচেয়ে সার্থকভাবে পাই রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্র পূজা'য়। মহাকবির সে বাগ্‌বৈভব সাংবাদিক অক্ষয়চন্দ্রের কাছে আশা করা যায় না। কিন্তু তিনিও অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, থোয়েট্‌স্ বা হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের সারভাগ আমাদের কাছে সার্থকভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। এ জন্যই 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' শিরোনামটি আমাদের সঙ্গত মনে হয়েছে।

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা

অক্ষয়চন্দ্রের 'সাহিত্যসম্ভার' দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য লেখা ছয়টি কোন খণ্ডে স্থান পায়নি। প্রথম রচনাটি কবিতা,—নাম "মঙ্গলাচরণ"। এটি বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্র অনুসরণে রচিত এবং "সুবোধিনী পত্রিকায়" (দ্বিতীয় খণ্ড—১ম সংখ্যা ১২৯৮ পৃষ্ঠা-১) ও "বসুধা" পত্রিকায় (১৩শ বর্ষ ১৩২০, ১ম সংখ্যা পৃষ্ঠা-ঐ) প্রকাশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়টি "আমাদের কথা" "পূর্ণিমা" পত্রিকায় (১৬শ বর্ষ, ২য়—১২ সংখ্যা—১৩১৫ পৃষ্ঠা ১৩৯-৫০) প্রকাশিত হয়েছিল। ঘুম স্টেশনের কাছে বৌদ্ধ মঠের প্রার্থনা সঙ্গীত শুনে অক্ষয়চন্দ্র সাঁওতালী গানের সঙ্গে তার সুরসাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন এবং পরে বাঙালীর সঙ্গীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেছেন।

বাঙালী সঙ্গীত সাধকদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছেন; "সেই সাধনার অসাধারণ ফল এখন কি ঔদাসীন্যে অবহেলায় নষ্ট করিতে হইবে? তোমরা স্বদেশী হইয়াছ, এই কি দেশের প্রতি মমতা? জগতের অতুল্য স্বদেশী নিধি অবহেলায় হারাইবে?"

এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের শিষ্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা' স্মরণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়টির নাম "প্রায়শ্চিত্ত"। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলে অক্ষয়চন্দ্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (মানসী, ফাল্গুন ১৩১৯ পৃষ্ঠা-৪৫-৫০)। তাঁর মূল কথা বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা ভারতকে ছেড়ে বঙ্গ-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এবং সেই পাপেরই ফল রাজধানী স্থানান্তর। 'অয়ি ভুবন মনমোহিনী' গানের ভারতচিন্তা 'বাংলার মাটি বাংলার জলে' সঙ্কুচিত হয়েছে। তাই সবশেষে লেখক এই 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' হতে মুক্তি লাভের জন্য সকলকে রাজনীতির অন্ধমোহে নিমজ্জিত না হ'য়ে ধর্মভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন; "কেবল রাজনীতি রাজনীতি করিয়া উন্মত্ত হইও না। একবার ধর্মের চক্ষে এই রাজধানী-পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা দৃষ্টি কর, করিয়া ইহা ধর্মসঞ্চয়ের সোপান বলিয়া মনে করিয়া ধন্য হও।"

চতুর্থটিতে পল্লীজীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণিত হয়েছে। (বসুধা, ১৩২১ ফাল্গুন পৃষ্ঠা ৩৪০-৪৪)। অক্ষয়চন্দ্রের পল্লীজীবনের প্রতি মমতাবোধ জন্মাবধি ছিল। তাই পল্লীজীবনের সম্পাদক হিসেবে তিনি পল্লীর দুঃখ-দুর্দশা, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অস্বাস্থ্যহীনতা ও জলকষ্টের দরুণ নাগরিক জীবনের চরম বিপর্যয়কে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন আলোচ্য রচনাটির মধ্যে দিয়ে।

পঞ্চমটি 'বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩, ১ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ২৩-২৪)। এ অংশে অক্ষয়চন্দ্র বাঙালী মেয়েদের গৃহস্থালীর কথা ও সেঁজুতিব্রতের চিত্র প্রকরণ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। রচনাটি সম্বন্ধে 'সাহিত্য' পত্রিকায় এক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের সুযোগ্য শিষ্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ষষ্ঠটি "সমুদ্র-যাত্রা"। অক্ষয়চন্দ্রের 'সমুদ্র-যাত্রা' সময়োপযোগী একটি বিশিষ্ট রচনা। কেননা এই 'সমুদ্র-যাত্রা' নিয়ে সেকালে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'য়েছিল এবং প্রায় প্রত্যেক পত্র-পত্রিকায় এর তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে (দ্র· গৃহস্থ, চৈত্র ১৩২০ পৃঃ-৫৫৬-৭৩)। বঙ্কিমচন্দ্রও এ প্রসঙ্গে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

অক্ষয়চন্দ্র 'গৃহস্থ' (মাঘ ১৩২০ পৃষ্ঠা ৩৬২-৬৬) পত্রিকায় এ রচনাটি লেখেন। তিনি সেকালের জনপ্রিয় ছ'খানি প্রামাণিক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের মতে, সমুদ্র-যাত্রা অশাস্ত্রীয় বা নীতিবিরুদ্ধ নয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি বিশেষ ক'রে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের রচিত ইংরেজি পুস্তকখানিকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে নির্বাচিত করে বলেছেন, 'রাধাকুমুদ বাবুর ইংরাজী গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব।'

এ প্রসঙ্গে প্রবাহিনী সম্পাদকের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

মঙ্গলাচরণ

ভৈরব—একতাল

নারায়ণ-হৃষীকেশ-কেশব-অচ্যুত-হরি।
জনার্দ্দন-পদ্মনাভ মাধব মুরারি ॥
নবীন নীরদ শ্যাম, নীলতনু অভিরাম,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা ধারী।
সুরষ-মণ্ডল বাসী, সরসিজাসনে বসি,
উজারি দশদিশি অচিন্ত্য বিহারী;
কনক-কেয়ুর করে, কুণ্ডল করণ পুরে,
পূরট কিরীট শিরে, কিরণ-বিথারী।
গায়ত্রীর উপলক্ষ, ভক্তের ভজন লক্ষ্য,
বিশ্ববীজ, বিশ্বপ্রাণ, বিপদ কাণ্ডারী;
রাস-রসিকবর, নটবর রাসেশ্বর
আনন্দ-কন্দর ত্বং হি সুন্দর শৌরী ॥

২. আমাদের কথা

দার্জিলিঙের পথে গুম্ ষ্টেসনের নিকট ভুটিয়াদিগের বৌদ্ধমঠে, সেদিন অপরাহ্নে যখন বৈকালিক স্তব পাঠ শুনিতেছিলাম, তখন একটা কথা লক্ষ্য করিয়াছিলাম—বৌদ্ধ মঠাধারীদিগের স্তব গীতির সুর এবং তাল অনেকটাই ৺বৈদ্যনাথের নিকটস্থ সাঁওতালদিগের মত। তাল-পাহাড়ীদের পটতাল। সুর কি তাহা ঠিক বলিতে পারিবনা,—তবে একজন মুসলমান ভিক্ষুক, মঠের বাহিরে, অথচ অতি নিকটে বসিয়া মুল তানে গজলের মত গাহিতেছিল, ভিতরের বাহিরের সুরে বিশেষ গরমিল হইতেছিল না। যাঁহারা সাঁওতালের নাচ দেখিয়াছেন, গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা—'কিন্ধিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা' এই বোলে মাদল বাজিতে ও এইরূপ তালে

সাঁওতাল সাঁওতালনীকে নাচিতে গাহিতে শুনিয়াছেন, স্মরণ করিবেন। প্রায় ঠিক সেইরূপ তাল ও সুরে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সম্মুখস্থ বিরাট গ্রন্থ হইতে স্তব পাঠ করিতে ছিলেন। কোথায় হিন্দু সভ্যতা পরিবেষ্টিত সাঁওতাল ভূমি,—আর কোথায় হিন্দুস্থানের সীমান্তের তিব্বত প্রান্তের দার্জিলিং প্রদেশ? তবে সুরে তালে—এত মিল কেন? পাহাড়ের সহিত এই সুর তালের কোন সম্বন্ধ আছে নাকি? বোধ হয় আছে। এইসকল দূর দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে, আমি নিকটের কথাও ভাবিতেছি—আমাদের বাঙ্গালির বা বঙ্গদেশের তাল বা ছন্দেরও ত বৈশেষিকত্ব আছে। আছে বৈকি? ভাষা বল, গান বল, তাল বল, ছন্দ বল সকলই দেশকাল পাত্র লইয়া নিয়মের অধীন। অনিয়মে, বা অকস্মাৎ কোন কিছুই হয় না। আমাদের বাঙ্গালির ভাষায়, গানে, তালে ছন্দে, আমাদের বাঙ্গালীর জল বায়ুর ছাপ আছে, বৌদ্ধযুগের বা মুসলমান সময়ের, অথবা ইংরেজ অধিকারের ছাপ আছে, আর পাত্রের -বাঙ্গালির আভিজাতিক ছাপ আছে; এই সমস্ত ছাপের গুণে বা রীতির ভঙ্গিতে, প্রাকৃতিক বলের তাড়নায়, বাঙ্গালির ভাষাগান তাল ছন্দ সকলই হইয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ রীতি নীতির কথা বলিতেছি না; নতুবা ঐসকলে যে ঐরূপ ছাপ নাই—একথা কেহ বুঝিবেন না।

আর বঙ্গ শব্দ 'বাঙ্গাল' দেশ—এমনটাও কেহ বুঝিবেন না। বাকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, দিনাজপুর—এসকলই বঙ্গদেশ। আসামে আমাদেরই অক্ষর; মিথিলায়ও এক শ্রেণীর মধ্যে এই বঙ্গাক্ষর; উড়িষ্যায় ছাঁদে বিভিন্ন হইলেও—সেও এক প্রকার বঙ্গাক্ষর; এইরূপ বঙ্গাক্ষর যে সকল দেশে প্রচলিত আছে—সেই সমস্ত ভূখণ্ডকে বঙ্গদেশ বলিতেছি।

সমগ্র হিন্দুস্থান মধ্যে এই বঙ্গদেশের এবং এই দেশবাসী বাঙ্গালি জাতির বৈশেষিকত্ব, অতি প্রাচীন কাল হইতে স্বীকৃত আছে।

নগর, কায়তী প্রভৃতি যে সকল অক্ষর বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে বঙ্গাক্ষর অতি প্রাচীন। তন্ত্রের ধ্যানে এই অক্ষর মালারই (ত্রিকোণ কুণ্ডলীযুক্ত 'ক' ইত্যাদি) বর্ণনা। নেপালে ১৫০০ বৎসরের পুঁথিতে বঙ্গাক্ষর ব্যবহৃত আছে।

আলঙ্কারিকেরা গৌড়ীয় বলিয়া একটী প্রাচীন রীতির উল্লেখ করেন। এই রীতি সমাস বহুলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ প্রকার প্রাকৃতির মধ্যে গৌড়ী বলিয়া একটী ভাষার উল্লেখ আছে। কাজেই বাঙ্গালার বিশেষত্ব বহুকাল হইতে স্বীকৃত।

গৌড়ীয় রীতি—সমাস বহুলা—তবে কি আমরা স্বভাবে বেশী জটীল? না আড়ম্বর প্রিয়?

বাঙ্গালার অক্ষরে কোণ বেশী। তবে কি আমরা বেশী খোঁচা ভালবাসি? না অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট করিবার জন্য আমরা অধিকতর কোণী করিয়াছি,—তবে কি আমরা সুস্পষ্টতা ভালবাসি?

বঙ্গাক্ষর সুস্পষ্ট, লিখিতে সুকর, এবং ধ্যানসঙ্গত বলিয়া বীজকবচের উপযোগী। রাজা রাধাকান্ত দেব, জগতের জন্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া, যে বুদ্ধিতে উহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করেন, এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, যদি সেই বুদ্ধি তাহার পর সময়ের সংগ্রহকার ও প্রকাশকগণের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে, ভারতের সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য অক্ষরের জন্যে আমাদিগকে কোন ভাবনাই ভাবিতে হইত না। বঙ্গাক্ষরের ন্যায়ত জয় হইত, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালির গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত হইত। আমরা হেলায় হারাইয়াছি, এখনও কত কি হারাইতেছি।

আমাদের গানের তালের, বা কবিতার ছন্দের যে বৈশেষিকত্ব তাহাও বোধ হয় আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

বাঙ্গালির গানের বৈশেষিকত্বের বিশেষ পরিচয় বাঙ্গালির কীর্ত্তনাঙ্গে। উড়িষ্যায়, বা আসামে, যে কীর্ত্তনাঙ্গ, সে সমস্তই আমাদেরই—ঐ সকল দেশও বঙ্গদেশের মধ্যেই ধরিয়াছি। বঙ্গের বহুদূরে ব্রজমণ্ডলে বা দ্বারকায়, দক্ষিণে পাণ্ডুরপুরে, যে সকল কীর্ত্তনাঙ্গ আছে, সে সমস্তই বাঙ্গালা হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের পর গিয়াছে। এই কীর্ত্তনাঙ্গ গীতি রীতি—জগতে অতুলনীয়। সুরের মোহিনী শক্তি কীর্ত্তনে যেমন আছে—এমন কোন গানে নাই। শোকের করুণ রস বিস্তারে বোধকরি, মহরমের মরসিয়া গান সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু কীর্ত্তন সর্ব্বরসে সমান। শান্তি, আদি, করুণ, মধুর, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, সকল ভাবেই কীর্ত্তনের মোহিনী শক্তি অসামান্য। বাল বৃদ্ধ—ধনী দরিদ্র—জ্ঞানী অজ্ঞানী—ইতর ভদ্র—সর্ব্বশ্রেণীর মিশ্রিত সংঘ মধ্যে যিনি কোনদিন কীর্ত্তনের লীলাখেলা দেখিয়াছেন তাঁহাকে আমরা আর অধিক কি বলিব? আর যিনি বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর এই গৌরবের বিষয় প্রত্যক্ষ করেন নাই—তাঁহাকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? তিনি নিতান্ত অভাগ্যবান্, তাঁহার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। তিনি একটু চেষ্টা করিলেই ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারেন। যে গানে,—করুণার ক্রন্দন, উল্লাসের উৎসাহ, প্রেমের পূর্ণতা, ভক্তির দ্রাবকতা—সমান ভাবে স্ফুরিত হয়, বড়ই দুঃখের

বিষয়, সেই গানের আদর শিক্ষিত মধ্যে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র, রঙ্গপুরের উকীল ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বাকৃচি প্রভৃতি জন কতক খ্যাতনামা ব্যক্তি আজও কীর্ত্তনের চর্চ্চা করেন বলিয়া, এখনও কীর্ত্তন দাঁড়াইয়া আছে, নতুবা শিক্ষিতের কাছে কীর্ত্তনের কোন পরিচয়ই থাকিত না। দেশে হরিসভা অনেক আছে বটে, ভক্তিমান লোকেরও যে একেবারে অভাব হইয়াছে, এমন নহে; নব্য সম্প্রদায়ের যুবকের মধ্যে যে কীর্ত্তন গানের একেবারে চর্চ্চা নাই, তাহাও নহে; তবু কীর্ত্তনের যে আদর আছে, এমন কথা বলিতে পারি না। কলিকাতার অনেক সভা সমিতিতে আদ্যন্তে সঙ্গীত হইয়া থাকে, কিন্তু কোথাও কীর্ত্তনাঙ্গ গান শুনিয়াছি, এমন মনে হইতেছে না। সুকণ্ঠ গায়িকা সক্ করিয়া একটু আধটু ঢপের গান শিক্ষা করেন, তাহাকেই অনেক ভদ্রলোক কীর্ত্তন বলিয়া জানেন, কিন্তু সে ত কীর্ত্তনের অপভ্রংশ মাত্র। জয়দেবের লম্বা তালের গান রীতিমত পত্তন দিয়া গাইতে পারেন, এমন গায়ক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়,—উচ্চঅঙ্গের আদর নাই বলিয়া। ঐ সকল গানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারিগরির আমি অতি অল্পই বুঝিতে পারি, কিন্তু যেটুকু বুঝি তাহাতেই মনে হয়, না জানি কতকালের সাধনার পর, গানে তাল ও রাগের ঐরূপ সম্মিলন ও স্ফূর্তি হইয়াছে। ঐরূপ অবয়ব হইয়াছে—অন্তত আটশত বৎসর পূর্ব্বে—তবে এই বাঙ্গালি জাতি কতদিনই না এইরূপ সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেছে। কে বলিল, বাঙ্গালায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকের বাস ছিল না?

কীর্ত্তনের সুরের বিশেষত্ব আর একটু বিশেষ করিয়া বলিব। পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন। বিশেষ সুরজ্ঞ পাঠকগণ। আমি তাঁদের শিক্ষার জন্য লিখিতেছি, এমন মূর্খ আমাকে মনে করিবেন না।

সুর মোটামুটি দুই প্রকার—খাড়া সুর, আর কোরাল বা ঘোরাল সুর। খাড়া বা সোজা সুর—ঐ পাপিয়া তুলিতেছে, উহু, উহু-উহু-হুউ—(সত্য সত্যই পাপিয়া ডাকিতেছে, আষাঢ়ের শেষ ভাগে এমন বাদলের দিনে, এত পাপিয়া পূর্ব্বে শুনিতাম কি?) আর ঐ ঘোরাল সুরে, গাল ভরা গলায় কৃষ্ণ গোকুলে বলিতেছে,—কু বলাম্, কো বলাম্—কু। খাড়াসুরগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি এবং উহাদেরই কোন কোনটীর কোমল বা তীয়র। আর ঘোরাল সুর গুলির নাম, মীড় বা মূর্চ্ছনা। সেতারের একটী ঘাটে তারের উপর বামহস্তের আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া সেই তারে দক্ষিণ হস্তের

একটী অঙ্গুলির মের্জাপ দিয়া টং করিয়া বাজাইলে, সেইটীকে খাড়া স্বরের আওয়াজ বলা যায় ; আর বামহস্তের আঙ্গুলটা কেবল চাপিয়া না রাখিয়া তারে চাপিয়া টানাটানি করিলে, এবং আঘাত করিলে যে ভাঁও করিয়া আওয়াজ বাহির হয়, তাহাকে মীড় বা মূর্চ্ছনা বলে।

এই মীর বা মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের জান এবং বিশেষত্ব। রাগ রাগিণীর যে সম্পুরণ, খাড়ব, ওড়ব, বলিয়া ভেদ—তাহা এই মূর্চ্ছনা লইয়া। গলায় হৌক, যন্ত্রে হৌক, এই মূর্চ্ছনা সাধিতে না পারিলে, হিন্দু সঙ্গীত শেখা যায় না। সকল দেশের সঙ্গীতেই অল্প বিস্তর মূর্চ্ছনা আছে, হিন্দু সঙ্গীতে বড় বেশী আছে, এই জন্যই বলিতেছি মূর্চ্ছনাই হিন্দু সঙ্গীতের জান ও বিশেষত্ব। হারমোনিয়ম্ পায়ানোতে বিশেষ দক্ষ লোক নাহলে মূর্চ্ছনা কোনরূপ বাহির করা যায় না। স্থতরাং হিন্দু সঙ্গীত শিখিতে হইলে, প্রথম হইতেই তানপুরার সঙ্গে গলা সাধা ভাল, তাহাতে ঘোরাল স্বরশিক্ষা হয়।

বাঙ্গালির মধ্যে প্রথম পোলিসের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কলকাতার জগদীশনাথ রায়। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসর 'সঙ্গীত' শীর্ষক তিনটী প্রবন্ধ ধারাবাহিক লেখেন। প্রথম প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"মনুষ্য কণ্ঠের সহজ সাত স্বর, তাহার কোমল ও তীব্র এবং স্বরাণী সকল গণিলে অভাবত ২৪টি স্বর হয়। এবম্প্রকার কল্পনা-প্রসৃত স্বর সমুদায় কোন বাঁধা যন্ত্রেরই আয়ও হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য হারমোনিয়াম্ প্রভৃতি বাগযন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে অভাবত (প্রত্যেক গ্রামে) ২৪টি স্বর রাখা উচিত। তাহা হইলে তদ্বারা দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা। য়ুরোপীয় যন্ত্রে (প্রত্যেক গ্রামে) কেবল ১২টি মাত্র স্বর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদের ত্রিতন্ত্রী নিঃসৃত ভনাঙ্গ রাগ রাগিণীর দশার ন্যায় হইয়া উঠে।"

এই মূর্চ্ছনাই হিন্দুসঙ্গীতের বিশেষত্ব। অন্য সঙ্গীতেও মূর্চ্ছনা আছে, তবে হিন্দু সঙ্গীতে বেশী বেশী আছে। তাহার মধ্যে আবার কীর্ত্তন সঙ্গীতে অত্যন্ত বেশী আছে।

এই গেল স্বরের কথা—এখন তালের কথা মোটামুটি কিছু বলিতে হইতেছে। গানে যেমন তাল, পদ্যে তেমনই ছন্দ। যেমন লঘু, গুরু বা মাত্রাভেদ লইয়া তাল, তেমনিই লঘু, গুরু বা মাত্রাভেদ লইয়া ছন্দ ; তালে যেমন বিরাম আছে,

ছন্দে সেইরূপ যতি বা বিরাম, তালে যেমন লয় বা কাল আছে, ছন্দেও সেইরূপ কাল বা লয় আছে।

প্রথমেই বলিয়াছি পাহাড়ীদের তাল, প্রায়ই পটতাল—'কিন্থিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা'। সেইরূপ অল্প সংখ্যক অক্ষরের ছন্দ লইয়া আদিম কালের কাব্য হইয়া থাকে। আমরা প্রাকৃত ভাষার কথা কহিতেছি; সংস্কৃতের নহে, বৈদিকী ভাষার একেবারে নহে। যাঁহারা বেদ বা বৈদিকী ভাষা, বা বৈদিক মন্ত্র—নিত্য বলিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত স্থূক্ষ্মদর্শী,—আর যাঁহারা বেদ চাসার গান বলেন, তাঁহারা নিতান্ত স্থূলদর্শী। আমরা বেদের ভাষা বা ছন্দ লইয়া কোন কথা বলিতেছি না; প্রাকৃত ভাষার কথাই বলিতেছি। প্রাকৃত ভাষায় প্রথমে ছোট ছোট ছন্দ দেখা যায়।

দীনেশবাবু বহু গবেষণা করিয়া বঙ্গের আদিযুগের অনেকগুলি ডাকের কথা এবং খনার বচন সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার প্রায় সকল গুলিই ছোট ছোট ছন্দের। এইখানে দুই চারিটী উদ্ধৃত করিব।

দুষ্টা নারী।

(১)

ঘরে আখা, বাহিরে রাঁধে।
অল্প কেশ, ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায়, উলটি ঘাড়।
ডাক বলে—এ নারী ঘর উজার॥

(২)

নিয়ড় পোখরি, দূরে যায়।
পথিক দেখিয়ে, আউড়ে চায়।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাক বলে, ঘরে না টিকে॥

শিষ্টা গৃহিণী

রাঁধে, বাড়ে, গায়ে না লাগে কাতি। (কালি)
অতিথ দেখিয়া মরে লাজে।

তবু (ব্যস্ত) তার পূজার সাজে ॥
সুশীলা, শুদ্ধ বংশে উৎপত্তি।
মিঠাবোল, স্বামীতে ভকতি ॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে।
খড় কাট বর্ষাকে বাঁধে ॥
কাঁখে কলসী পানীকে যায়,
হেট মুণ্ডে কাহকো না চায় ॥
যেন যায়, তেন আইসে।
বলে ডাক, গৃহিণী সেই সে ॥

এইরূপ নীতি কথা, গৃহস্থালির কথা, এবং চাসবাসের কথা লইয়া ডাকের কথা। তিব্বতে 'ডাকার্ণব' পুস্তকে নাকি এই সকল সংগৃহীত আছে। খনার বচনে এইরূপ কথাও আছে, উপরন্তু জ্যোতিষের আর্য্যা আছে।

বাঙ্গালার কাব্যের প্রধানতঃ দুই ভাগ। ছড়া ও গান। ডাকের কথা। খনার বচন—কেবল ছড়া মাত্র। এই প্রাচীন সময়ে গানে কিরূপ ছন্দ ব্যবহৃত হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"তিরুমালায় উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্তমান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মানিক চাঁদ। এই মানিকচাঁদের গান গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রথমে ছাপান।' তৎপূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা গান আমরা জানি না। সে গানও ছড়ার মত বটে, তবে নিশ্চয়ই সুরেতালে গীত হইত। আর "তুড়্ তুড়্ করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।"

এইরূপ পংক্তিগুলি বার বার থাকাতে মনে হয়—ওগুলি গানের ধূয়া হইবে। মানিকচাঁদের গান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

না যাইও, না যাইও রাজা! দূর দেশান্তর।
কারে লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর।
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালি।
এমন বয়েসে ছাড়ি যাও, আমার বৃথা গাবুরাণী*।

*গাবুরাণী=যৌবন।

জীয়ব জীবন ধন আমি (কন্যা) সঙ্গে গেলে।
রাধিয়া দিয় অন্ন, ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানি।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী।

* * *

গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বায়।
মাঘ মাসে শীতে ঘেষিয়া রমু গাও॥

পুত্র 'গোবিন্দচন্দ্রের গান' ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অনেক আধুনিক কথা মিশ্রিত হইয়াছে।

গোবিন্দ চন্দ্রের গানের নমুনা।

অভাগী দুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ।
দেশান্তরে যাব আমি, কর অনুগ্রহ।
তুমি যোগী হইবে, আমি হইব যোগিনী।
রান্ধিয়া বিদেশে যোগাব অন্ন পানি।
বসিয়া থাকিও তুমি বনের ভিতরে।
আনিব মাগিয়া ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে॥

* * * *

নারী পুরুষ দুই হয় এক অঙ্গ।
শিব বটে যোগীয়া, ভবানী তার সঙ্গ॥

* * *

খসাইয়া পেলে হার কেয়ুর কঙ্কণ।
অভিমানে দূর করে যত আভরণ॥
পুঁছিয়া ফেলিল সব সিঁতার সিন্দুর।
নাকের বেসর পেলে, পায়ের নূপুর॥
রাজার চরণে পড়ে জড়ায়ে কুন্তল।
মোরা সবে যাব রাজা দেশান্তরে চল॥

বাঙ্গলায় উজ্জ্বল রসের করুণ গীতি, দেখা যাইতেছে,—সেই কালেও সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল গীতিকাব্য পয়ারে রচিত, বাঙ্গালায় পয়ার কতকাল ধরিয়া

আছে তাহা ঠিক বলা যায় না, খনার বচন বা ডাকপুরুষের কথা যেমন ছিল, সেই সময়ে সর্ব্বরূপ পয়ারও ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে ওইগুলি ছোট ছন্দে রচিত বলিয়া, অগ্রবর্ত্তী—একথা বলিতেও আমরা নারাজ নহি।

যে সময়ে মাণিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গালার একদেশের রাজা—সেই সময়ে বঙ্গে সেন রাজাদিগের রাজত্ব চলিতেছে। এই সেন রাজাদিগের শেষ রাজার সময়ে শ্রী জয়দেব ঠাকুর। জয়দেবের গীত-গোবিন্দে রাগ অঙ্গের ভজনের, এবং স্বরের ও তালের কায়দায়—একরূপ চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল বলিলেই হয়; অল্প সময় মধ্যে এইরূপ পরিণতি হয় নাই। বহুকালব্যাপী অনুশীলনে হইয়াছিল। সুতরাং মাণিকচাঁদ প্রভৃতির সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অল্প পরিমাণ ছিল, বা ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, এমন কথা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার বিপরীতই বুঝি।

সকল পণ্ডিতেই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষা ভারতের অন্য সকল প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের বড় কাছাকাছি। সুতরাং বাঙ্গালা প্রধানত অনার্য নিবাস ছিল, একথার কোন মূল্য নাই। আবার জয়দেবের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার এত কাছাকাছি, যে জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা সাঁওতালির মত একটা বুলি ছিল, তাহাও মনে করিতে পারা যায় না; বাঙ্গালায় সেরূপ বুলি থাকিলে, সংস্কৃত তাহার কাছাকাছি হইতে যাইবে কেন? বাঙ্গালায় মুসলমান আসিবার বহু পূর্ব্বে এই দেশ সুসভ্য অধিবাসীর সুশৃঙ্খল জনপদ ছিল; তাহারা স্বর-তাল-লয়ে গানের বিশেষ অনুশীলন করিত।

কান্যকুব্জ হইতে যদি কিছু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কতক কতক আসিয়া থাকেন, তাঁহারা কতক কতক মাত্র—কেননা বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ গান ত কনোজিয়ার নহে। এ যে বাঙ্গালীর জিনিস বাঙ্গালায় উঠিয়াছিল, বাড়িয়াছিল, এবং জয়দেবের সময় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল,—এইরূপ উৎকর্ষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুচরবর্গের ক্রমাগত সোৎসাহ অনুশীলনেও, সে উৎকর্ষ ছাড়াইয়া অদ্যাপি বাঙ্গালার কীর্ত্তন হইয়া উঠিতে পারে নাই।

শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর খেতুরের মহামহোৎসবে যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তনাঙ্গের সৃষ্টি হয়, এবং রেণেটী বা রাণীহাটি বলিয়া যা প্রসিদ্ধ, সেই অদ্ভুত স্বর লহরীর আমরা অবমাননা করিতেছি না, আমরা কেবলমাত্র বলিতেছি গীতগোবিন্দের রস রাগ তাল মান কীর্ত্তনাঙ্গের এক দিকের চরমোৎকর্ষ।

আমরা বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালিকে এবং বাঙ্গালা দেশটাকে বুঝিবার চেষ্টা

করিতেছি মাত্র। আমরা বলি, যাঁহারা মনে করেন, হাজার বার'শ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছোট নাগপুরের মত অসভ্য অধিবাসী পূর্ণ ছিল, তাঁহারা ভ্রান্ত ; তাহা হইলে ৮০০ বৎসর পূর্বে গীতগোবিন্দ হইত না, আর কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ আসিয়া ওরূপ তাল—লয় পূর্ণ গীতি কাব্যের সূচনাও করিতে পারিত না।

যেমন হিন্দু সঙ্গীত পৃথিবীর অন্য সঙ্গীত অপেক্ষা বিশেষরূপে অধিকতর মূর্চ্ছনা পূর্ণ, বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গ সেইরূপ ভারতের অন্যরূপ সঙ্গীত অপেক্ষা বিশেষরূপে অধিকতর মূর্চ্ছনা পূর্ণ। কীর্ত্তনে গড়ানে সুর এত বেশী যে ভাল খেয়ালী বা ধ্রুপদীকেও কীর্ত্তন শিখিতে গেলে কষ্ট পাইতে হয়, সময় লাগে।

সুরে যেমন গীতগোবিন্দের চরমোৎকর্ষ, তাল ছন্দেও সেইরূপ।

পদ্যমাত্রকেই পয়ার বলা হইত। তবে গানের বেলা পয়ার কথাটা লিখিত হইত না ; তাল এবং সুর লেখা থাকিত। ছড়াতে পয়ার বলিয়া চিহ্ন থাকিত ; ডাকের কথার বা খনার বচনের ছড়াগুলি ছোট ছন্দের পয়ার বটে। প্রকৃত পয়ার মাণিকচাঁদের গানের ছড়ায় আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই। জয়দেবে এই পয়ার পাওয়া যায়। বাঙ্গালা পয়ারের জোর ছিল বলিয়াই পয়ার জয়দেবের সংস্কৃতে স্থান পাইয়াছে। জয়দেবের ভাষা প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মধ্যবর্ত্তিনী।

জয়দেবের পয়ার—

সরসমসৃণমপি মলয়জ পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং ॥
দিশি দিশি কিরতি সজল কণজালং।
নয়ন নলিনমিব বিদলিত নালং ॥
নয়ন বিষয় মপি কিশলয় তল্পং।
গণয়তি বিহিত হুতাশ বিকল্পং ॥
ত্যজতি ন পানি— তলেন কপোলং।
বালশশিনমিব সায়মলোলং ॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহ বিহিত মরণেব নিকামং ॥

এইটী চতুর্থ সর্গের গীতাংশ। এইরূপ ষষ্টের, সপ্তমের, নবমের এবং একাদশের অনেকগুলি গীতে দৃষ্ট হইবে। সকল স্থলেই দুই চরণ, শেষে মিল, চরণের মধ্যে

যতি, এবং তের চৌদ্দ বা পনর অক্ষরে এক এক চরণ। দুই চরণে ২৬ হইতে ৩০ অক্ষর। জয়দেবে তিন চারিটি ত্রিপদীর গান আছে। একটী ভঙ্গ বলিতে হয় :—

দিনমণি মণ্ডল খণ্ডন ভব মণ্ডন মুনিজন মানস হংস ইত্যাদি—ধীর সমীরে, যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী।—আর একটী—তৃতীয়টী—

ইহ রস ভণনে কৃত হরিগুণনে মধুরিপু পদসেবকে
কলিযুগ চরিতং ন বসতু দুরিতং কবি-নৃপ জয়দেবকে।

আর একটী সেই প্রসিদ্ধ—

স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লবমুদারং

একথা যদি ঠিক হয়, যে রসের পরিপোষণের জন্য ছন্দের বিস্তৃতির প্রয়োজন তাহা হইলে, সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে রসগ্রাহিতা বৃদ্ধি পায়, রসের পরিপোষণার্থ ছন্দেরও অবয়ব বৃদ্ধি পায়। শেষের উদ্ধৃত চরণে ২৬টি অক্ষর আছে, শ্লোকটিতে সুতরাং ৫২ অক্ষর। কিন্তু কেবল অক্ষর দেখিলে হয় না, ছন্দও বড় হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাত্রা বড় হওয়া আবশ্যক এবং লয় বিলম্বিত হওয়া চাই। নিম্নে ভারতচন্দ্রের ছন্দ, মাত্রা এবং লয় লক্ষ্য করিবেন :—

'প্রভাত হইল বিভাবরী,—
বিদ্যারে কহিল সহচরী ;—
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা ;
সখী তুলে ধরাধরি করি।'

৪৬ অক্ষরে ছন্দ, দীর্ঘস্বর অনেকগুলি আছে ; বিলম্বিত লয়ে পাঠ করিলে, করুণ রসে ভরপুর হয়।

মধুসূদনের মেঘনাদবধে, মেঘনাদের মৃতদেহ সমক্ষে শ্মশানে রাবণের শোকোচ্ছ্বাস পাঠ করিবেন। ছন্দ সাধারণ পয়ার হইলেও, বিলম্বিত লয়ে পাঠ করিলে, সেইটী কিরূপ চিত্তদ্রাবক শোক গাথা! অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুণ এই যে, সাধারণ ছন্দে কবিতা আবদ্ধ থাকিলেও সে আপনার ইচ্ছামত চলিতে, উঠিতে নামিতে পারে,—ছন্দ ২৮ অক্ষরের, কিন্তু শত অক্ষরের পর পূর্ণচ্ছেদ বা আকাঙ্ক্ষা শেষ হইলেও ক্ষতি হয় না। শোক গীতিতে এইরূপ প্রলম্বিত সংসর্পণ অতি প্রয়োজনীয়।

গীতগোবিন্দে তালের বিস্তৃতি অতি অদ্ভুত। দশকোশী ধরা গান বিলম্বিত লয়ে মহা ভাবুকের সমস্ত আকাঙ্খা সম্পূর্ণ শেষ করে ; তালের গতিতে ভাবকে কুঞ্চিত বা সংযত হইতে হয় না।

জয়দেবের প্রসিদ্ধ "বদসি" গীতি এই কথার জাজ্বল্য উদাহরণ।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী হরতি দরতি মিরমতি ঘোরং।
প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়ি মানমনিদানং॥

যাঁহারা জয়দেবের "বদসি" বড় তালে গীত হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন,—সাঁওতালের বা ভুটিয়ার "কিম্বিয়া ঘেনা ঘেনা ঘা" হইতে ঐ তালের কায়দা—কত কালের সাধনায় লব্ধ হইয়াছে। সেই সাধনার অসাধারণ ফল এখন কি ঔদাসীন্যে, অবহেলায় নষ্ট করিতে হইবে? তোমরা স্বদেশী হইয়াছ, এই কি দেশের প্রতি মমতা? জগতের অতুল্য স্বদেশী নিধি হেলায় হারাইবে?

৩. প্রায়শ্চিত্ত

এই যে কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে চলিয়া গিয়াছে, এটা তোমাদের সেই কিম্ভুতকিমাকার স্বদেশীর অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বদেশী করিতে গিয়া, বা হইতে গিয়া, তোমরা যে দেশকে ছোট করিয়া তুলিতেছিলে, তারই ফলে, তোমরা সাম্রাজ্যের রাজধানীর মর্য্যাদা হারাইলে।

বাজারের স্বদেশীর মত বোকামির ব্যাপার বোধ করি জগতে আর কখনও হয় নাই। আমি আমার ছেলেটিকে প্রতিবেশী ছেলেদের অপেক্ষা বেশি ভালবাসি, একথা নাকি কেহ আবার ঢাক ঘাড়ে করিরা, সেই ঢাক পিটাইয়া অলিগলি বলিয়া বেড়ায়। আরে পাগল! পাগল ভিন্ন সকলেই ত তাই করে। তুমি বলিতে পার, সেকথা ঠিক, কিন্তু আমরা বিদেশী দ্রব্যের মোহে পাগলই হইয়াছিলাম; সেই পাগলামি যাই ছুটিল, তাই আহ্লাদে ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করিতেছিলাম। বেশ কথা। যদি পাগলামিই ছুটিল, তবে আবার আপনার দেশকে ছোট-করা রূপ পাগলামি আসিল কেন? সত্য বটে, আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ বাঙ্গালী, বিশ্বপ্রেমের ধারণাই আমাদের হয় না—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' আমাদের মুখস্থ করা কথা, প্রাণের কথা নহে। তা বলিয়া আমরা কি ভারতমাতা ভুলিয়া বঙ্গমাতাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি?

আমাদের বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তীর্থক্ষেত্র—সকলই ভারত লইয়া। আমাদের ইতিহাসের নাম মহাভারত,

বাণীবিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ভারতী। আমরা ভারতকে মনে করিলেই কি ভুলিতে পারি ?

এই যে ইংরাজি শিক্ষার ফলে, একটু একটু করিয়া দেশভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল সেও ত ভারতভক্তি।

অতি বালককাল হইতে সুর আমাদের কানে লাগিয়া রহিয়াছে—"রুইন রুইন হলো তোমার সোনার ইণ্ডিয়া।" সেও ত ভারতেরই কথা। তাহার পর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে কাঁদিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম :

'মলিন মুখ-চন্দ্রমা, ভারত তোমারি।
রাত্রিদিবা ঝরিতেছে লোচন-বারি ॥
চন্দ্র জিনি কান্তি—চন্দ্র জিনি কান্তি—
হেরিয়ে ভাসিতাম আনন্দে—
আজ এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি ॥

তাহার পর রঙ্গমঞ্চ হইতে ধ্বনিত হইল,—

দেখ গো ভারতমাতা তোমার সন্তান ;
সবে অতি দীন হীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিলে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ।

তাহার পর ভারতমাতার জন্য সন্তানগণের মনোবেদনা সর্বত্র গীত হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীতে, ভারত-বিলাপে দেশ ভরিয়া গেল।

মনোমোহন গায়িলেন,—

"দিনের দিন সবে দীন,
ভারত হয়ে পরাধীন।'

আগ্রা হইতে গোবিন্দ রায় গায়িলেন,—

"কতকাল পরে বল ভারত রে,
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে।"

বাঙ্গালীর বাঙ্গালা গানের সংগ্রহ হইল—নাম হইল"ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী।" তাহাতে উদ্দীপনা, শোচনা, আকাঙ্খা ও প্রার্থনা নামে প্রায় শত সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইল,—সে আজি প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তাহার পর প্রায়

বিংশতি বৎসরকাল ঐ ভাবেই চলিতেছিল। বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত ওরই মধ্যে একবার বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালীর জন্য শোক করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু বঙ্গদর্শন যখন প্রথম হইতে 'ভারত-কলঙ্ক' ক্ষালনের জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন ও-কথা অনেকেরই প্রাণে লাগে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুরবাড়ী হইতেই ভারতমাতার করুণ গীতি জাঁকাইয়া আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঃ

"মিলে সবে ভারত সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"

উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু অজস্র পুষ্পচন্দন বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীরই প্রসাদ, আবার ঠাকুরবাড়ী হইতেই বিষাদ। কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশের পরিধি কমাইয়া ভারতপ্রীতিকে বঙ্গপ্রীতিতে পর্যবসিত করিতে ইদানীং বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জননীর শ্রীমুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন ঃ

"আমি অর্জ্জুনেরে
আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন্যদান,
এই কোলে বসি বাল্মীকি কোরেছে,
পুণ্য রামায়ণ গান।"

আবার "শোচনায়" বলিয়াছিলেন,—

"ভারতের বনে পাখী গায় গান,
স্বর্ণমেঘমাখা ভারত বিমান,
হেথাকার লতা ফুলে ফলে ভরা,
স্বর্ণশস্যময়ী হেথাকার ধরা,
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়া যায়।"

আর রবিবাবুর "ভুবনমনোমোহিনী" গান সেও ভারতমাতাকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।

ইহার পর ১৯০৫ সালে নিতান্ত কুক্ষণে লর্ড কার্জন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বঙ্গকে দ্বিখণ্ডীকৃত করিলেন, আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ শোকে মুহ্যমান হইয়া সোনার

বাংলা ধুয়া ধরিলেন। অতি পবিত্র অথচ ক্ষীণ স্বরে বলিলেন :—

বাংলার মাটি
বাংলার জল
বাংলার বায়ু
বাংলার ফল
পুণ্য হোক পুণ্য হোক।

আমরা পুরাণ' পাপী, ভারতমাতার ভিখারী সন্তান। আমরা কিন্তু সেই গরীয়সী জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিয়া নবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ ডাকযোগে আমাকে রাখীসূত্র এবং মন্ত্রসূত্র পাঠাইয়াছিলেন। রাখী বাঁধিলাম, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সপ্তসিন্ধু, ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত এসকলই ভারতমাতার স্নেহের ও আদরের সন্তান, এখন বঙ্গদেবী ভারতমাতার প্রাণের পুত্তলি বলিলেও চলে, তা বলিয়া কি জগজ্জননীর মহীয়সী মূর্ত্তি প্রাণ হইতে ঠেলিয়া রাখিতে পারা যায়? তা কখনও যায় না।

আজি কয়েক বৎসর হইল স্বদেশীর খুব ধুমধামের দিন। কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তভবনে বঙ্কিমোৎসবে সুরেন্দ্রবাবু আর একটি মহাত্মা (নাম ভুলিয়া গেলাম) আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আহ্বানকারীরা কিন্তু কেহই উপস্থিত ছিলেন না। বোধ হয় তখন হইতেই মধ্যব্রতীগণ দেশব্রতীদের হইতে একটু পৃথক্ হইতেছিলেন। আমরা সমস্ত দিন-রাত্রি উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের দর্শন পাই নাই।

তাঁহারা না থাকুন, কিন্তু কলকাতার ও নিকটের বহুতর ভদ্রসন্তান এবং ভট্টপল্লীর ঠাকুরমহাশয়গণ প্রভৃতি অনেক লোক একত্র হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে একজন চাই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—তিনি এই বঙ্গমাতার নাম লইয়া বাহ্বাস্ফোটের একজন সর্দ্দার। আমার পান্‌সী কাঁটালপাড়ার ঘাটে লাগিল, আমার পাশে একগলা গঙ্গাজলে উপাধ্যায় স্নান করিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম—"আপনারা বঙ্গমাতা বঙ্গমাতা করিয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জগজ্জননী ভারত-মাতাকে ভুলিতে বসিয়াছেন কেন? আমরা কি কাশী, মথুরার মায়া ভুলিয়া যাইব? বেদ-স্মৃতি-পুরাণ ইত্যাদি সমস্তই ভুলিব? রাম-লক্ষ্মণ-ভীষ্ম-দ্রোণের কথা মনেই আনিব না? সে কিরূপ Patriotism (দেশভক্তি) হইবে?" ব্রহ্মবান্ধব আমার প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, ধীরে ধীরে ঘাটে উঠিলেন, আমিও উঠিতে লাগিলাম। উপাধ্যায় মাথা

পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, 'আপনি বঙ্কিমোৎসবে আসিতেছেন, তিনি যে "সপ্তকোটী-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে" বলিয়া গিয়াছেন, তবেই ত বাঙ্গালি হইল। আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসীরা বুঝিয়াছিল, ভারত-মাতার (Fighting force) তরবারি ধরিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সপ্তকোটি। ব্রহ্মবান্ধব আবার বলিলেন, "আনন্দমঠ জিনিসটা বাঙ্গালী লইয়া।" আমি বলিলাম "কে বলিল! একজন হিমালয় দেশবাসী মহাপুরুষ পরিচালক, আর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সমগ্র ভারতের সুবোধ্য সহজ সংস্কৃতে রচিত। ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, সেই সঙ্গীত ভারতমাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত?" ব্রহ্মবান্ধব নিরুত্তর হইলেন, আমিও স্বস্তি লাভ করিলাম। বাস্তবিক ভারতমাতার স্থলে বঙ্গমাতার স্থাপন চেষ্টা দেখিয়া আমার বড়ই অশান্তি হইয়াছিল।

আমি যে কাহারও অপেক্ষা বঙ্গদেবীকে কম ভালবাসি, একথা আমি মুখেও বলিতে পারিব না, তবে ভারতমাতাকে আমি যে শুধু ভালবাসি এমন নহে, আমি ভক্তি করি, পূজা করি। কত জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে যে আমরা পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মলাভ করিয়াছি, তাহা মনেও গণনা করিতে পারি না। এই যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী,—সপ্তসরিৎ প্লাবিতা পুণ্যভূমি, এই কাশী কাঞ্চী মায়া মথুরা প্রভৃতি সহস্র ধাম শোভিত বিস্তীর্ণ ধর্ম্মক্ষেত্র, লক্ষাধিক অভ্রভেদী মঠ-মন্দির পরিব্যাপ্ত প্রসর-ভূভাগ—অনন্তকাল ধরিয়া যদি জননী জঠরে জন্মিতে ও মরিতে হয় তবে তাহা অপেক্ষা মানবের সদগতি আর কি আছে?

তোমরা মুখে যাহাই বল, আর গান যাহাই গাও, তোমরা তোমাদের কার্য্যে ভারতমাতাকেই দেশমাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। মাদ্রাজের তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় পরিয়া বোম্বায়ের কলের চাদর মাথায় দিয়া আমরা রজনীকান্তের সঙ্গে বলিয়াছিলাম,—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।"

সে কোন্ মায়ের দেওয়া। ভারতমাতার তো? তখন যদি ভারতমাতা জাগ্রৎ হইয়া শতসহস্র হস্তে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া না দিতেন, তবে আমাদের কি দশা হইত মনে কর দেখি! তবেই বুঝ ভারতমাতাকে তোমরা ভুলিতে বসিয়াছিলে, তিনি তোমাদিগকে ভোলা দূরে থাক্, তোমাদের লজ্জা

নিবারণের জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। একেই বলে—কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়।

মা কখনও ছেলেকে ভুলিতে পারেন কি? তিনি যুগ যুগ ধরিয়া আমাদিগকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছেন। কত দৈত্য দানব অসুর 'কালদ', কত যবন ম্লেচ্ছ মায়ের শ্রীঅঙ্গের উপর কত অত্যাচার করিয়াছে, রক্তপাত করিয়াছে, কৈ তিনি কখনও তাঁহার সোনার কোল হইতে কি আমাদিকে বিতাড়িত করিয়াছেন? না, তা কখন করেন নাই। আমরাই মাকে ছোট করিয়া পলিটিক্সে জোর দিতে যাই, কখনও মাকে বড় করিয়া cosmopolitan (বিশ্বমাতার পুত্র) হইতে চাই। আমরাই মোহবশে বিড়ম্বনা করিয়া ফেলি।

তোমরাই ক্ষুদ্র পলিটিক্সকে বলবান করিবার জন্য এই অনন্ত-প্রসারিণী, অনন্ত-স্থায়িনী অনন্ত-নন্দিনী জগন্মাতাকে ভুলিতে বসিয়াছিলে, সেই পাপের প্রতিফলে, তোমরা রাজধানীর ঐহিক মর্য্যাদা হারাইয়াছ। তুমি সমগ্র ভারতকে ভুলিতে বসিয়াছিলে, ভারতের রাজশক্তির কেন্দ্রও সেইজন্য তোমার ত্রি-সীমার বহির্ভাগে গিয়াছে। কথায় কথায় ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কলিকাতায় মহতী সভা করিতে, এখন চাল চিড়া বাঁধিয়া ইল্লি দিল্লী গিয়া, এখান হইতেও অধিকতর অস্বাস্থ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তোমাকে রাজপ্রতিনিধির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় ত কি বলিব?

যদি এই প্রায়শ্চিত্তের ক্রিয়া সম্পাদন করণার্থ পুনঃ পুনঃ গয়া কাশী প্রয়াগ গমনাগমন করিয়া সমগ্র ভারতের মহাভাব তোমার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়, যদি মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভাস হরিদ্বারের নিয়ত সামীপ্য লাভ করিয়া পবিত্র ভূমির পুণ্য প্রভাব বুঝিতে পার, যদি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণার্জ্জুনের বিচরণক্ষেত্রের ধুলিতে ধূসরিত হইয়া মনঃপ্রাণ পবিত্র করিতে পার, তবেই জানিব প্রায়শ্চিত্ত সফল; রাজাজ্ঞা ফলবতী হইয়া বঙ্গবাসীকে আবার ভারতবাসী হইবার যোগ্য করিল। কেবল রাজনীতি রাজনীতি করিয়া উন্মত্ত হইও না। একবার ধর্মের চক্ষে এই রাজধানী-পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা দৃষ্টি কর, করিয়া ইহা ধর্মসঞ্চয়ের সোপান বলিয়া মনে করিয়া ধন্য হও।

৪. পল্লীকথা (ভদ্র ও ছোটলোক)

আমাদের পল্লীগ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে বস্তুতই নিরাশ হইতে হয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া সরল পল্লীবাসিগণ

পর্য্যন্ত দারুণ মোহগ্রস্ত হইতেছেন। পূর্ব্বকালের সরল ভাব ও আন্তরিকতা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামশুদ্ধ লোক পরস্পরে একটা না একটা সম্পর্ক পাতাইয়া আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ থাকিত, সে আত্মীয়তায় ইতর ভদ্র প্রভেদ ছিল না। সেই "পাতান" সম্পর্কের মধ্যে কেমন একটা সুমধুর ভাব নিহিত থাকিত—আজকাল কার আসল সম্পর্কেও ঠিক সেরূপ ভাব অতীব বিরল। সম্পদে বিপদে সকলে যেন এক তন্ত্রীতে গ্রথিত থাকিত। একজনের সম্পদে অপরের হৃদয়তন্ত্রী উল্লসিত হইয়া উঠিত, আবার একজনের বিপদে অপর জনে স্বীয় বিপদ জ্ঞান করিত। এইরূপে সুখে দুঃখে সরল পল্লীজীবন কাটিয়া যাইত। তখন আধুনিক আদর্শে সভাসমিতি বা ক্লাব ছিল না বটে—কিন্তু যাহা ছিল তাহা আমাদের দেশের উপযোগী। সাধারণত পল্লীস্থ কোনও "চণ্ডীমণ্ডপ" ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ইতর ভদ্র, সকলেরই মিলন ক্ষেত্র ছিল। সায়ংকালে যেখানে সকল রকমেরই লোক সমবেত হইত। তথায় শাস্ত্রালাপ ত হইতই, অধিকন্তু পরস্পর সুখ দুঃখের কথা, বিচার আচারের কথা, নিজ গ্রামের কথা, ভিন্ন গ্রামের কথা, সামাজিক কথা, ভালমন্দ নানা কথারই আলোচনা হইত। ইতর ভদ্রের কেমন অপূর্ব্ব সংযোগ! আর আজকাল পাশ্চাত্ত্য জাতির আদর্শে পুণ্যভূমি ভারত ভূমিকে আমরা ভোগ ভূমিতে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া অর্থ ও স্বার্থের পূজাই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য করিতে চাহিতেছি! আমরা বিস্মৃত হইতেছি ভারতবর্ষ ভোগভূমি নহে—কর্ম্মভূমি।

দরিদ্রের সংস্পর্শে পাশ্চাত্ত্যদেশে ভোগের ব্যাঘাত হইতে পারে, আমাদের এই পুণ্যভূমিতে তাহা খাটিবে কেন? আমরা সাধারণ লোকের সহিত মেলা-মেশা করিতে সমুৎসুক নহি—বরং তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিতেছি, তাহাদের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইতে লজ্জা বোধ হইতেছে। কাজেই পূর্ব্বের সে সহানুভূতি, সে আন্তরিকতা, সেই মধুরভাব আর নাই। অশিক্ষিত হইলেও তাহাদেরও একটা আত্মভিমান আছে—সভ্যতাভিমানীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যে সেই অভিমানে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাত উভয় পক্ষেরই অশুভ জনক।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ধনী নির্ধনের যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পরিণাম ভাবিতে গেলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সোসালিজম্, এনার্কিজম্ প্রভৃতি সমাজ বিধ্বংসী সম্প্রদায় সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুলনীয় আমাদের দেশের ধনীর সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর বটে। নির্ধনের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাও সত্য। তথাপি পরস্পর সহানুভূতির অভাব ঘটিলে ধনী ও নির্ধনের, ইতর ও ভদ্রের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সেই শান্তিময়, সুখময়, সেই ধনধান্য পূর্ণ পল্লী অশান্তির আকর, রোগশোক এবং দারিদ্র্যের কেন্দ্রস্থল হইতে চলিয়াছে।

আসুন, আমরা জাত্যাভিমান, শিক্ষাভিমান, জ্ঞানাভিমান, ধনাভিমান এবং সভ্যতাভিমান পরিহার করিয়া, ইতর অভদ্র আশিক্ষিত ও নির্ধনকে "ছোটলোক" বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করি। পরস্পরের ভাব-বিনিময় ও সহানুভূতির আদান প্রদানে যদি আন্তরিকতা থাকে, তাহার শুভফল অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে এই ভীষণ জীবন সংগ্রামের দিনেও পল্লীজীবনে আবার —পূর্ব্বের মত না হউক—কিয়ৎপরিমাণে সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে।

ম্যালেরিয়া

পল্লীজীবনের আর এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। ধনবান এবং শিক্ষিতগণ অনেকেই পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। পল্লীর প্রতি তাঁহাদের আর সে আন্তরিক টান নাই। তাঁহাদের পৈতৃক "ভিটা" ত্যাগের প্রধান কারণ—ম্যালেরিয়া—অনেকে এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। প্লেগ লইয়া কত হৈ-চৈ হইল, কত অর্থের শ্রাদ্ধ হইল, কিন্তু ম্যালেরিয়া যে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী জাতিটাকে একেবারে অন্তঃসার শূণ্য করিয়া তুলিতেছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। কত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দেখিতে দেখিতে নগণ্য হইয়া পড়িতেছে, কত পল্লী বর্ষে বর্ষে জনশূণ্য হইতেছে—ঘরে ঘরে হাহাকার ; রোগির আর্ত্তনাদ, শোক সন্তপ্তের সকরুণ বিলাপধ্বনি পল্লীবাস ক্রমেই অধিকতর ক্লেশকর করিয়া তুলিতেছে। যাঁহাদের অর্থ সামর্থ্য আছে, তাঁহারা ক্রমশঃ পল্লীর প্রতি মায়া মমতা বিচ্ছিন্ন করিয়া ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সহরের প্লেগ বেরি বেরি প্রভৃতি উৎকট ব্যাধিকে উপেক্ষা করিয়া সহরবাসী হইতেছেন। পল্লীগ্রামের পক্ষে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আবার যাহারা কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে পুত্র কলত্র লইয়া বাস করেন, তাহারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিতে নারাজ। ধনী এবং শিক্ষিতগণ যদি পল্লীবাস ত্যাগ করেন, তবে কাহাদিগকে লইয়া পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হইবে? আজিও অনেক সুবিখ্যাত পল্লীগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে বস্তুতই

হতাশ হইতে হয়। পল্লীতে পল্লীতে সুবৃহৎ অট্টালিকায় ভগ্নস্তূপ গ্রামের সর্ব্বত্রই কণ্টকাকীর্ণ ও জঙ্গলাবৃত। বৃহৎ সরোবরগুলি অধিকাংশই বিশুদ্ধ অথবা শৈবালাকৃত পঙ্কিলময় বিবর্ণ জলে পূর্ণ। গ্রামবাসীগণেরও কথাই নাই—প্লীহা ও যকৃতে স্ফীতোদর পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরগত, মাংস পেশী শিথিল, কঙ্কালসার মনুষ্য নামধারী জীবগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কাহারও মনে সুখ শান্তি বা স্ফূর্তি নাই। কাল ম্যালেরিয়া আমাদের দেশের কি সর্ব্বনাশই না করিল। ম্যালেরিয়া কি করিয়া আমাদের দেশে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তাহার আলোচনা প্রবন্ধান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম। এক্ষণে কি উপায়ে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারা যায় এবং পল্লীগুলি বাসোপযোগী হয়, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিশুদ্ধ বায়ু ও পানীয়ের অভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তাঁহারা বলেন, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ময়দান প্রস্তুত কর, বৃহৎ সরোবরগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া ডোবাগুলি বুঝাইয়া দাও, জল নিকাশের প্রণালীগুলি কাটিয়া দাও, ম্যালেরিয়া আর তথায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। উপরোক্ত কার্য্যগুলি বহু ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নাই। যদি প্রত্যেক পল্লীর ধনী ও শিক্ষিতগণ সাধারণের সহিত একযোগে এই সকল কার্য্যে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অচিরে পল্লীগ্রামগুলি অন্যরূপ ধারণ করিবে, স্বাস্থ্যকর হইলে যাঁহারা পল্লীত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আবার স্বীয় পল্লীর প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে।

জলকষ্ট

পূর্ব্বে লোকে জলাশয় প্রতিষ্ঠা পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিত। ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনেকেই পল্লীতে পল্লীতে সুবৃহৎ জলাশয় খনন করাইতেন। আপামর সাধারণ তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইত। আর আজকাল লোকের প্রবৃত্তি ভিন্নরূপ হইয়াছে। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা—পঙ্কোদ্ধারেরও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইলেও প্রত্যেক পল্লীস্থ অধিবাসীগণের সমবেত চেষ্টায় পুষ্করিণী গুলির পঙ্কোদ্ধার একেবারে অসাধ্য ব্যাপার নহে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ম্যালেরিয়া বিসূচিকা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রতি বৎসর কত শত নর নারীকে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার প্রতিকার কল্পে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া না

থাকিয়া আত্মনির্ভরশীল হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতরণ করা কি সমীচীন নহে? অধিকাংশ পল্লীগ্রামের অধিবাসীগণ অসাড় নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। ধর্ম্মসেবকগণ পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া পল্লীবাসীগণকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করুন। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একই সূত্রে গ্রথিত। ধর্ম্মশূন্য কর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে না। তাই আমাদের দেশে সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত থাকিত। অধুনা ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়াছে—ধর্ম্মানুমোদিত সৎকর্ম্মে লোকে আস্থাশূণ্য হইতেছে—তাই দেশের এই ঘোর দুর্দশা।*

৫. বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা

পৌরাণিক ব্রত ছাড়া, বাঙ্গালীর মেয়ের আরও কতকগুলি ব্রত আছে বা ছিল। সেগুলিকে 'গৃহস্থালি ব্রত' বলিলেও চলে। ধর্ম্মের ভাব, কোনরূপ পূজার পদ্ধতি, আমাদের প্রায় সকল কর্ম্মেই থাকে, মেয়েদের ব্রতে ত থাকিবেই, তাছাড়া এই সকল ব্রতে বাঙ্গালীর গৃহস্থালির কথা অনেক থাকে। গৃহস্থালি ব্যাপারে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আব্‌দারের কথা অনেক এই সকল ব্রত হইতে জানা যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভাবি সতীনের উপর আক্রোশের কথাও বিস্তর থাকিত। "হাতা হাতা হাতা। খাও সতীনের মাথা।" "বেড়ী বেড়ী বেড়ী সতীন আমার চেড়ী।" এই সকল আক্রোশের কথা এখন আর শুনা যায় না। ব্রত ব্যাপারে কোন কোন স্থলে যৎকিঞ্চিৎ রিফর্মেশন হইয়াছে।

খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না, যে, তাঁহাদের বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীর মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে, হয়ত বুঝিতে পারিব যে বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আব্‌দার কিরূপ ছিল।

সেঁজুতীব্রতের চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করা হইল, বাঙ্গালার সর্বত্র যে একই পদ্ধতি তাহা নহে ; আমাদের অঞ্চলের (রিফর্মড্) পদ্ধতি আমি দিলাম ;

---

* শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের এই উপদেশ গুলি আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। নহিলে আমাদের দেশ দিন দিন যেরূপ শ্রীহীন হইতেছে,—ম্যালেরিয়ায় দেশের তিন ভাগ লোক উজাড় হইয়া যাইতেছে—মনে হয়, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে বাঙ্গালী জাতিটাই বুঝি লোপ হইতে বসিয়াছে। আশা করি আমাদের দেশের শিক্ষিতগণ, ধনীগণ, ধর্ম্ম প্রচারকগণ—পল্লীর কথাটা একবার অবসর মত ভাবিয়া দেখিবেন। —সম্পাদক

অন্যান্য স্থলের পাইলে পরিষৎ হয় ত প্রকাশ করিতে পারিবেন।

'নমঃ শিবায়' বলিয়া সেঁজুতির মঙ্গলাচরণ। "সাঁঝ ভোজন সেঁজুতি"—ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া আরম্ভ। নক্ষত্র পূজায় শেষ। মধ্যে কোনটির পর কোনটি বলিতে হইবে তাহার কোন ক্রম নাই। সমস্ত অগ্রহায়ণ ভোর, প্রতিদিন দূর্ব্বা দিয়া, সন্ধ্যার সময় দীপ জ্বালিয়া এই ব্রত করিতে হয়। প্রতি ঘরে ৩ গাছি করিয়া দূর্ব্বা দিতে হয়। সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসের দূর্ব্বাগুলি ভূষগোবরের সহিত গুলি পাকাইয়া শুকাইয়া রাখিবে। পৌষ মাসে তাহার ডবল নম্বর গুলি পৌষমাসের প্রত্যহ প্রাতে মুলাফুল, সরিষাফুল ও ৬ গাছি করিয়া দুর্ব্বা দিয়া, দুটি করিয়া ঐগুলি পূজা করিবে। ঐ পূজার মন্ত্র ঃ—

তুষতুষলি জাঁতাজাতি।
বাপমার ধন, স্বামীর ধন, নিজের খ্যাতি॥
ঘর করবো নগরে, মরবো ত সাগরে।
জম্মাবত উত্তম্ কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে॥
তুষুলি গো রাই, তুষুলি গো ভাই!
তোমার কল্যাণে খাই ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু।
আমার যেন হয় সবার আগে স্বুবর্ণের খাড়ু॥

(ব্রতী শেষদিনে ক্ষীরের নাড়ু দুধে ফুটাইয়া খাইবে।)

এ প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকার বক্তব্য এখানে তুলে ধরা গেল ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার "বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতের কথা" নামক বালখিল্য প্রবন্ধে সেঁজুতীব্রতের 'লিলি পুটিয়ান' চিত্র ও প্রকরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখকের একটি মন্তব্য আমাদের ঐতিহাসিকদের স্মরণীয়,—"খ্যাতনামা লেখকগণ বহু পরিশ্রমে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতেছেন, কিন্তু প্রায়ই এই সকল ইতিহাস শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াও বেশ বুঝা যায় না যে, তাঁহাদের বর্ণিত সময়ে বাঙ্গালীব মেয়েরা কিরূপ ছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা সঙ্কলিত হইলে, হয়ত বুঝিতে পারিবে যে, বাঙ্গালীর মেয়ের আশা, আকাঙ্খা এবং আবদার কিরূপ ছিল।" এই অভিযোগের উত্তরে ঐতিহাসিকগণের পক্ষ হইতে বলা যায়, এই সবে ইতিহাসের পত্তন হইতেছে। আর তাঁহারা এ পর্য্যন্ত যে ইতিহাস-সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা রাজার ইতিহাস,—প্রকৃত ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র। প্রজার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। কিন্তু আশা করি, তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিবে না। (সাহিত্য-১৭বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩১৩ পৃষ্ঠা-৩২০)

৬. সমুদ্র-যাত্রা

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক বৃহন্নারদীয় বচনের ব্যাখ্যা।

২। Foreign Travel and Hindu Shastras. A Judgment in the Benares Caste case. The 18th September, 1911.

৩। Indian shipping—A History of the Sea-borne trade and maritime activity of the Indians trom the earliest times by Radha Kumud Mukherjee M. A. 1912.

৪। কলিকাতা অধিবেশনে সমগ্র কায়স্থ মণ্ডলীর কায়স্থের সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ।

৫। বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে অভিমত।

৬। বঙ্গবাসীতে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ একখানি উপপুরাণ। কিন্তু উপপুরাণ বলিয়া নগণ্য নহে। কমলাকারের নির্ণয়সিন্ধুতে, রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে, হেমাদ্রির এবং বহুতর আধুনিক সংগ্রহ-গ্রন্থে বৃহন্নারদীয়ের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ও মত গৃহীত হইয়াছে।

বৃহন্নারদীয়ে আছে :—

সমুদ্র-যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু-বিধারণম্।
দ্বিজানাম্ অসবার্ণাসু কন্যাস্বুপায়মাস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানম্ তথা শ্রাদ্ধে বাণপ্রস্থাশ্রমাংস্তথা॥
দত্ত ক্ষতায়া কন্যায়া পুনর্দানম্ পরস্ব চ।
দীর্ঘকালম্ ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধাম্ চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যান্ আহুর্মণীষিণঃ॥

এই চারিটি শ্লোকও হেমাদ্রি এবং রঘুনন্দন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্লোকগুলি যে প্রামাণিক নয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না।

এই শ্লোক কয়টির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া, কলিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।

বহুদিন হইল, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় মত প্রকাশ করেন যে, এই শ্লোকগুলিতে ভারতবাসী সাধারণ হিন্দুর পক্ষে নৌযানে সমুদ্র-যাত্রার

কোনরূপ বাধা হয় না। যে সমুদ্র-যাত্রা ইহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা একরূপ প্রায়শ্চিত্ত, একটা ধর্ম্ম-কর্ম্ম। এই কথাটি একটু বিস্তৃত করিয়া পরে বলিব।

তাহার পর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেবল উপপুরাণের একটি শ্লোকে নির্ভর করিয়া সমুদ্র-যাত্রা কি নিষিদ্ধ হইয়াছে? তিনি উত্তর করেন, "তা কেন? যখন স্বয়ং মনু সমুদ্রযায়ীকে অপাংক্তেয় করিয়াছেন, তখন সমুদ্র-যাত্রা যে একরূপ নিষিদ্ধ ছিল, তাহার আর সন্দেহ কি?"

সমুদ্র-যায়ী-বন্দী-তৈলিকঃ-কূটকারকঃ প্রভৃতি বহুতর ব্যক্তি অপাংক্তেয়। কিন্তু সমুদ্র-যায়ী কাহাকে বলে? কুল্লুক বলেন:—সমুদ্র-যায়ী = "সমুদ্রে যো বাহিত্রাদিনা দ্বীপান্তরং গচ্ছতি", তাহা হইলে, সমুদ্র-যায়ী অর্থে Sailor হইল—ব্যবসায়ী দাঁড়ী মাঝি হইল। ব্রাহ্মণে দাঁড়ী মাঝির ব্যবসা করিলে অপাংক্তেয় হইবে, বিচিত্র নহে। সমুদ্রযায়ী—যে পুনঃপুন সমুদ্রে গমন করে—সে দাঁড়ী মাঝি ব্যতীত আর কে হইতে পারে? এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কুল্লুক সমুদ্র-যায়ী শব্দের এরূপ অর্থ করিয়াছেন কিনা বলা যায় না। যাহা হউক, কুল্লুকের অর্থ ঠিক হইলে সাধারণ যাত্রীর পক্ষে সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ হইল না।

বারাণসী ধামে দুইজন আগরওয়ালা বৈশ্যের মধ্যে এই সমুদ্র-যাত্রার কথা লইয়া ১৯১১ সালে একটি প্রবল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত সবজজ্ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সাহায্যে সেই মোকদ্দমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়াছেন। সেই বিচার-পত্রে বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্লোক কয়টির তন্নতন্ন বিচার আছে। তাহার একটু আভাস দিতেছি।

শেষ শ্লোকের শেষ দুই পদে দেখিবেন "ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যান্ আহুর্মণীষিণঃ"—এই সকল ধর্ম্ম কলিযুগে বর্জ্য। সখের সমুদ্র-যাত্রা ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতেই পারে না। শ্লোক-সমষ্টিতে ১৩টি কাজ বর্জন করিবার কথা। সমুদ্র-যাত্রা ছাড়া আরও ১২টি এই:—কমণ্ডলু ধারণ, দ্বিজদিগের অসবর্ণ কন্যা-বিবাহ; দেবর দ্বারা সন্তানোৎপত্তি, মধুপর্কে পশুবধ; শ্রাদ্ধে মাংসদান, বাণপ্রস্থাশ্রম, দত্ত কন্যার পুনর্দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান, গোমেধ। এই সকলগুলি অন্য অন্য যুগে ধর্ম্মকার্য্য মনে করিবার বিধি থাকিলেও, কলিতে বর্জ্জনীয়। ঐ বারটির সঙ্গে সাধারণ সমুদ্র-যাত্রা কিরূপে নিষিদ্ধ হইবে? তবে ঐ প্রথম কথাটাকেই বিশেষ রূপে "সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার" ধরিতে হইবে। স্বীকার কথা দ্বারা বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। এই কথাই বহু পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, বারাণসীরও কয়জন পণ্ডিত এই মোক-

দ্দমাতে তাহাই বলিয়াছেন।

কিরূপ সমুদ্র-যাত্রার কথা বৃহন্নারদীয় বলিয়াছেন, তাহা পারাশরীস্মৃতি হইতে এবং কূর্ম্মপুরাণ হইতে বুঝা যায়।

চতুর্বিদ্যোপপন্নে তু বিধিবৎ ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্র সেতু-গমনং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ (পরাশর)
গত্বা রামেশ্বরং পুণ্যং স্নাত্বা চৈব মহোদধৌ।
ব্রহ্মচর্য্যাদিভির্যুক্তাঃ দৃষ্ট্বা রুদ্রং বিমোচয়েৎ॥

সুতরাং ঐ সমুদ্র-যাত্রা স্বীকার যে সাধারণ সমুদ্র-যাত্রা পক্ষে নহে তাহা একরূপ নিশ্চয়। বারাণসীর ঐ মোকদ্দমায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা সাক্ষীস্বরূপ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস সর্ব্বত্রই সমুদ্র-যাত্রার কথা আছে, এবং সমুদ্র-যাত্রা যে সদাচার বা শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, কল্কিপুরাণ, বরাহপুরাণ, ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রার বিবরণ আছে।

ঐ মোকদ্দমার বিচার-পত্র পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সমুদ্র-যাত্রা কোনকালেই নিষিদ্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণের পক্ষে জাহাজে দাঁড়ী মাঝির ব্যবসায় হেয় হইলেও, ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষে নিষিদ্ধ কখনই ছিল না। আর উত্তর ভারতবাসীর পক্ষে জীবিকার্থে ঐরূপ ব্যবসায় শিষ্টাচার সম্মত ছিল।

ব্রাহ্মণের পক্ষে যখন ঐরূপ, তখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে কোথাও কোনরূপ বাধাই ছিল না। বসু বিচার-পতি এই বিষয়ে সুন্দর যুক্তি দেখাইয়া মীমাংসা করিয়াছেন :—

Thus it follows that the Sea-voyage is not prohibited to any one of the three lower castes through out India, and only the Profession of Sea-trade is prohibited by Baudhayana to the Brahmins of the South. The Sea-voyage for the purposes of study or foreign travel or to spread one's religion or knowledge is not prohibited to any caste even by him.

ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। উপরে একরূপ দেওয়া হইয়াছে। বৌধায়নের সূত্র লইয়া বসু-বিচারপতি অনেক পরিশ্রম করিয়া ঐ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এরূপভাবে সামাজিক বা শাস্ত্র কথার বিচার এক দ্বারকানাথ মিত্রের ছাড়া আর প্রায় কাহারও দেখা যায় না। উভয়কেই কায়স্থ কুলতিলক

বলিতে হয়।

এই বিচার ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর শেষ হয়। তাহার ১৫ মাস পূর্ব্বে বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থের (Indian Shipping 'ভারতে জাহাজ চালান') রচনা শেষ করেন। কিন্তু গ্রন্থ ১৯১২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্য পান নাই। এই গ্রন্থের কিয়দংশ যে ডন্ মাগেজিনে, খণ্ডশ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাও বোধ হয় দেখেন নাই।

রাধাকুমুদ বাবুর ইংরাজী গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব। গ্রন্থ পাইয়াই আমি লিখিয়াছিলাম, এই গ্রন্থের সমালোচনা আর কি করিব, ইহা হইতে আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। শুধু শিক্ষা নহে, রাধাকুমুদ বাবুর গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত হইয়াছি। আমরা ভারতবাসী, ভারতের কিছুই জানি না বলিলেই হয়, সাহেবরা যা বলা কহা করেন, প্রধানত তাহাই কপ্‌চাইয়া থাকি। লর্ড কর্জন একজন এ সকল বিষয়ে পণ্ডিত লোক, পাণ্ডিত্য বলেই 'রাজত্ব' করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুস্তক পাইয়া বলিয়াছেন যে, এই পুস্তকে, ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের জ্ঞান-ভাণ্ডার বর্দ্ধিত হইল। বাস্তবিক এত অজানা কথা আমাদিগকে জানান হইয়াছে যে, আমরা প্রতিপত্রে বিস্মিত হই।

এই পুস্তক ইংরাজিতে লিখিত হওয়াতে বিদেশে ইহার বিশেষ যশ হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজি-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী মণ্ডলে তেমন প্রচার লাভ করে নাই। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচয় প্রদানার্থই এই ক্ষীণ হস্তে যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

গ্রন্থের প্রধানত দুইভাগ—

১। হিন্দু সময়। ২। মুসলমান সময়। হিন্দু সময়ে যে সমুদ্রে নৌচালনা বিলক্ষণ ছিল, তাহা দেখান হইয়াছে।*

বেদে আছে যে, তুগ্র রাজর্ষির পুত্র ভজ্যুকুমার পিতৃ-আজ্ঞায় শত্রুদিগের বিরুদ্ধে দূরস্থ দ্বীপপুঞ্জে পোতারোহণে গমন করেন ; সমুদ্র-পথে প্রবল বাত্যায় তাঁহার পোত নষ্ট হয়, এবং তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক তাঁহাদের শতদণ্ড

* মনুর যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সমুদ্র-যাত্রার প্রশস্ততা আমাদিগকে দেখান, সেই শ্লোকের সমুদ্র-যায়ী অর্থে রাধাকুমুদ বাবু **A Brahmin who has gone to Sea** বলেন। আমরা মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থার আভাসে, পরে শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিচার-পত্রের বিস্তৃত যুক্তির বলে, দেখাইয়াছি যে, ঐ সমুদ্র-যায়ীর অর্থ যাহারা দাঁড়ী-মাঝির মত পুনঃপুনঃ সমুদ্রে গমন করে, সুতরাং রাধাকুমুদ বাবুর গ্রন্থে চন্দ্রে কলঙ্কের মত একটু ভুল রহিয়াছে।

পোতের দ্বারা রক্ষা পান। কিন্তু বেদের কথা, না হয়, ছাড়িয়া দিলাম। রামায়ণে বহুস্থলে সমুদ্র গমনের কথা আছে। অযোধ্যা কাণ্ড, ৮৪ অধ্যায়ে, ৩৮ম শ্লোকে আছে,—

নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনাস্তিয়ো অভ্যন্তোদয়েৎ ॥

শত শত বর্মাচ্ছাদিতবপু যুবক কৈবর্ত্তগণ পঞ্চশত নৌকায়, শত্রুর পথ রোধ করিবার নিমিত্ত, অপেক্ষা করুক।

ঐরূপ নৌ-যুদ্ধের কথা আছে। আর কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সুগ্রীব অনেককেই সমুদ্র-মধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জে গিয়া সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন।

মহাভারতে দেখা যায়—সভাপর্ব্বে নকুল তাম্রদ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়া ম্লেচ্ছ, রাক্ষস নিষাদদিগকে জয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা অতি বিপুল অবয়ব। বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, আখ্যায়িকা রাশি রাশি ইহাতে আছে; রাধাকুমুদ বাবু আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম সহকারে সমগ্র সংস্কৃত ভাষা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে, পোত নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাওয়া যায়, সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল মুদ্রিত পুস্তক নহে, সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে একখানি হাতের লেখা গ্রন্থ আছে, তাহাতে জাহাজ গঠনের কথা আছে, সেখান হইতেও তিনি বিস্তর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, জাহাজ কিরূপে গড়িতে হয়, কত বড় করিতে হয় ইত্যাদি। গ্রন্থখানির নাম "যুক্তি কল্পতরু"! কেবল সংস্কৃত বলিয়া নহে, আরবী, পারসীর ইংরাজি অনুবাদ হইতে, বৌদ্ধ ইতিহাস হইতেও তিনি বিস্তর সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার পর যেখানে যাহা খোদিত বা চিত্রিত আছে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সুদূর যবদ্বীপে, সিংহলে যাহা আছে, তাহারও প্রতিকৃতি দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ৺জগন্নাথ মন্দিরের গাত্রে, ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের পশ্চিম পার্শ্বের এক মন্দিরের শিরোদেশে, অজন্তার গুহায়, মাদুরার পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ চিত্রে—ভারতের সর্ব্বত্র স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া তিনি সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়, ধন্য তাঁহার পরিশ্রম! সুখের কথা এই যে, এই অগাধ পরিশ্রম, এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে সার্থক হইয়াছে। সার্থক হইয়াছে কেন বলিতেছি, তাই বলি। আমাদের সমস্ত বঙ্গদেশে এই সমুদ্র-যাত্রার ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে।

কলিকাতায় গত বৎসর যে ভারতের সমগ্র কায়স্থ জাতির সম্মিলন হয়

(All India Kayastha Conference), তাহাতে সংকল্প স্থির হইয়াছে যে, কায়স্থগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করিতে পারিবেন। অর্থাৎ অন্যদিকে ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিলে, কেবল সমুদ্র যাত্রায় ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না।

উত্তর পশ্চিমে ওস্‌য়াল্ বণিকদিগের মধ্যে যে মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে. তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি—বিচারাসনের বিচারে স্থির হইয়াছে, ঐ জাতির মধ্যে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ নহে।

বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতে সমবেত হন—কিন্তু সেকথা ঘোষণা করিতে নিরস্ত হইয়াছেন।

বঙ্গবাসীর স্তম্ভে শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় স্বীয় সুবিস্তৃত মত প্রচার করিয়াছেন—এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু উপক্রমণিকার ভাবে বোধ হইতেছে, তাঁহার মত যে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র সমুদ্র-যাত্রায় কোনরূপ অধর্ম্ম নাই।

তাই বলিতেছিলাম, রাধাকুমুদ বাবুর বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল শ্রম এবং অধ্যবসায় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। দেশের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। এখন জনকতক ধনশালী লোক হিন্দু জাহাজ চালাইতে পারিলেই,—আমাদের এই সুদীর্ঘ সমালোচনা সার্থক হয়। সুযোগ্য গ্রন্থকারকে একটি অনুরোধ, তিনি যেন এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ অচিরে প্রকাশ করেন।

সমুদ্র-যাত্রা প্রসঙ্গেঃ আমাদের মন্তব্য

এই সমুদ্র যাত্রার আন্দোলন ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রের দ্বারাই দেশ ও সমাজ যতটা শাসিত নয়, দেশাচার ও কুলাচারের দ্বারাই তাহাপেক্ষা শতগুণে শাসিত। কথাটা সত্য। আমাদের দেশের দশজনে—সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি, দশজনে মিলিয়া যাহা করিব, তাহাই ত চলিবে। প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে, বিলাতী ঔষধ পথ্য ব্যবহার করিলে জাতি যাইত; সেলাই করা জামা পরিয়া জলপান করিলে জাতি যাইত। বিধবারা এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা গোল আলু, কপি, পেঁপে প্রভৃতি খাইলে জাতি যাইত। পুরুষোত্তমের ভোগে এখনও এসকল সামগ্রী ব্যবহৃত হয় না। পরের স্পৃষ্ট জল কেহই পান করিত না। হালুই করের দোকানে তৈয়ারী লুচি, কচুরি, সিঙ্গাড়া গজা কেহ খাইত না।

আর এখন কি হইয়াছে? এখন বিলাতী ঔষধ পথ্য সকলেই খায়। আলু, কপি, এমন কি পেঁয়াজ, রসুন পর্য্যন্ত পাংক্তেয় হইয়া গিয়াছে। দোকানের কচুরি, জিলাপী-ত কোন ছার্—হংস ডিম্ব, কুলীরক এবং অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত নানা জীবের মাংস যে প্রকাশ্যে খাইতেছে, এমনকি, পাঁঠার ঘুগ্‌নী, কাব্‌লে

মটর, প্রভৃতি পাড়ায় পাড়ায় বিকাইতেছে—ছেলেরা খাইতেছে। ইহার উপর বরফ এখন দুর্গোৎসবের পংক্তি ভোজনেও চলে। ডাবের জলে বরফ মিলাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেও পান করেন। সোডা লিমনেড্, মুটে মজুর মেছুনীতেও পান করে। চায়ের দোকান ত জগন্নাথ ক্ষেত্র—সেখানে হিন্দু মুসলমান, মেথর মুদ্দ ফরাস, বাবু ব্রাহ্মণ,—কায়স্থ এবং টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবাই একপাত্রে চা পান করিতেছে।

এসব ত অনির্দ্দিষ্ট পাপ। সর্ব্বদাই দেখিতে পাই বটে, কিন্তু কাহাকেও তজ্জন্য শাসন করিতে পারি না। লাট বাড়ীর ভোজে ষ্টেট্-ডিনারে যাঁহারা সাহেব-সুবার পাশে বসিয়া দ্বিপদ, চতুষ্পদ জীব-মাংস উদরস্থ করেন, এখন তাঁহাদের নাম খবর-কাগজে বাহির হয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ এই সকল ভোজে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের ত কাহারও জাতি যায় না। পূর্ব্বে একবার—মহারাজ রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর এই প্রকার এক 'ষ্টেট্-ডিনারে' ভোজ খাইয়াছিলেন। সেকথা লইয়া 'বসন্তকে' অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়া বাহির হইয়াছিল। সমাজের দশজনে মহারাজের উপর রুষ্ট হইয়াছিল। আর এখন রাজা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল গোস্বামী, রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ 'ষ্টেট্-ডিনারে' ভোজ খাইয়া আসিতেছেন, কই, তাঁহারা ত একঘরে হন না। সুরাপান করিলে আর জাতি যায় না। সুরাপায়ী যবনীজার ব্রাহ্মণও সমাজে বিরাজ করিতেছে। হোটেলে মুর্গী-মটন অনেকেই খাইতেছে। পূর্ব্বে বরং গোপন করিত, এখন প্রকাশ্যেই খাইতেছে।

রেঙ্গুন, হংকঙ্, চীন, জাপান, মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণ যাতায়াত করিতেছেন। যখন জাহাজে থাকেন, তখন বিলাতী ঢংঙ্গেই থাকেন। অথচ, তাঁহারা দেশে আসিয়া কেহই এক ঘরে হন না। চীন, হংকঙ পর্য্যন্ত সমুদ্রযাত্রা করিলে, জাহাজে চড়িয়া সিংহলে যাতায়াত করিলে, এমনকি, জগন্নাথ এ রেঙ্গুনে যাতায়াত করিলে, যদি জাতি না যায়, কেহ একঘরে না হয়, তাহা হইলে সুয়েজখাল পার হইয়া বিলাতে যাইলেই কি যত দোষ ঘটিবে? কলিকাতার কায়স্থদের কথা বলিলাম না। কারণ, তাঁহারা বিলাত-যাত্রা সমাজে চালাইয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে মুর্গী-মটন ভোজন করেন, হোটেলে খান, 'ষ্টেট্-ডিনারে' প্রসাদ পান। অথচ, তাহাদের জাতি যায় না। তাঁহাদের ছেলেমেয়ের বিবাহ নিয়মিত হইতেছে। সামাজিক কার্য্যে গুরু পুরোহিত আসিতেছেন, ঘণ্টাও নাড়িতেছেন,—চিংড়িং

চাড়াং ফিড়িং ফাড়াং করিয়া টিকিদান ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রও পড়িতেছেন। কোন গোল, কোন বাধা ঠেকিতেছে না। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কলিকাতার কায়স্থ-সমাজ দশজনে মিলিত হইয়া যাহা চালাইয়াছেন, তাহা শাস্ত্র-অনুকূল হউক বা নাই হউক, সমাজে চলিয়াছে ত!

অতএব বলিতে হয়, শাস্ত্রের দোহাই দাও কেন? শাস্ত্র মানে কে? শাস্ত্রের জন্য ভাবনা কাহার? স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কে ব্যথিত? উপরে যে সকল ঘটনার কথা লিখিলাম, তাহার একটিও মিথ্যা বা অত্যুক্তি নাই। কেবলই কি এইটুকু? যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের ব্যবসায় করে, ধর্ম্ম বেচিয়া খায়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে মরণের পূর্ব্বে একঘর মুরগী পুষিয়া মুরগী খাইতে-খাইতে মানব-লীলা সম্বরণ করে। আর তাহাদের গুরু-পুরোহিত অম্লান বদনে তেমন মুর্গী খোরের শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া, হিন্দু ধর্ম্মের ডঙ্কা মারিয়া 'বিদায়' লইয়া আসেন। স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য চিন্তা কাহারও ত নাই। চিন্তা কেবল ছেলে মেয়ের বিবাহ লইয়া! ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! যদি বিলাত যাইলে, সাহেব সাজিলে পরে একঘরে হইতে হয়, তাহা হইলে ছেলে মেয়ের বিবাহে বেগ পাইতে হইবে ভাবিয়াই অনেকে বিলাত যাত্রাটা সমাজ-প্রচলিত করিবার জন্য উৎসুক। এখনও বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে টাকার জোরে সকল কাজ হয় না। যাহা টাকার জোরে হয়, তাহা টাকা না থাকিলে আর হয় না। এটুকু বাঙ্গালার অনেক ধনী বড়-লোকের পরিণাম দেখিয়া আধুনিক বড়লোক বিলাত ফেরতাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছে। তাই বিলাত-যাত্রাটা যাহাতে ব্রাহ্মণের মধ্যে চলিয়া যায়, মফঃস্বলবাসী কায়স্থের মধ্যে সাধারণ ভাবে আরও চলিয়া যায়, সে চেষ্টা অনেকেই করিতেছে। তাঁহারা বলেন, সমাজে যখন স্বেচ্ছাচার প্রবল ভাবে চলিতেছে, তখন বিলাত ফেরতার বিরুদ্ধে বালীর বাঁধ রাখো কেন? একথার ঠিক উত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। এ বালীর বাঁধ যে টিকিবে না, তাহাও অনেকে অনুমান করিতেছে।

আমাদের সোজা কথা আছে। পার যদি ত হিন্দু হও। হিন্দুত্বের সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার আপোষ সম্ভব নহে। হিন্দু হইতে হইলে ষোল-আনা হইতে হইবে। শাস্ত্রের প্রতি যাহার প্রগাঢ় মমতা আছে, শাস্ত্রের বিধি নিষেধকে যে ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মনে করে, সেই হিন্দু হইতে পারে। যাহার অর্থলোভ আছে, উপার্জ্জন আকাঙ্ক্ষা আছে, বড় হইবার উচ্চাভিলাষ আছে, সে পারে না,— কখনও পারিবে না। কারণ সে যে দুর্ব্বল! ইউরোপীয় সভ্যতা—ভোগবিলাসের

সভ্যতা। আবার জগজ্জয়ী রাজার জাতির সভ্যতা। মান, পদ, যশ, গৌরব এসকলই জীবনের ঈপ্সিত হইলে রাজার জাতির আনুকুল্য করিতে হইবে—ইউরোপীয় সভ্যতার সমর্থন করিতে হইবে। এমন লোকে খাঁটি হিন্দু হইতে পারে না। মোটের উপর বলা চলে যে, এমন ধর্ম্মপরায়ণ নিরীহ হিন্দু সমাজে এখন দুর্ল্লভ। যাঁহারা সমাজ সমুদ্রের বক্ষের উপর ফেনের ন্যায় ভাসিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা ত ফেন-ধর্ম্মাবলম্বী ;—এক ফুৎকারে গলিয়া মিশিয়া যাইবে। হিন্দুত্ব রক্ষার সংযম ও পুরুষকার তাঁহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এমন অবস্থায় বাজে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের বচনে ঝঙ্কার দিয়া একটা আন্দোলন তুলিলে, কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। আমরা কপটতার বিরোধী। ভক্তি-সৃষ্টির আনুকুল্য আমরা করিব না। পাপের সহিত পুণ্যের আপোষে আমরা ব্যর্থ চেষ্টা করিব না।

আমাদের মনে হয়, আরও কিছুকাল পরে বিলাতগমন ও সাহেব-সাজা অনেকটা কমিয়া যাইবে—অর্থে ও সামর্থ্যে কুলাইবে না বলিয়া কমিবে—সাহেবীয়ানা আমাদের প্রকৃতিতে খাপ খায় না বলিয়াও কমিবে। এখন এই নিষেধ বিধি আছে বলিয়াই—বিলাত যাইলে জাতি যায় বলিয়া অনেকে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য, ঝোঁকের উপর সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিলাত যাইতেছে। যখন এ নিষেধ-বিধি উঠিয়া যাইবে,—বিলাত যাইলে আর জাতি যাইবে না,—যখন সমাজ অধিকতর দরিদ্র হইবে—সাহেবীয়ানা করিতে অর্থে কুলাইবে না—তখন প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে আমাদের বিলাতী মোহ ঘুচিবেই। এখন যত বাধা দিবে, ততই বিলাত যাত্রার অনুকূল তরঙ্গ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে। (প্রবাহিনী ৮ই ফাল্গুন, ১৩২৩। পৃষ্ঠা—৭১-৭২)

অক্ষয়চন্দ্র ও সাহিত্যসাধনা

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম মণ্ডলীর 'শেষ জ্যোতিষ্ক' অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনের রবীন্দ্রপর্বেও বিশিষ্ট লেখকরূপে সমাদৃত। তখনও তাঁর মনীষা ও রচনাশক্তির প্রভাব প্রবল ছিল। একদিকে 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'সাহিত্য' অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা তথা সমাজ-চিন্তার সমর্থন করতেন, অন্যদিকে 'প্রবাসী' তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষও অক্ষয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এখানেই সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্রের স্বকীয়তা।

অক্ষয়চন্দ্রের রচিত কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতির সামগ্রিক তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ করা বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর প্রকাশিত সব গ্রন্থের ধারাবাহিক পর্যালোচনা করাও আমাদের অভিপ্রেত নয়। 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব', 'সমকালীন প্রসঙ্গ' এবং 'গ্রন্থ সমালোচনা' শীর্ষক আলোচনাতেও, সাহিত্য সাধক অক্ষয়চন্দ্রের বহুমুখী মনস্বিতার পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। এখানে কয়েকটি মাত্র বইয়ের আলোচনায় অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার তাৎপর্যময় দিকগুলি তুলে ধরা হবে।

প্রথমেই আলোচ্য অক্ষয়চন্দ্রের কাব্যচর্চা। তাঁর রচিত কবিতার সংখ্যা বেশী নয়। মধুসূদন-হেমচন্দ্রের যুগে কবি অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ ভূমিকা সুধী সমালোচকগণ স্বীকার করেন নি। কিন্তু যে কারণে 'ঈশ্বরগুপ্ত বাঙালীর শেষ কবি', সেই কারণেই অক্ষয়চন্দ্রের 'শিক্ষানবিশের পদ্য' (১২৮১), বা 'গোচারণের মাঠ' (১২৮৭) ব্যাপক পাঠক সাধারণের সমাদর পেয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য*, 'পয়ার-প্রিয়' গঙ্গাচরণের পুত্র-শিষ্য অক্ষয়চন্দ্রের কবি-ভাষা সাধারণের প্রাণের ভাষার অনেক কাছাকাছি। তাই দুটি কাব্য গ্রন্থেরই একাধিক সংস্করণ হয়েছিল।

ছাত্র বয়সে রচিত পদ্য নিরীক্ষা 'শিক্ষানবিশের পদ্য'। এর মধ্যে 'বন্দীর বিলাপ', 'ভারতবর্ষ', ও 'সাগর' বায়রনের অনুবাদ ও অনুকরণ। 'যাঁহারা ইংরাজি বুঝেন না তাঁহারা বায়রনের অনুবাদ হইতেও স্বদেশানুরাগ শিক্ষা করিতে

* বঙ্কিমের 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব' রচনার কিছু পূর্বে অক্ষয়চন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধটি রচিত। (নবজীবন ১২৯২)

পারিবেন। আর এ শিক্ষা সৎশিক্ষা।'[১] এছাড়া মহাভারত থেকে গৃহীত 'নারী', ইংরাজী সাময়িক-পত্রের অনুসরণে 'একদিন', 'হাসিকান্না' ও 'মৃত্যু'।

অক্ষয়চন্দ্র কাব্যের ক্ষেত্রে 'শিক্ষানবিশ' হলেও গঙ্গাচরণের ঐতিহ্যেই ছন্দবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এবিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক; 'শিক্ষানবিশের ছন্দোবন্ধ পূর্ব প্রথানুসারী নহে, ত্রয়োদশ-বর্ণ-সমষ্টিকে অর্ধ-পয়াররূপে গণ্য করিয়াছি, আবার অনেক স্থানে সেই অর্ধ-পয়ারে ষোলটি অক্ষর আছে। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী একত্র মাখামাখি করিয়াছি। এরূপ করিবার যুক্তি আছে।' (অ. সা. স, শেষার্ধ পৃঃ ১১৮)

'বন্দীর বিলাপ' বায়রনের 'Prisoner of chillon' কবিতার অনুবাদ।

My hair is grey, but not with years,
Nor grew it white in a Single night,
As men have grown from sudden fears.
এই কেশ মম কাশ-কুসুম-সঙ্কাশ
বয়সেতে নয়, ইহা স্বভাবেতে নয়,
হয় নাই ধবলিত পেয়ে মহা ভয়,
শুনিয়াছি তাও নাকি কার' কার' হয়।
They chained us each to a colum stone,
And we were three-yet each, alone,
We could not move a single Pace,
We could not See each other's face.
জনে জনে থামে থামে বাঁধা হয়ে থাকি,
তিন জন তিন ঠাঁই—একত্র—একাকী;
চরণ-চারণ করি হেন সাধ্য নাই,
পরস্পর পরস্পরে হেরিতে না পাই।
A light broke in upon my brain,
It was the carol of a bird;
It ceased, then it come again,
The Sweetest Song ear ever heard,
মোহ আঁধিয়ারে আলো, হ'ল জ্ঞানলেশ,
বিহঙ্গ-কাকলি কাণে করিল প্রবেশ,

কভু থামে কভু শুনি মোহনিয়া স্বর,
কখন শুনিনে আহা ! এমন মধুর,
মধুর সুধার ধারে বধির করিল,
আঁখিপথে সেই ধারা বহিতে লাগিল,
সে নয়নে নিজ ভাব বুঝিতে নারিনু ।

শেষ তিনটি পংক্তি অক্ষয়চন্দ্রের সম্প্রসারণ, বায়রনের ছিল না ।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সাধারণতঃ বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের কোন রচনা সমালোচিত হত না। অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রম আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' (১২৮৭) ও অক্ষয়চন্দ্রের 'শিক্ষানবিশের পদ্য'। 'শিক্ষানবিশের পদ্য' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য,—'শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন, যে অক্ষয়বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাঁহার এইমাত্র বলিব, যে বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। সেগুলি তিনি স্বনামযুক্তে পুনর্মুদ্রিত করিবেন, এরূপ ভরসা আছে। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক, অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু গদ্যে যাদৃশ শক্তিশালী পদ্যে সেরূপ নহেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"[২]

বায়রনের Ocean কবিতার অনুবাদ 'সাগর' কবিতায় পরিস্ফুট। কবিতাটির অনুবাদ যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য স্মর্তব্য ;—"অনুবাদ কিরূপ হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

Roll on, thou deep and dark Blue
ocean roll,
সুনীল গভীর সিন্ধো কল্লোলিয়া চল',
Ten thousand fleets sweep over
thee in vain ;
লক্ষ পোত বক্ষে তব বৃথা ভাসি যায় ;
Man marks the earth with ruin
ধরাধাম ধ্বংস করে মানবের বল,
his control,
Stops with the ahore ;

নর-গরিমার সীমা সাগর-বেলায়,
Upon the watery plain
the wrecks are all thy dead, nor
doth remain
A Shadow of mans ravage, save
his own,
না থাকে আঁচড় কভু তব নীলকায় ;
তব কীর্ত্তি তব অঙ্গে ; মানব যখন
when, for a moment, like a drop
of rain
সহসা সাগর-গর্ভে বৃষ্টি বিন্দু প্রায়
He sinks into thy depths with
bubbling groan
হাবু ডুবু খেয়ে ডোবে, কেবল তখন
without a grave, unknell'd
Uncoffin'd and unknown,
সে দেহ বহন করে ? কে করে দহন ?
কেবা হরি বোল বলে ? কে করে ক্রন্দন ?

ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, যে ইংরাজি পদ্যের এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ আমরা আর কোথায় দেখি নাই।

এ গ্রন্থে দুইটি মাত্র পদ্য, অনুবাদিত বা অনুকৃত নহে। তন্মধ্যে 'হাসিকান্না'র প্রথমাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

'মলিন ভুবন কেন বিষাদে বিকল ?
ধরাধর বরষিছে কেন আঁখি-জল ?
কাছে গঙ্গা ভরাজলে, কিনারায় টলটলে,
প্রবল পবন বলে কেন করে কল্ কল ?
কূলেতে কদম্ব গাছে বিহঙ্গ বসিয়া আছে,
নাহি গায় নাহি নাচে, কেন ভয়েতে বিহ্বল ?
পরপারে দৃষ্টি হয়, সব অন্ধকারময়,
সহে বৃষ্টি তরুচয়, নীরবে নিচল !

এই যে চাহিল রবি, ধরাধরে নব ছবি,
পুলকে বলিছে কবি বলিহারি কল!
কাঁদে বিশ্ব কাঁদি আমি, হাসিনু হাসালে তুমি,
হাসিকান্না পূর্ণভূমি, তোমারি কৌশল!”৩

এই সূত্রে 'নবরত্ন সভা'-র সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য। সেখানেই তাঁর কাব্যচর্চার হাতে খড়ি। শিক্ষানবিশ কবির আরেকটি রচনা বায়রণীয় কাব্যশৈলীতে রচিত হলেও মৌলিক ভাবনার পরিচয়বহ। পাঁচটি দীর্ঘ স্তবকে রচিত 'মৃত্যু' কবিতায় পাঁচটি ভিন্ন ধরণের মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে—বিবাহবাসরে সর্পাঘাতে বরের মৃত্যু, মৃতশিশু প্রসবে মায়ের আশাভঙ্গ, আবেগপ্রবণ দেশ-প্রেমিকের উদ্বোন্ধনে মৃত্যু, বিলাসীবাবুর অমিতাচারে মৃত্যু। শেষের দৃষ্টান্ত থেকে বাবুদের বিলাসচিত্র উদ্ধৃত করা যেতে পারে;—

'আসিল রজনী! নাচ হইল আরম্ভ;
সুন্দর বৈঠকখানা বড় বড় ঝাড়
ঝুলিছে, জ্বলিছে বাতি; চৌদিকে শোভিছে
বিশাল দর্পণ চারু, তার প্রতিবিম্ব
উপহাসি দেখাইছে বাবুর সমাজে,
সেই মত কতগুলি চিত্র নাট্যালয়।

* * *

আতর গোলাপ-পাশ; অতি দীর্ঘ নল
ধরিয়া স্বুবর্ণ হুক্কা করিতেছে দম্ভ;
চলিছে দরিয়া মরি!' (অ. সা. স শেষার্ধ পৃঃ-৭৯৩-৯৪)

বলা বাহুল্য, এখানে সমাজ-সংস্কারক অক্ষয়চন্দ্রকেই প্রত্যক্ষ করা যায়, কবি অক্ষয়চন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণরহস্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। অবশ্য পরিণত বয়সে তাঁর ধারণা যে বদল হয়েছিল, কবি 'হেমচন্দ্র' প্রসঙ্গে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থরূপে 'গোচারণের মাঠ' আলোচ্য। এই ক্ষুদ্র কাব্যটি বহুকাল বিদ্যালয় পাঠ্য ছিল। এবিষয়ে অক্ষয়-শিষ্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি;— 'অক্ষয়চন্দ্র গ্রাবুতে যশস্বী হইয়াছেন, সে যশ গোচারণে গাঢ় হইয়াছে।' (ঐ, পৃঃ-৮৭৩) কবির ভূমিকা থেকে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ বইটির 'ভূয়সী প্রশংসা' করাতেই তিনি পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

'ঊষাকাল', 'বট-জটায় দোলন', 'ঝিঁঝির খেলা', 'চাতক', 'পাহাড়', 'তৃতীয় পহর গত', 'আভাহীন তপন' ও 'কৃষক-বালা'—এই আটটি বিভাগে 'গোচারণের মাঠ' বিভক্ত। যে স্বভাব কবির পরিচয় ছিল 'হাসিকান্না'-য় (শিক্ষানবিশের পদ্য) গোচারণের মাঠে তারই প্রতিষ্ঠা। অক্ষয়কুমার বড়াল যেমন 'শ্রাবণে' এবং অন্য কবিতায় স্বভাবোক্তি চিত্রমালা গেঁথেছেন, অক্ষয়চন্দ্রও তেমনি স্বল্প কথায় সার্থক নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন।

১) কাঁখেতে কলসী লয়ে চলে ধীরে ধীরে,
চুপে চুপে নামে বালা সরোবর-তীরে,
কে যেন কাহার কথা কানেতে বলিল,
সম-বয়সীরে হেরি সলাজ হাসিল। (ঐ, পৃঃ-৭৯৮)

২) রাখাল দাঁড়ায়ে রয় বট-তরু ঘিরে,
গোচারণ-মাঠে গাভী চলে ধীরে ধীরে ;
অমল শামল ঘাসে ঢাকা ধরাতল,
বহু দূর ভরপূর সবুজ কেবল। (ঐ, ঐ)

৩) শিয়াকুল ঝোপে পাখী বাসা করিয়াছে,
ছানাগুলি বুকে ঢাকি গোপনেতে আছে।
রাখালের চোখে চোখে যেমন হইল,
আকুল হইয়া পাখী সরিয়া বসিল। (ঐ, পৃঃ-৮০২)

৪) —'যে যাবার সে যাউক', পূরবীতে বলে,
'আমি ত যাব না কভু যমুনারি জলে ;
যমুনার জলে আমি ছায়া দেখিয়াছি,
সে অবধি যমুনার কূল ছাড়িয়াছি ;
ছায়ার মায়ার বশে হই আনমনা,
যে যাবে সে যাক জলে, আমি ত যাব না।' (ঐ, পৃঃ-৮০৪)

অত্যন্ত সহজ সরল পয়ার বন্ধে কবিতাগুলি রচিত। হরিমোহন সেন, রাজকৃষ্ণ রায় বা মনোমোহন বসুর মত ঈশ্বর গুপ্ত-গোষ্ঠীর কবিরূপেই অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ স্থানটি উপলব্ধি করতে হবে। সেকালে কবি অক্ষয়চন্দ্রের অনুরাগী অল্প ছিল না। 'বান্ধব' পত্রে (১২৮৭-দ্বাদশ সংখ্যা) 'গোচারণের মাঠ' প্রভাবিত কাব্য 'শরদবকাশ' আলোচিত হয়েছে। লেখক—চন্দ্রশেখর কর। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

'কিছুদিন গত পূজা হইত বাড়ীতে,
করিতেন যিনি তিনি যমের বাড়ীতে।
এখন পুরুষ লোক নাহিক বাড়ীতে,
বাড়ীটি রয়েছে শুধু ঘাসাদি বাড়িতে।
ঘরগুলি গেছে খোলা ধানের বাড়িতে,
যে আছে সে উই খসে বাড়িতে বাড়িতে,
সেকালে যেজন কভু এসেছে বাড়ীতে
এবে এনে বুক ভাসে নয়ন-বারিতে।" —যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত

গোচারণের মাঠের অক্ষম ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন স্বতন্ত্র ভাবেও কাব্যটির সমালোচনা লিখেছেন। সমকালীন অভিমত রূপে সমালোচনাটি উদ্ধৃত করা গেল ;—"ইহা একখানি পদ্যময় গ্রন্থ। ইহা বালকদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইহা পড়িয়া সুখী হইবেন। অক্ষয়বাবু একজন প্রসিদ্ধ গদ্যলেখক, গোচারণের মাঠ পদ্য গ্রন্থ হইলেও, ইহা তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ প্রতিষ্ঠার প্রতিরোধিনী হয় নাই। ইহাতে যেমনই ভাষার ক্ষমতা, তেমনই কল্পনার সুকুমার মাধুরী প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার যে নূতন পথে চলিতে জানেন,—ইচ্ছা করিলেই নূতন পথে চলিতে পারেন, ইহার পদে পদে তাহার পরিচয় আছে। গ্রন্থের কলেবর ২৪ পৃষ্ঠা। এই চব্বিশ পৃষ্ঠার পদ্যগ্রন্থে একটিও যুক্তাক্ষর নাই, অথচ প্রীতিপ্রদ কবিত্ব আছে। এই প্রশংসা অনায়াস-লভ্যা নহে। আমরা এস্থলে উষার বর্ণনা হইতে ক একটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রন্থখানি কিরূপ হইয়াছে, এই কয়টি পংক্তি পড়িলেই তাহা প্রতীত হইবে।

'লোহিত কপোলে উষা ঈষৎ হাসিল।
উষাপতি হাসে তাতে উষার আদরে,
উজলে অরুণ-আঁখি নব রাগ ভরে ;
সে হৈম হাসিতে বন ভাসিয়া উঠিল,
শামল সবুজে হাসি গড়ায়ে চলিল।
আকাশের হাসি গিয়া মিশিল আকাশে,
সুনীল আকাশে হাসি আপনিই হাসে।'

সংযুক্ত অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া পদ্য রচনা কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু অসংযুক্ত বর্ণে কবিতা রচনা করিতে হইলে, ভাষার উপর বিশেষ আধিপত্য

চাই। বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের পাঠের জন্য এইরূপ আর একখানি সুখ-পাঠ্য কবিতা পুস্তক আছে কিনা, জানি না। সুতরাং এদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ বিদ্যালয়সমূহে এখানির প্রচলন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ও নিতান্ত উচিত। যাহারা শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়াছে, গোচারণের মাঠ যে তাহাদিগের জন্য একখানি উৎকৃষ্ট শিক্ষাগ্রন্থ হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। তবে বলা যায় না, যাঁহারা শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রাধ্যক্ষ, তাঁহাদিগের মহিমা অসীম। তাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে,—'ইহাতে কেবলই কাটা কাণ ও ফাটা সানের কথা নাই। শামল সবুজে হৈমহাসি প্রভৃতি কঠিন ভাবের কথা আছে, দয়েলের গীত ও বিটপীর সমাধির কথা আছে। অতএব ইহা বালক দিগের অপাঠ্য !'

সুযোগ্য গ্রন্থকারকে উপসংহারে আমাদিগের কেবল একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা স্বীকার করি যে, কবিতার অনুরোধে অন্যমনকে 'আনমন' লেখা যায়, শ্যামলকেও 'শামল' লেখা যাইতে পারে। কিন্তু নূতন নূতন না লিখিয়া 'নওন নওন' কেন ?"[৪]

এছাড়া সাময়িক পত্রে (নবজীবন, পূর্ণিমা প্রভৃতি) তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির কয়েকটি কীর্তনের সুরে, কয়েকটি আগমনীর সুরে রচিত। পুরীর সৌন্দর্য ও ধর্মমহিমা, ভিক্টোরিয়া প্রশস্তি, স্বদেশের জন্য দুঃখবোধ, প্রসাদী সুরের প্যারডি প্রভৃতি 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার'-এ (শেষার্ধ) 'কবিতা ও গান' নামে সঙ্কলিত হয়েছে (মোট সংখ্যা ষোলটি)। রাম বসুর নামে প্রচলিত একটি আগমনী গান—'তুমি যে কয়েছো আমায় গিরিরাজ কতদিন কত কথা' আসলে অক্ষয়চন্দ্রের রচিত। ১৮৮৭ সালে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের উদ্যোগে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই উপলক্ষে অক্ষয়চন্দ্র লেখেন 'পঞ্চাশী পরব'। কবিতাটির মধ্যে ভারত ভুবনেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তির সঙ্গে ক্ষুব্ধ দেশপ্রেমিকদের ব্যঙ্গও অল্প নেই।

যেমন— (নট)

গাও জয় বৃটানিয়া
জয় জয় ভিক্টোরিয়া,
ভাইস্‌রয় জয় জয়, গাও সবে সুখে। (অ. সা. স, শেষার্ধ, পৃঃ-৮১৩)

(সূত্রধার)

অন্নকষ্টে চীৎকার,

বস্ত্রকষ্টে শীৎকার

ছাপায়ে বিষম রোল গাও লক্ষ মুখে। (ঐ, ঐ)

অন্যত্র বলেছেন,—

(সূত্রধার)

লক্ষ্মীক্ষেত্রে নাহি শস্য

কে বুঝিবে এ রহস্য ?

সর্বস্ব যায় যে মা গো, তোমার সদরে। (ঐ, পৃঃ-৮১৪)

অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে কাব্যাংশ অল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনাই বেশি। তবুও মননমূলক প্রবন্ধগুলি আলোচনার পূর্বে কাব্যরসিক অক্ষয়চন্দ্রের আরও একটু পরিচয় দেওয়া যাক। 'অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের আলোচনা আছে। এখানে সে বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। 'বিদ্যাপতি কৃত পদাবলী' অংশে বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন, বসন্ত রায়, চম্পতি, ভূপতি, সিংহ ভূপতি, ভূপতিনাথ প্রভৃতির ভণিতা যুক্ত পদ গৃহীত হয়েছে। 'গোবিন্দ দাস কৃত পদাবলী' অংশেও অনুরূপ একাধিক গোবিন্দ দাসের পদ স্থান পেয়েছে। 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশিত হলে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত হয়েছিল (১৩১১, বৈশাখ)। সমালোচক স্বয়ং বিদ্যাপতি-সঙ্কলক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাই সমালোচনাটির বিশেষ তাৎপর্য আছে; "পূর্বে বিদ্যাপতির গীতাবলী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকল্পতরুর কবিতাকুসুম ও বর্ণাশুদ্ধি কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮০ সালে, শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া মহাজন পদাবলী হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা হয় নাই। পরবর্তী সঙ্কলনকারগণ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী, এমনকি, তাঁহার কৃত অনেক টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সে ঋণ স্বীকার করেন নাই, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তাঁহার সংগৃহীত পাঠ ও তৎকৃত টীকা প্রসাদ হয় নাই, এবং বিদ্যাপতির জন্মস্থান সম্বন্ধে, তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বার্থশূণ্য উদ্যম ও পরিশ্রমে সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

অক্ষয়বাবুর প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' বলিয়া যে পদগুলি আছে, তাহাতে নির্ব্বাচনের কোন প্রণালী নাই, কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির, অবশিষ্ট অপর কবিদিগের। পরবর্তী সঙ্কলনকারগণ এ বিষয়ে অক্ষয়বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া ভাল করিয়াছেন। কিন্তু পদ নির্ব্বাচনে কোন সঙ্কলনকার কোনরূপ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেন নাই। ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতি না থাকিলে নয়।"

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মতামতও এখানে উদ্ধারযোগ্য। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) আলোচনায় বলেছেন, 'আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তৎ সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা কর্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' প্রকাশ করিতেছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দেখিয়াছি তাহাতে কেবল বিদ্যাপতিরই কয়েকটি গীত প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কবিদিগের রচনা এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যায়, তাহাতে এত ভেল মিশান, যে খাঁটি মাল বাছিয়া লইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অক্ষয়বাবু ও সারদাবাবু উৎকৃষ্ট গীত সকল বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্যাপতির রচনা পাঠ-পক্ষে সাধারণ পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই যে তাঁহার ভাষা আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে। সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়। প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনযন করিতেছেন। যে কার্য্যে ইঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরুতর, সুকঠিন, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইঁহারা সে কার্য্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই কৃতবিদ্য এবং অক্ষয়বাবু সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুমার্জ্জিত, এবং তিনি বিদ্যাপতি কাব্যের মর্মজ্ঞ। দুরূহ শব্দ সকলের ইঁহারা যে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি। ভরসা করি, পাঠক সমাজ ইঁহাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবেন।"[৫]

১২৮২ সালে প্রকাশিত 'আলোচনা' গ্রন্থেই মনীষী অক্ষয়চন্দ্রের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারে 'আলোচনা'-র কয়েকটি রচনা মাত্র স্থান পেয়েছে। বস্তুত নাতিদীর্ঘ আকারের আলোচনাগুলি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকা পরিচালনের সাময়িক তাগিদে লিখিত হলেও এগুলিতে লেখকের বিচক্ষণ চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। কয়েকটি রচনার বিষয় ও সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

১) মাংসাহার,—সেকালে আমিষ বনাম নিরামিষ আহারের সঙ্গে জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার এবং দেশরক্ষার প্রশ্নটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। এবিষয়ে মিঃ এল পি ওয়াইন বেথুন সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ* পড়েন, ভূদেব-জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিবাদ করেন। বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক প্রকাশিত তারাপ্রসাদের 'বঙ্গোন্নয়ন' (১২৮৫, ৮৭, ৮৮) প্রবন্ধেও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তও কিছুকাল নিরামিষ ভোজনের পক্ষে জোরালো আন্দোলন চালিয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রও এই বিতর্কে নিরামিষের পক্ষ নিয়েছেন।

"এতদিন অনেকেরই ধারণা ছিল, যে শাকান্ন ভোজন অপেক্ষা মাংসাহারে অধিকতর বলধান হয়। এই সংস্কারটি কতকটা ইংরেজী গ্রন্থাদি পাঠে, কতকটা ইংরেজের শারীরিক বল-বীর্য্য দর্শনে এবং খানিকটা পোলাও কালিয়ার লোভে হইয়াছিল। এতকাল পরে এক বিপদ্ উপস্থিত, বিলাতের একজন বৈজ্ঞানিক একরূপ প্রমাণ করিয়াছেন, যে গোধূম বা তণ্ডুলাদি অপেক্ষা মাংসে অধিকতর বল-বীর্য্য উৎপাদন করে,—এ জ্ঞানটি কুসংস্কার। * * * মাংস গ্লুটেন এবং উদ্ভিদ গ্লুটেন কীমিয় দৃষ্টিতে একই পদার্থ। অর্থাৎ উভয় পদার্থে একই পরিমাণে অঙ্গার জনাদি আছে এ পর্যন্ত কোন তর্ক নাই। কোন বিবাদ নাই। তারপর মতভেদ আছে।"

অর্থাৎ প্রাচীন ইংরেজ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছিলেন মাংসে শ্বেতসার উনিশভাগ, ভাতে সাত বা আট ভাগ থাকে। কিন্তু লাইবিগ, প্লেফেয়ার, বৌসিঙ্গাটের প্রমুখ-পরবর্ত্তী বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, মাংসে ২৫ %. ভাগ বলকারী পদার্থ আছে, কিন্তু চাল, ডাল, গমে ৮২ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত আছে। এজন্যই লেখকের মতে—'সমূহ বিপদ'। কারণ দু'পক্ষই ইংরেজ বিজ্ঞানী। লেখক কোন পক্ষকেই নির্ভুল মনে করেন নি। তাঁর যুক্তি দেশভেদে পাক-প্রণালী ও আহার পদ্ধতি অনুযায়ী খাদ্যের বলাধান হয়। 'শস্যাহার অধিকতর উপকারী বলিয়াই, নিরামিষাহারী সিপাহীরা, গোরা সৈন্য অপেক্ষা অধিকতর শ্রমসহিষ্ণু ও যুদ্ধক্ষম, এবং সেই জন্যই গোল আলু ভোজী আইরিশ সৈন্য গো-খাদক ইংরেজ সৈন্য অপেক্ষা যুদ্ধে যশস্বী।' লেখকের সিদ্ধান্ত—'যদি কেবল বলাধানের প্রয়োজন

---

*Bodily Training—Its effect on National Character. (১৮৬৮, ১২ই মার্চ)

হয়, তাহা হইলে ক্বাথ সহিত আতপান্ন অথবা স্বঘৃত খেচরান্নই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।'

২) ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিতেছি?—এই শীর্ষক আলোচনায় যে হারে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে বাসস্থান ও খাদ্যের অভাব অনিবার্য হয়ে উঠবে,—প্রবন্ধটিতে খুব সহজ সরল কথায় এই সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। লেখক সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। প্রকৃতির কাছে যে মানুষ আত্মসমর্পন করে, তার মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামেই মানুষের বেঁচে থাকার শক্তি প্রমাণিত হয়। "স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া টেঁকিয়া থাকার নামই মনুষ্যত্ব। স্বভাব—বায়ু, বৃষ্টি ও বজ্র বর্ষনে আমাদের অবসন্ন করিয়া ফেলেন, বাটী ঘর তৈয়ার করিয়া সেই কষ্ট নিবারণ করার নাম মনুষ্যত্ব। স্বভাবজাত নদ, নদী, হ্রদ, সাগর প্রভৃতি এক জাতিকে অন্য জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, মানব পোত বহর বানাইয়া সেই জাতির মেল করিতেছে; মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি করিতেছে। স্বভাবের রৌদ্রের বিরুদ্ধে মানুষের ছাতা; স্বভাবের গ্রীষ্মের বিপক্ষে মানুষের পাখা ইত্যাদি ছোট-বড় সকল কাজেই দেখিবেন প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার হ্রাস করাই মনুষ্যত্ব।"

এরপর তিনি ইংলণ্ড ও চীনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ইংলণ্ড সারা পৃথিবীর সম্পদ আহরণ করে নিজের দেশের সমস্যা মিটিয়েছে। চীনের লোকসংখ্যাও প্রচুর কিন্তু সংগ্রাম করেই তাঁরা অন্ন কষ্ট জয় করেছে। 'চীনে যেরূপ লোকসংখ্যা, ঘনবসতি, তাহাতে শ্রমদক্ষ চীনেমানেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া টেকিয়া রহিয়াছে তাই,—নতুবা চীন রাজ্যও এতদিন আমাদের মত অন্নকষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়িত। পৃথিবীর বাসযোগ্য ভূভাগের তের ভাগের এক ভাগ মাত্র, চীন রাজ্যের বিস্তার। এই তের ভাগের এক ভাগ ভূমিতে তিন ভাগের এক ভাগ লোকের বাস। প্রতি আবাদি বিঘায় চারি পোয়া ফসল হইলেও চীনের লোকদিগকে খাইতে কুলায় না। যদিও চীনামানদিগের ইউরোপীয় মিশ্রজাতিদিগের ন্যায় ঘোর দৌড়ি রকমের সাহস নাই, কিন্তু চীনেরা বড় কৌশলী;—বড় ফিকিরবাজ। চীনদেশে এক টুকরা গব-আবাদি জমি নাই, এমন বন নাই, যে হিংস্র জন্তু বাস করিতে পারে। পেটের দায়ে চীনেরা সমস্ত তাড়াইয়াছে। পাহাড়ের উপর মাটি তুলিয়া নীচে হইতে কলসী করিয়া জল লইয়া গিয়া আবাদ করে। জল কর আবাদ করিতেও ছাড়ে নাই। চীনদেশের সমস্ত বিলে, বাঁধে—আবাদ হয়, আবার জলের ভিতর মৎস্যাদি যেমন থাকে

তাতো আছেই। তাহা ছাড়া জল-মধ্যে একপ্রকার মোটা ধান্য হয়, গরীব দুঃখীলোক তাহা খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। এইরূপে অনেক দেশেই অন্ন কষ্টের তাড়না হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে লোকে একটা না একটা উপায় করিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু আমরা কি করিতেছি ?'

তাই লেখকের বক্তব্য, ভারতের শিক্ষিত মানুষকেও জনসংখ্যা ও খাদ্য সমস্যার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

৩) উল্কাপাত;—লোকপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ের রচনাগুলি বঙ্কিম 'বিজ্ঞান রহস্য' বইতে সংগ্রহ করেছেন। 'উল্কাপাত' অক্ষয়চন্দ্রের ঐ জাতীয় রচনা। ইংরাজী বিজ্ঞানের বই থেকে বাঙালী পাঠকের জন্য সার-সঙ্কলন মাত্র।

৪) প্রাচীন মিউনিসিপ্যাল প্রথা,—এখানে সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক অক্ষয়-চন্দ্রেরই পরিচয় পাই। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাচীন নগর ব্যবস্থার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উপসংহারে লেখকের বক্তব্য ; 'এখনকার নগর সমাজের অবস্থার সহিত বর্ণনার তুলনা করিয়া দেখিবেন, যে উভয়ে কিরূপ বিভেদ আছে। তখনকার মতন এখন যে করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, তবে তখন যেরূপ কর্ম্মভেদে কর্মচারী ভেদ হইত, এখন সেইরূপ হইলে কাজ অধিক হয়, অথচ ভাল হয় বলিয়া বোধ হইতেছে।'

'সনাতনী' ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। বইটি বিশুদ্ধ সাহিত্য বিষয়ক নয়। সমগ্র উনিশ শতকীয় নবজাগরণে প্রাচীন ভারত বনাম আধুনিক য়ুরোপের দ্বন্দ্বে কখনও য়ুরোপীয় মনস্কতা, কখনও হিন্দু মানবধর্মের সংস্কার প্রবল হয়েছে। বস্তুত এই পূর্ব-পশ্চিমের দোটানায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই জর্জরিত হয়েছেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মনের চাহিদা অনুযায়ী অতীত ভারতকে উপস্থাপনার দায়িত্ব সেকালে পরিণত বুদ্ধির ইংরেজী-শিক্ষিত মনীষীরাই গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব', 'অনুশীলনতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'কৃষ্ণ চরিত্র', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১২৮৮), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১২৯৯) 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫), 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬) দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনীকাব্য' (১৮৭১ (১ম), ১৮৭৬ (২য়)), চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত ভ্রমণকাব্য' (১৮৬৫) প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী'। তাই সমকালীন পত্র-পত্রিকায় 'সনাতনী' বিশেষ প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছিল।

'পূর্ব পীঠিকা' ও 'উপসংহার' বাদে বইটি ৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত। সনাতন ধর্ম—হিন্দু ও ইহুদী, ধর্ম ও খণ্ডধর্ম উভয়ের প্রয়োজন, ভারতবর্ষ কর্মভূমি—

অন্যান্য দেশ ভোগভূমি, জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদ, নারীধর্ম (মনু হইতে), হিন্দু বিবাহের ব্যবস্থা—এই ছয়টি অধ্যায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে মাত্র তিনটি অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ করা হ'ল। তাতেই দেখা যাবে স্বদেশ সাধনা এবং সাহিত্য সাধনা অক্ষয়চন্দ্রের কাছে এক ও অভিন্ন ছিল। দেশবাসীর দেহের ও মনের স্বাস্থ্য, তাঁদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, আমিষ ভোজনে মিতাহার এবং আচারে সংযম—সবই তাঁর মনজগতে সর্বাত্মক স্বদেশ চেতনার অঙ্গীভূত।

সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করাই অক্ষয়চন্দ্রের ব্রত। কিন্তু সনাতন-পন্থীর গোঁড়ামি অনুযায়ী নয়। তিনি একালের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কাছেই, পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তি ক্রম অনুসরণ করেই—সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়েছেন।

'যেগুলি সার কথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্তনীয়া, সেই গুলিকেই **সনাতনী** বলিয়াছি। * * * জাতি—জন্ম হইতে যে জিনিসটা আমরা পাই; সেটা একরূপ অপরিবর্তনীয়। * * * নারীর সতীত্ব-শক্তি বা পাতিব্রত্য-শক্তি সনাতনী।' ঐটি অব্যাহত রাখিয়া নারীজাতীর উন্নতি করিতে হইবে।' (পূর্ব পীঠিকা)

বইটির 'উৎসর্গ' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রকে স্মরণ করায়। ভূদেব তাঁর পুত্র মুকুন্দদেব ও গোবিন্দদেবকে উৎসর্গপত্রে আশীর্বাদ জানিয়ে পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়েছেন। অক্ষয়চন্দ্রও একই পন্থায় 'পরম-কল্যাণীয়' অজর ও অচ্যুতকে সম্বোধন ক'রে পিতা গঙ্গাচরণের উক্তি স্মরণ করেছেন; 'আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যাহাতে ঐরূপ অনুষ্ঠানে রত হন, পোষ্যবর্গের মধ্যে অনুগত ব্যক্তিরা যাহাতে ঐরূপ করেন এবং যদি আমাদের প্রকৃত শিষ্য-সেবক কেহ থাকেন, তবে তাঁহারাও যাহাতে অহিংসাদি ধর্ম পালন করেন, সেই বিষয়েও কায়মনোবাক্যে, দৃষ্টান্ত উপদেশাদি-দ্বারা চেষ্টা করিব।' (অ, সা. স শেষার্ধ পৃঃ-৩৫৬)

'সনাতন ধর্ম—হিন্দু ও ইহুদী' অধ্যায়টিতে পুরণো বটগাছের সঙ্গে হিন্দু-সমাজের তুলনা করা হয়েছে। 'যে জট গাড়িতে জানে, তাহার মূল কখন যায় না—সর্বদাই নূতন মূল হইতেছে।' হিন্দু ও ইহুদীরা বহু নির্যাতনেও এখনও সজীব। কারণ 'ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।'

'ধর্ম ও খণ্ডধর্ম'—উভয়ের প্রয়োজন।' 'খণ্ডধর্ম' বলতে হিন্দুয়ানী, খৃস্টানী, মুসলমানী—এরূপ ভেদকে বুঝিয়েছেন। 'যেরূপ উপকারসাধনধর্ম না থাকিলে মনুষ্যত্ব থাকে না, সেইরূপ বিভেদমূলক খণ্ডধর্ম না থাকিলে জাতিত্ব থাকে না;

এবং জাতিত্বই সমাজের মূল।'

অক্ষয়চন্দ্র আডাম স্মিথের 'ওয়েলথ্ অফ নেশসন্স্' ('অর্থ ব্যবহার') এবং 'মরাল সেন্টিমেন্টস্' ('ধর্মভাব') বই দু'টি অবলম্বনে দেখিয়েছেন, মানুষ নিছক পশুভাব বা দেবভাব আশ্রয় করে না। 'দেবত্বে এবং পশুত্বে, মনুষ্যত্ব। *** ধর্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ; স্বার্থের ক্রিয়া আকুঞ্চন। যে মনুষ্যে স্বার্থ অত্যন্ত প্রবল, সে ক্রমে কুঞ্চিত, অতি কুঞ্চিত, অত্যতি কুঞ্চিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রমনা হইয়া পড়ে। *** পক্ষান্তরে আবার ধর্মের ক্রিয়া সম্প্রসারণ। যে হৃদয়ে ধর্ম অত্যন্ত প্রবল সে হৃদয় আর সমাজবন্ধন মানে না, জাতিভেদ মানে না।' (ঐ পৃঃ ৩৫৯)

খণ্ডধর্মের তাৎপর্য স্বধর্ম রক্ষা। তাতেই সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, স্বার্থ ও পরার্থ রক্ষা।

অক্ষয়চন্দ্র মনু-সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যেমন পাপ-পুণ্য, ধর্মা-ধর্ম বুঝিয়েছেন, তেমনি মনিয়ার উইলিয়মস্, অগস্ত কোঁত, বাইবেল, স্টার্ক ওয়েদার, রবার্টসন, এ. কে. কোনেল, রুশো, প্রমুখের চিন্তাধারার সঙ্গেও তাঁর পরিচয়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন। কেন তিনি এরূপ প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক য়ুরোপের চিন্তাধারা একই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন তার কারণটি উপসংহারে স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে; —"বড় আশায় এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি। প্রথমেই বলিয়াছি, 'এখনকার দিনে স্বধর্ম যেন কিছু ম্রিয়মাণ বোধ হইতেছে; এ ভাব থাকিবে না, অচিরে স্বধর্ম আবার জীবন্ত ভাবেই পরিদৃশ্যমান হইবে।' 'ধর্ম—সনাতন সমাজের একমাত্র আধার ও অবলম্বন' অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছি, 'নবযুগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন যে, ধর্মে উপেক্ষা করিয়া আমরা কোন তত্ত্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না।' *** 'জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদ' অধ্যায়ের শেষে, ইউরোপীয় লেখকের দোহাই দিয়া বলিয়াছি, 'জাতিভেদগত সংস্কারই ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছে।'[৬]

উনিশ শতকের অনেক লেখক ও মনীষী যৌবনে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা, বিশেষত কোঁতের যুববাদ ও মিল-বেন্থামের হিতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অথচ পরিণত বয়সে সনাতন ধর্মের আশ্রয়েই ভারতীয় সমাজের মুক্তি খুঁজেছেন। সেখানে রক্ষণশীল চন্দ্রনাথ বসু, ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু, সনাতনী রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং পারিবারিক প্রবন্ধ—সামাজিক প্রবন্ধ—আচার প্রবন্ধ রচয়িতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে চিন্তা-চেতনার গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক প্রবন্ধের 'নেতৃত্ব নির্ধারণ' অধ্যায়ে ভারতবর্ষের নিজস্ব দেশ নায়কের

ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্রের 'সনাতনী'তেও আদর্শ ভারতীয় সত্তার পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন আছে। তখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যত ভারতের দিকে লক্ষ্য রেখে সনাতন ভারতে মানস পর্যটন করেছেন। অক্ষয়চন্দ্র যেন সেই সনাতন ধর্ম-জিজ্ঞাসার পরিণামী পথ খুঁজে পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সমন্বয় ধর্মে।

অক্ষয়চন্দ্রের জীবনে মানবরূপী দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তিনি এই দেবদুর্লভ মানবের সংস্পর্শে এসেছিলেন এক অলৌকিক ঘটনাচক্রের মাধ্যমে। সাক্ষাৎ-পাওয়া এবং কথা বলার সুযোগ ঘটায় অক্ষয়চন্দ্র নিজ জীবনকে ধন্য মনে করেছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকা যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' প্রতি সংখ্যায় বের করে থাকেন সেজন্য তিনি তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি, 'উদ্বোধনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরিত প্রতি সংখ্যায় থাকে। থাকাই চাই। আরও বেশি বেশি থাকিলে ভাল হয়। ও-সুধামাখা কথা যত অধিক থাকে, ততই ভাল। অমন জীবনী ত আর দেখিলাম না। আমরা প্রবৃত্তি-বশে এই পঞ্চাশ বৎসরে বহুতর ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গৃহি-সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি ; কিন্তু পরমংসদেবের মত মানব দেখি নাই। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়াতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (বা চিরঞ্জীব শর্মা) ব্রাহ্ম মহাশয়ের কৃপায়, একদিন আট ঘণ্টাকাল, পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ পাই, অর্ধঘণ্টা আলাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেই অধম জীবন সার্থক মনে করিতেছি। এতটা সাত্ত্বিক ভাব আর কোন মানবে দেখিয়াছি, মনে হয় না। তাঁহার কথামৃত চরিত নিয়ত নিস্যন্দিত হউক, এই উত্তপ্ত বঙ্গভূমিতে শান্তি দান করুন—ইহাই মনের বাসনা।'[৭]

'সনাতনী' সেকালে পাঠক সমাজে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যেমন 'প্রবাসী'তে অত্যন্ত কঠোর বিরূপ সমালোচনা বেরিয়েছিল, তেমনি 'আর্যাবর্তে' ও 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' অনুকূল মতামতও দেখা যায়। 'প্রবাসী'র ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। বড় বড় অক্ষরে ছাপা, সুতরাং সুপাঠ্য'—বলেও বইটির কেবলই দোষ দেখিয়েছেন।

১) 'ঋগ্বেদ হইতে রামমোহন এবং মুশা হইতে মেইমনাইডিস্ পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম ও সমাজে যে কত মূল পরিবর্তন হইয়াছে, ঐতিহাসিক দর্শনের অভাবে তিনি তাহা ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই।'

২) 'সরকার মহাশয় বলিয়াছেন বিবাহ আট প্রকারের হইলেও তাহার মূল কথাটা অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াছে। আমরা আশ্চর্য হইয়াছি তিনি

কি করিয়া ভাবিতে পারিলেন যে মানবের জ্ঞানধর্মে বিভিন্ন স্তরে তাহার বিবাহ সম্বন্ধীয় ধারণা মূল একই।'

তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের এক স্ত্রীর 'বহু স্বামীগ্রহণ প্রথা', মহীশূর এবং নায়ারদের মধ্যে এই প্রথার উল্লেখ করে সমালোচক শ্রীযুক্ত চৌধুরী বলেছেন—'সরকার মহাশয় আমাদিগকে আকার মানিয়া চলিতে বলিয়াছেন। উপরি উক্ত এই সকল আকার তবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে? এই সকল স্থলে উন্নতি করিতে হইলে বাস্তবিকই কি বিবাহ সম্বন্ধীয় মূল মত পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন মত গ্রহণ করিতে হইবে না? সেই জন্য কি আমাদিগকে জ্ঞান ও বিবেকের শরণাপন্ন হইতে হইবে না?'

৩) সরকার মহাশয় ত শাস্ত্র ও শিষ্টাচারের মধ্যে অনেক বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রে যা কিছু আছে তাই কি তুমি সমর্থন করিতে প্রস্তুত? * * * মানবের শেষ দাঁড়াইবার স্থান ঐ বিবেক। * * * কিন্তু সরকার মহাশয় আমরা যে নৌকাখানিতে বসিয়া আছি সেই নৌকা-খানিকে ডুবাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে নদী পার করিবেন, এরূপ মনস্থ করিয়াছেন।'

৪) 'যিনি মনে করেন, যদি একজন নরপশু একজন রমণীর উপর তাহার নিদ্রিতাবস্থায় পাশবিক অত্যাচার করে, তবে ঐ রমণী ঐ পশুকে যাবজ্জীবন স্বামীদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য, তাহার নিকট রমণী সম্বন্ধে সুবিচার আশা করা বিড়ম্বনা নহে কি?'

৫) 'সরকার মহাশয় জাতিভেদের প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সুখের বিষয় তিনি অন্নগত জাতিভেদের উপর জোর দেননি। কিন্তু বিবাহগত জাতি-ভেদকে তিনি আকড়াইয়া ধরিয়াছেন। * * * একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে কেবল হিন্দুর ও ইহুদীর মধ্যে বীজশুদ্ধি প্রচলিত এবং সে জন্যই তাহারা জীবিত রহিয়াছে (মরিয়া রহিয়াছে বলিলে বোধ হয় ভাল হইত), আর সব জাতি জাহান্নামে গিয়াছে। কথাটা নানাদিক হইতে বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিরুদ্ধ।'

৬) 'গীতায় আছে চাতুর্বর্ন ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ, কিন্তু সরকার মহাশয় ভগবদ্ উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন 'গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব কথা। তিনি বলিয়াছেন মিল প্রমুখ পণ্ডিতেরা পূর্বে জাতিশক্তি মানিতেন না, শেষে হারবার্ট স্পেনসরের তর্কে মিল তাহা

স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কেন স্বীকার করিবে না? কিন্তু হারবার্ট স্পেনসরকেও পরে পাততাড়ি গুটাইতে হইয়াছিল, সে খবর সরকার মহাশয় রাখেন নি।'

৭) 'কথা ছিল অফুরন্ত—সনাতনী কি না। আর একটা কথা বলিয়াই শেষ করিব। ভারতবর্ষ কর্মভূমি, আর সব ভোগভূমি। কিন্তু অন্য দেশেও তো কর্ম আছে, আর আমরাও তো নিতান্ত অভুক্ত থাকিনা। * * * যুক্তিটি পাঠ করিতে করিতে এতাদৃশ একটি খাসা যুক্তি মনে পড়িয়া গেল—জুতা মেরেছিস্—মেরেছিস্, না হয় আরও ঘা কতক মার, দেখিস যেন অপমান করিস নি।'[৮]

'সনাতনী'-র এই সমালোচনা অক্ষয়চন্দ্রের সম-চিন্তার শরিকমহলে স্বভাবতই প্রতিবাদ স্পৃহা জাগিয়েছিল। তারই একটি নিদর্শন তারকচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ থেকে এখানে সঙ্কলিত হল। ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মত তারকচন্দ্রের লেখাতেও ঝাঁঝ কিছু কম নয়।

১) গত ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সনাতনীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পড়িয়া মনে হয়, গ্রন্থখানি প্রবাসী কার্য্যালয়ে বোমার মত গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যিনি যত্নের সহিত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তিনি ইহাতে পিক্রিক এসিডের গন্ধ মাত্রও প্রাপ্ত হইবেন না।'

২) 'বাল্যবিবাহে সমাজের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; জাতিভেদ থাকায় ভারতবর্ষে নেশন গঠনের প্রতিবন্ধকতা হইতেছে। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা বর্জনীয়; বিধবারা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করায় হিন্দু জাতির বংশবৃদ্ধি হইতেছে না, সুতরাং বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত; এবংবিধ যুক্তির দ্বারা অনবরত সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইতেছে। সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন নাই একথা বলিবার সাহস আমাদের নাই; কিন্তু সংস্কার প্রয়াসী দলের এতাদৃশ যুক্তি ঘাতসহিষ্ণু বলিয়া আমাদের মনে হয় না।'

৩) 'সনাতনী' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয় প্রাচীন ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ কর্মভূমি —অন্যান্য দেশ ভোগভূমি—ভারত সন্তানকে এ কথা সর্বদা স্মরণ

রাখিতে হইবে। অন্যান্য দেশের সমাজ ব্যবস্থা ভোগসাধনের সহায়, সে সমস্ত দেশে সংস্কার সাধনের লক্ষ্যই ভোগ। * * * ভারত সন্তানের ভোগ করিতে নিষেধ নাই, কিন্তু তাহাকে এমন ভাবে ভোগ করিতে হইবে যাহাতে ধর্ম সাধনে সুবিধে হয়।'

৪) 'ধর্মসাধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া যাঁহারা স্বীকার করেন, সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহাদের বিশেষ বিরোধের কারণ নাই। * * * ধর্ম আদর্শ হইলেও তাহা জানিবার উপায় কি? * * * অখিল বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার ও আত্মতুষ্টি—এই সমুদয় ধর্মের মূল।' (মনু সংহিতা ২/৬)

৫) 'গুণভেদে জাতিভেদ' সম্পর্কে—'বিশ্বামিত্র মহা তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছিলেন মাত্র, ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। বীজ শুদ্ধির জন্য বিবাহ শুদ্ধি আবশ্যক।'

৬) 'প্রবাসী'র সমালোচনার একটু পরিচয় দিয়া উপসংহার করিব। * * * এই সংসারের গতি যে কেবল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলিয়াছে ইহা অস্বীকার করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেই পারে না। তাঁহার বক্তব্য—অনন্ত পরিবর্তনের মধ্যেও এক নিত্য নির্বিকার সত্তা রহিয়াছে।'[৯]

যতীন্দ্রমোহন সিংহ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের সমর্থনে 'সনাতনী'র একটি আলোচনা প্রকাশ করেন (১৩১৮, ভাদ্র পৃঃ-২৫৩-৬৩)। বাহুল্যবোধে আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত বা সমালোচিত হ'ল না। 'আর্যাবর্তে' 'সনাতনী'র* একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি নামহীন। আমরা অনুমান করি, আর্যাবর্তের সম্পাদক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষই এই গ্রন্থ সমালোচনার লেখক। সমালোচনাটি এখানে তুলে ধরা গেল ;—

অক্ষয়বাবু প্রবীণ সাহিত্যিক। বঙ্গদেশে সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্বে সাহিত্য-সম্মিলনের শুভ কল্পনা কল্পিত হইবার অগ্রে যাঁহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত জ্ঞান সম্পদে বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন—অক্ষয়বাবু তাঁহাদের একজন। তাঁহাদের অনেকেই এখন কর্মময় জীবনের অবসানে চিরশান্তি উপভোগ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদিগের যশঃসৌরভে বঙ্গ সাহিত্য মন্দির সুরভিত।

---

* সনাতনী—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। কলিকাতা ২৮।৪ অখিল মিস্ত্রীর লেন হইতে শ্রীকেদারনাথ বসু বি. এ কর্তৃক প্রকাশিত।

আমাদের সৌভাগ্য অক্ষয়বাবু আজও সাহিত্য-চর্চা করিতেছেন ; ভারতের চিরাচরিত প্রথায় শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করিতেছেন। অক্ষয়বাবু এক হিসাবে বাঙ্গালীকে হতাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে পণ্য লইয়া বাঙ্গালীর ঘাটে ভিড়িয়াছিল—সে পণ্যের মধ্যে যাঁহার রচনা অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, যাঁহার রচনা কমলাকান্ত সাদরে আপনার দপ্তরে বান্ধিয়াছিলেন, যাঁহার 'সাধারণী' ভাবগাম্ভীর্য্যের ও ভাবলালিত্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে বাঙ্গালীকে মোহিত করিয়াছিল, তাঁহার নিকট বাঙ্গালী অনেক আশা করিয়াছিল। সে আশা পূর্ণ করা দূরে থাকুক, অক্ষয়বাবু তাঁহার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহুমূল্য রচনাগুলির সংগ্রহ করেন নাই। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের শেষ-পয়ার ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ব্বজন-সম্মানিত স্বর্গীয় পিতা গঙ্গাচরণ সরকার। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি। আর মনে করিলে সেই রকম কবিতা লিখিতে পারেন অক্ষয় ভায়া নিজে। বিশেষ বঙ্গ ও বাঙ্গালি তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন ও ভালবাসেন, তেমন আর কেহ নহে। সুতরাং মনে করিলে তিনি বঙ্গের কথা অতুলনীয় কবিতায় লিখিয়া যাইতে পারেন।" *** 'সনাতনী' অক্ষয়বাবুর পরিণত বয়সের রচনা। যাঁহারা ইহাতে 'উদ্দীপনা'র উদ্দীপনা বা 'ভাই হাততালির' কশাঘাৎ পাইবেন আশা করিবেন, তাঁহারা হতাশ হইবেন। বিষয়গুণে এরচনা অন্যরূপ। 'সনাতনী' ধর্ম্মের কথা। বিশেষ, ইহা যেন প্রবীণ লেখকের জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জ্জনের ফল—বক্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি—note মাত্র। ইহার রচনার সহিত হার্বার্ট স্পেন্সারের Facts and comments গ্রন্থের রচনার বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয় গ্রন্থই অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, উভয় গ্রন্থই সংক্ষিপ্ত, উভয় গ্রন্থেই যেন বক্তব্য বিষয় অতিরিক্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত।

ধর্ম্মের ধারণাও দেশকাল পাত্রভেদে ভিন্ন। য়ুরোপে ধর্ম্ম বাহিরের, ভারতে অন্তরের। য়ুরোপে ধর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ও স্বতন্ত্র সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারতে সমাজ, সংসার, সবই ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ; ধর্ম্ম নহিলে হিন্দুর এক প্রহর চলে না। অক্ষয়বাবু এইধর্ম্মের কথা বুঝাইয়াছেন। "ধর্ম্মের নানা ভাব, ধর্ম্মের নানা মূর্ত্তি। * * * ধর্ম্ম বিষয়ে নানা দেশে নানা মত আছে; এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে।" —প্রকৃতপক্ষে "ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিব এইরূপ বিশ্বাসে, যে অতি বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে

থাকে, তাহার নাম সমাজ। পরস্পরের সাহায্য যাহাকে বলে, পরস্পরের উপকারও তাহাকেই বলে; সুতরাং পরস্পরের উপকারেচ্ছু সম্প্রদায়ের নাম সমাজ। * * * উপকারই ধর্ম্মের সাধন; তাহাতেই বলি, একমাত্র ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন।"

অক্ষয়বাবু বুঝাইয়াছেন, "মনুষ্যত্বই যদি ধর্ম্ম হইল ও ধর্ম্মের ক্ষরে যদি মনুষ্যত্বের ও মনুষ্যাকারের হানি হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মানব ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। ধর্ম্মের প্রকৃতি সনাতনী। তুমি সবলই থাক, আর দুর্বলই থাক, তুমি স্বাধীন থাক আর পরাধীন থাক, ধর্ম্ম তোমার অবস্থার দিকে চাহিবে না।"

সনাতন ধর্ম্ম উদার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥'

"সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি—ধ্যান ধারণা, আলম্বন বিভাবন—পৃথক হইলেও সকল শ্রেণীর ঐশ্বরিক সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র—জ্ঞান,. বুদ্ধি, বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে—ধর্ম্মের তারতম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ম্মে হিংসা করিতে নাই। যে, যে-পথে পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল বিমল বিমানব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এই সকল সনাতন ধর্ম্মের সার কথা।"

সনাতন ধর্ম্ম যে যেমন ও যে ভাবে পারে, পালন করিবে;—

"নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥"

ধর্ম্মই ধার্মিকের সর্ব্বস্ব। —"ধর্ম্ম ধার্মিককে রক্ষা করেন। হিন্দু ও ইহুদী বহু নির্য্যাতনেও কেবল ধর্ম্ম বলে এখনও জীবিত আছেন। ধরিয়া লইলাম, আপনার গৌরব করাই পরম পুরুষার্থ। সুতরাং হিন্দুর কথা এখানে নাই বলিলাম; কিন্তু একবার ইহুদীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি! ইহুদী কোন্‌কালে বাস্তুদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার উপর, কত উৎপীড়ন উপদ্রব মাথায় বহিয়াছে, এখনও বহিতেছে, তবু মরে নাই; কেবল মরে নাই নহে, জগতের মধ্যে সুন্দর, সুশ্রী, উন্নতদেহ, দীর্ঘজীবি, বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল, ধনশালী কলানিপুণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেন? তাহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচারনিষ্ঠ বলিয়া। চৌরঙ্গীর এজ্রা, গব্বয়দিগকে দেখিবার প্রয়োজন নাই, একবার ক্যানিং

ষ্ট্রীটের মুর্গীহাটার সামান্য পণ্যজীবী ইহুদিগণকে দেখিয়া এস—দেখিবে অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ কেমন তৎপরতার সহিত কার্য্যকুশলতা দেখাইতেছে—ইহাদের দেখিয়া, তাহার পর ইহুদি নির্য্যাতনের ইতিহাস স্মরণ কর, তাহার পর এই জাতি কর্ত্তৃক সদাচার ও স্বধর্ম্ম পালনের কথা পাঠ কর,—নিশ্চয়ই বুঝিবে, ধর্ম্মই সমাজকে ধারণ করিয়া থাকে, ধর্ম্মই ধার্মিককে রক্ষা করে।" ভারতের কথায় পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও একবার এমনই ভাবে বলিয়াছিলেন যে, যে রোমের সৈন্যপদ ভরে ধরাতল কম্পিত হইত, যে গ্রীস শিল্পে ও সাহিত্যে নূতন শ্রীসঞ্চার করাইয়াছিল, যে মিশর একদিন সভ্যতার নূতন আদর্শ আনিয়াছিল—সে রোম, গ্রীস, মিশর আজ মৃত কিন্তু ভারত আজ জীবিত—ভারতের আধ্যাত্মিকতাই তাহার এই জীবনের কারণ।

"সনাতনী" এইরূপ আলোচনায় পূর্ণ।

বলিয়াছি, "সনাতনী" Notes। গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহার এক একটির আলোচনায় এক একখানি পুস্তক রচিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদের (জাতিভেদে ব্যবসায় ভেদ) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিষয় লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা অল্পস্থানে হয় না।

যাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত হিন্দুকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ও বহু পরিমাণে সফল-প্রযত্ন হইয়াছেন অক্ষয়বাবু তাঁহাদিগের নেতৃসম্প্রদায় ভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনেই' প্রথম হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবুর এই পুস্তক—হিন্দু ধর্ম্ম তিনি যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তাঁহার কথা আমাদের অবশ্য পাঠ্য।

এই পুস্তকে অক্ষয়বাবু যে ধীরতার, গাম্ভীর্য্যের ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে সুলভ নহে; পরন্তু একান্ত দুর্ল্লভ।[১০]

প্রসঙ্গত বনমালী বেদান্ততীর্থ-র মন্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে। 'সনাতনী' সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হোল,—"হিন্দু ধর্ম্মের যেগুলি সারকথা, মজ্জার কথা, অপরিবর্ত্তনীয়া, সেইগুলিকেই 'সনাতনী' নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অংশ উহার প্রাণ, আর কোন কোন অংশ উহার বহিরবয়ব মাত্র, তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা নির্ণয় না করিতে পারিলে, হিন্দুধর্ম্মের সকল অংশকেই সনাতন ধর্ম্ম মনে করিয়া হয় আমরা দত্ত বা সরকারের ধর্ম্মব্যাখ্যাকে

অনধিক চর্চ্চা ও পাপ বলিয়া মনে করি, নয় ত হিন্দুধর্ম্মের বহিরবয়বে ঘুণ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া উহাকে একেবারে পরিহার করিবার চেষ্টা পাই। * * * কালপ্রবাহে লোকে ধর্ম্মের 'অপরিবর্ত্তনীয়া', 'সারকথা', 'মজ্জার কথা' ভুলিয়া গিয়াছিল, তাই তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আবার এইরূপেই নবদ্বীপে প্রেমাবতার চৈতন্যের জন্ম। এইরূপ যে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে, তাহা নহে। পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে এইরূপে ধর্ম্মের সংস্থাপন বা সংস্কার হইয়াছে; অবশ্য সরকার মহাশয় একথা মানিবেন না। কেননা তাঁহার মতে, 'অন্যান্য দেশ ভোগভূমি, কেবল ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি।' একথার অর্থ কি? কর্ম্ম শব্দের একটি অর্থ মজুরি করা। ভারতের লোক কি কেবলমাত্র মজুরি করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেন? কর্ম্মভূমি হইবে কেন? চীন, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ফরাসী প্রভৃতি দেশের লোকের কি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই? তাঁহাদের ইতিহাসে কি পরার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যায় না? * * * মানুষ পরকে অবজ্ঞা করিয়া বড় হয় না। ভেদবুদ্ধিও মহত্ত্বের সোপান নহে। প্রেম দ্বারা বড় হয়—আত্মত্যাগ দ্বারা বড় হয়। সনাতনীর মুখবন্ধে এইরূপ সনাতন ধর্ম্মবিরুদ্ধ সর্ব্বভূতানুকম্পাবিরুদ্ধ কথার সন্নিবেশ আমাদিগকে ব্যথিত করিয়াছে। মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবচরিত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুলেখক চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গের অনেক কৃতী সন্তান হিন্দুধর্ম্মের 'সনাতনী' বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্লেষণে ধর্ম্ম সংস্থাপন হয় না।

অক্ষয়চন্দ্রের সনাতনী বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব এবং চন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত। তিনিও হিন্দুধর্ম্মের সনাতন অংশ পৃথক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সাধুবাদার্হ। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে যে, তিনি তাঁহার বিশাল মুটে এত বহুত জিনিস ধরিয়াছেন যে, তাহার হস্ত যে ধর্ম্মাচারকুম্ভের সরু মুখ অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিবে, এইরূপ সম্ভাবনা নাই।'

সনাতনীতে বহু ভাল কথা এবং বহুতর মন্দ কথা আছে। সনাতনীর ভিত্তিস্থ তত্ত্বগুলি প্রায়ই ভ্রান্ত। সনাতনীর ভাষা তত মন্দ নহে। ঐতিহাসিক ভুল, অনুবাদের ভুল গ্রন্থকে দুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের খুব নাম আছে। তাঁহার কাছে এমন গ্রন্থ আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

গ্রন্থকার বলেন যে, 'যবন এবং রোমকেরা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবাসী আজিও দাঁড়াইয়া আছে, কেননা উহাদের ধর্ম্ম ছিল না, আমাদের আছে।' প্রথমতঃ ভারতবাসী দাঁড়াইয়া আছে না বলিয়া 'শুইয়া আছে' বলিলে ভাল হইত। দ্বিতীয়তঃ যবন ও রোমকেরা যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন এ তত্ত্ব ইতিহাস লেখে না। উহাদের বংশ এখনও আছে।

গ্রন্থকার 'ধর্ম্মের মূল, প্রমাণ ও পরিণাম বলিয়া তিনটি বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন।' কিন্তু কার্য্যতঃ একটি বিচার বই তিনটির কোনও নামগন্ধ পাইলাম না। বস্তুতঃ মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ধর্ম্ম মূল ও ধর্ম্ম লক্ষণ এবং ধর্ম্মের প্রাণ একই কথা।

'শিক্ষা বিভ্রাটে স্বভাবের সুখের ভাণ্ডার আমরা দেখিতে পাই না…।' এ শিক্ষা বিভ্রাট অনেকদিনের—গ্রন্থকার অবশ্য সে বিষয়ে নির্ব্বাক্। মহাভারতে আছে 'সুখাদপ্যধিকং দুঃখম্ জীবতে নাত্র সংশয়ঃ।'

গ্রন্থকার বলিয়াছেন 'আমরা বলি সন্তোষ সুখের মূল। বিদেশীয়েরা বলেন, সন্তোষ সকল দুঃখের আকর। অতএব আমরা মস্ত ইত্যাদি।' কিন্তু ইহাও বড় মিথ্যা কথা। সন্তোষের প্রশংসা সকল ধর্ম্মেই আছে। একবার 'যিশুর পর্ব্বত উপদেশ' (Sermon on the mount) দেখুন। আবার সকল অর্থশাস্ত্রে সন্তোষের নিন্দা আছে। মহাভারতে আছে—অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলম্।

আর লিখিয়া গ্রন্থ বাড়াইতে চাই না। বহু বক্তব্য এ গ্রন্থে আছে। এইমাত্র বলিয়া উপসংহার করিব যে, শত দোষ সত্ত্বেও এরূপ গ্রন্থ আমাদিগের শিক্ষিত সমাজের পড়া উচিত। কেননা, একঘেয়ে ইংরাজি পড়িয়া, বিশেষতঃ দর্শনেতিহাসাদিতে বিদেশীয় কৃত হিন্দুর কুৎসা পড়িয়া, আমরা আমাদের সনাতন ধর্ম্মকে কুৎসনীয় মনে করিতে শিখি। কেয়ার্ডের Introduction to religion, Seth-এর Ethics, Hegel-এর Philosophy of History, সব স্থানেই এক কথা—তাঁহারা বড়, আমরা ছোট। আবার এত কষ্ট করিয়া এঁদের গ্রন্থ বুঝিতে হয় যে, একবার বুঝিলে উহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করা সহজ হয় না। কিন্তু উহারা ভ্রান্ত। ভারতের হিন্দুকে দর্শনেতিহাস পড়াইবার জন্য ভারতের উপযোগী গ্রন্থ কে লিখিবে? না লিখিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সনাতনী পড়িয়া শিক্ষিত সমাজের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, সনাতনী সার্থক হইবে।" (প্রতিভা, ফাল্গুন ১৩১৯ পৃঃ-৬৫৪-৬০)

'রূপকও রহস্য' (১৯২৩) অক্ষয়চন্দ্রের পরিণত শক্তির নিদর্শন। 'বঙ্গদর্শন'

'সাধারনী' ও 'নবজীবনে' প্রকাশিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলি থেকে একটি সঙ্কলনরূপে অজরচন্দ্র প্রকাশ করেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এ গ্রন্থের সঙ্কলক বা সম্পাদক বলা যায়।

'শুধুই রহস্য' নামে একটি ছোট লেখায় বইটির নামকরণের তাৎপর্য ধরা পড়েছে।

> 'পরলোকগত ডাক্তার রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য', 'রত্ন-রহস্য' লেখেন; ইহলোকস্থিত শ্রীযুক্ত —লোকস্থিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু 'বিজ্ঞান রহস্য',-লোক-রহস্য' লিখিয়াছেন। ঐহিক-পারত্রিক বড় লোকদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিৎ রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত। ইতিহাসে আমার হাসি আসে; রত্ন—আমি চিনিতে পারি না; বিজ্ঞানে অজ্ঞান, লোক বুঝিবার আলোক আমাতে নাই। কাজেই আমাকে শুধুই রহস্য লিখিতে হইল।"[১২]

'গ্রন্থ রহস্য' রচনাতেও তিনি পরিহাসভরে লিখেছেন—

> 'রহস্য লিখিনু মাত্র, রহস্য বুঝিবে।
> বিদ্রূপে বিরূপ করি কোপ না করিবে॥' (অ. সা. স. শেষার্ধ পৃঃ-৪৪৭)

বিভিন্ন সময় লেখা এই রচনা সঙ্কলনে লেখকের বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রসন্ন কৌতুকবোধের পরিচয় মেলে। অক্ষয়চন্দ্রের রঙ্গপ্রিয়তা, রহস্য করে কথা বলা,—গুরু ঈশ্বর গুপ্তের উত্তরাধিকার। 'সাধারণী'র 'চণকচূর্ণ' বা 'চেণাচুর' বহরমপুর রত্নসভায় রঙ্গরহস্যের আসরকেই স্মরণ করায়। 'চুঁচুড়ার সং', 'সংবাদপত্র', 'অনাদায় প্রভৃতি 'চণকচূর্ণে' লঘুসুরে গভীর কথা আছে। 'বঙ্গদর্শন অভিনয়' রচনাটিও সেকালে পাঠক সমাজে বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল। 'দিগম্বর ভট্টাচার্য'* অক্ষয়চন্দ্রের কল্পিত একজন কবি। তাঁর কবিতার বেশ কিছু নিদর্শন দিয়ে রহস্য করে তিনি তাঁকে 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী' রূপে দাঁড় করিয়েছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের বিচিত্র গদ্য রচনা শৈলীর নিদর্শনরূপে 'রূপক ও রহস্য' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল, যা বিশেষ উল্লেখ্য।

---

* 'দিগম্বর ভট্টাচার্যের সমস্ত গান গ্রন্থকারের নিজের রচনা। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গানে' ভ্রমক্রমে ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গান মুদ্রিত হইয়াছে।' (অ. সা. স শেষার্ধ পৃ. ৪৫৫)

এক.　　শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি

দামিনী। সংস্কৃত পড়িবে বলিয়াছিলে, পড়িতেছ কি ?

যামিনী। না ভাই ! পড়া হইল না। বর্ণ ও বানান শিখিয়াছিলাম।

দামিনী। তবে বই পড়িলে না কেন ?

যামিনী। একখানি প্রথম ভাগ 'ঋজুপাঠ' বই কিনিয়া আনিয়াছিলেন, তা কিন্তু পড়া হইল না।

দামিনী। কেন ?

যামিনী। পড়িলাম—'কস্মিংশ্চিৎ বনে', তারপর দেখি বটুঠাকুরের কথা, আর কেমন ক'রে পড়ি বল ?' (ঐ, পৃঃ ৪৫৩)

দুই. **'ইতিহাস** অর্থ—এই হাসো। 'সিরাজদ্দৌলার আদেশে অন্ধকূপে ১২৮ জন ইংরাজ হত হন', 'লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করায় মুসলমানের বঙ্গ-বিজয় সমাধা হইল', 'গুজ্‌রাট ও গুজরান্‌ওয়ালার যুদ্ধে ইংরাজ বিশেষ জয়ী হইলেন' ,—এই সকল হাসির কথা বলিয়া ইতি-হাস নামে গণ্য'। বিজ্ঞান—যাহাতে বিপরীত জ্ঞান হয়, তাহার নাম **বিজ্ঞান**। (ঐ, পৃঃ-৪৫৪-৫৫)

তিন. 'তুলনায় সমালোচন' থেকে ; —**'বিদ্যাসাগর** মহাশয় টাঁকশাল এবং তাহার গ্রন্থগুলি দুআনি, সিকি, আধুলি ও টাকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোণার সম্পর্ক নাই ; টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসায় করিতেছেন।' (ঐ, পৃঃ-৪৬১) এখানে উল্লেখ্য, 'বঙ্গদর্শনে' "তুলনায় সমালোচন" প্রকাশের পরে 'জ্ঞানাঙ্কুরে' চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বিদ্যা বিড়ম্বনা" (১২৮০ বৈশাখ) নামে একটি প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রতি কটাক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন।

'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধটি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। মনে রাখতে হবে, ১২৮০ সালের আশ্বিন সংখ্যার বঙ্গদর্শনে এটি প্রকাশের সময় হেমচন্দ্রের 'দশমহাবিদ্যা' কাব্য রচিত হয়নি। মহাবিদ্যার দশটি রূপ অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধে অভিনব রূপ কার্য করেছে। আর্য-অনার্য বিরোধের কাল—কালী ও তারামূর্তি, ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত শক্তির কাল—ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ; তখন দেবী বরাভয়দাত্রী। তারপর তন্ত্র প্রভাবে ভারত ভৈরবী, ষষ্ঠ দশায় তন্ত্রের প্লাবন—তখন মূর্তি ছিন্নমস্তা। ইংরেজ আমলের ভারত ধূমাবতী। কিন্তু দেবতার মৃত্যু নেই। সুতরাং

মহাবিদ্যার কল্যাণীরূপ আবার দেখা দেবে।

'দেখ দেখি, সোণার পুরী কি হইয়াছে! ভুবনেশ্বরী এখন পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। কাঙ্গালিনীকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হয় না? *** এখনও আমার জাগ্রৎ স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই, আমার এখনও আশা হইতেছে যে ভারতমাতা আবার **বগলা** মূর্তিতে দেখা দিবেন।'[১২] ক্রমশঃ এই ধারায় **মাতঙ্গী** ও **মহালক্ষ্মীর** আবির্ভাব। এই ভাবনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কালগর্ভে নিহিতা' জন্মভুমির প্রহরণধারিণী শত্রু বিমর্দিনী দুর্গামূর্তির বিশেষ ভাবসাদৃশ্য আছে। অক্ষয়চন্দ্রের মত কমলাকান্তের আশা—'এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব।' (কমলাকান্তের দপ্তর, একাদশ সংখ্যা, আমার দুর্গোৎসব, ১৮৭৪)

'পৌরাণিক অবতারতত্ত্ব' (১২৯১) নামে একটি প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র নৃতাত্ত্বিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 'দশমহাবিদ্যা'র মত এখানেও পৌরাণিক প্রেক্ষিতে তিনি ডারুইনের বিবর্তনবাদে অভিনব তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। ফলে ঈশ্বরগুপ্তের 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' কিংবা কোঁত-মিলের যুক্তিবাদ অক্ষয়চন্দ্রের মনকে জড়তায় আচ্ছন্ন করতে পারেনি। প্রবন্ধটিতে নিজস্ব ধর্ম-চিন্তার পরিচয় বিদ্যমান।

আলোচনার শুরুতে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, 'ঈশ্বর-অবতারের নানারূপ সিদ্ধান্ত' থাকলেও 'যে স্থলে আমরা ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখি,—আমরা সেই স্থলেই অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি।' এই বিচারে কপিল, কোঁত, ব্যাস, ধন্বন্তরি, নিউটন, বাল্মীকি সকলে তাঁর মতে অবতার বিশেষ। কেননা এঁরা প্রত্যেকই নতুন নতুন সৃষ্টি-প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছেন। 'মানবে ঐশ্বরিক শক্তির বিশেষ বিকাশকে প্রতিভা বলা যায়।' আবার 'অন্যান্য প্রতিভা-সম্পন্ন জনগণকেও কখন কখন অবতার বলা গিয়া থাকে।' এই বিচারে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মুশা, ঈশা, নানক অবতার।

ডারুইন মানুষের উদ্ভবের যে ক্রমবিকাশের ধারার কথা বলেছেন অক্ষয়চন্দ্র তার সঙ্গে অবতারবাদকে মিলিয়ে দেখেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্য: "পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে জীবসৃষ্টির যেরূপ ক্রমবিকাশের আভাস দেখা যায়, তাহা যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্ত্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয় না, বরং মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন—এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞান-সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রথম পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাশে উৎকৃষ্ট জীব

মানবের অবতারণা বুঝিলাম। তাহার পর, মানবের সামাজিক বিকাশ; এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি; অবতারও তিনটি। —পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম।"[১৫] এই তিনি অবতার ব্রাহ্মণের প্রভুত্বে, আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থাপনে ও কৃষিযুগের উৎপত্তি ও উন্নতিতে প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন। 'ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের দুই অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি।'

'কবি হেমচন্দ্র' বইটিতে লেখকের কাব্য-বিচারশক্তির চূড়ান্ত পরিচয় আছে। তিনি অতি-উৎসাহে হেমচন্দ্রকে মধুসূদনের উর্ধে স্থান দেন নি। প্রথমে যৌবনে অমিত্রাক্ষর বিষয়ে অনাগ্রহী হলেও পরিণত বয়সে অমিত্রাক্ষরের প্রাণরহস্য উপলব্ধি করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের একটি উদ্ধৃতি স্মরণ করা যেতে পারে; —"বলা বাহুল্য এখন আমি সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ কবি হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল, সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট. তাহা বুঝিতে পারি।" (অ সা. স শেষার্ধ পৃঃ ৫৮১)

প্রথমে মধুসূদন, হেমচন্দ্রে তার অনুকরণ। চরিত্রে ও বর্ণনায় হেমচন্দ্র মধুসূদনের কাছে ঋণী। 'রসের তুক্ক—হুতোম প্যাচার গান' পর্যায়ে ব্যঙ্গ রসিক হেমচন্দ্র ও 'মেকির উপর কশাঘাত' অধ্যায়ে স্বদেশ প্রেমিকের স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। কোথাও লেখক প্রীতিবশে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে বসেন নি। দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

এক. 'গুপ্ত কবির সমালোচনায় বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন,—'ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু এবং মেকি ধর্মের শত্রু।' আমরা বলি, ঈশ্বর গুপ্ত কেবল কেন—মনীষী মাত্রেই মেকির শত্রু। হেমবাবুও মেকির শত্রু। মেকির উপর কশাঘাত করিতে হেমবাবু ছাড়েন নাই।' (অ সা. স. শেষার্ধ পৃঃ ৫৭৪-৭৫)

দুই. 'রসের তুক্ক একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ভ্রমরের সেই শ্যাম-সুন্দরের মত বর্ণ, ঝিল্‌মিল্ করিতেছে সেই নীলপাখা, সেই গুন্‌গুন্ রবে মধুর গুঞ্জন, আর প্রয়োজমত সেই কুটুস্ করিয়া হুল ফুটানো—তাহার কিছুই নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায় রুচি-জীবি, শুচি-বায়ুগ্রস্ত। যদু ঠাকুরদা বলিতেন,—অন্নে শ্লেষ্মা করে. রুটিতে বায়ু করে, লুচি গুরুপাক; শিক্ষিত বলেন,—গুপ্ত অশ্লীল. দাশরথি অসভ্য, বটতলা vulgar, সুতরাং রসের তুক্ক একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; হেমচন্দ্রে কিছু ছিল. এখন আর কিছুই নাই।' (ঐ পৃঃ-৫৭৬-৭৭)

'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারে দু'খণ্ডে সঙ্কলিত কতকগুলি রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক রহস্যে'র সঙ্গে তুলনীয়। রচনাগুলি হ'ল ; দিগম্বর ভট্টাচার্য, হলধর ঘটক, জন্তুধর্মী মানব, বদ্‌রসিক, সুন্দরবনে ব্যাঘ্রাধিকার, সিংহের উপাধিবিতরণ, ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ, কুঞ্জ সরকার। এখানে মাত্র দু'টি চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা গেল। এর থেকেই অক্ষয়চন্দ্রের লঘু রহস্য চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

বদ্‌রসিকের দল দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় লেখক বলেছেন, 'সেকালের মত সদানন্দ লোক প্রায়ই দেখা যায় না। * * * এখন দেখিতে পাই—কেবল কতকগুলা হিংসে-ভরা, রগ্‌টেপা, ক্রূর-কটাক্ষ, বিষদিগ্ধ, বেতালা বেসুরো বদ্‌রসিক।' ঘটনার অসঙ্গতি, উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব মানুষকে বদ্‌রসিক করে। এরা সাধারণত বুদ্ধির অহঙ্কারে মদমত্ত। রদ্‌রসিকতার উদাহরণ স্বরূপ হেমচন্দ্রের কবিতা প্রসঙ্গে 'বঙ্গের বিধবা বিনা মধু কোথা কুসুমে', বিবাহবাসরে 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, গল্প জ্ঞানে 'টাকায় চৌষট্টি পয়সা', সুতরাং টাকার জিনিস সুগন্ধ, আর পয়সার জিনিস দুর্গন্ধ, কিংবা 'যখন তুমি দারুণ যম-যন্ত্রণায় কাতর, পরমাত্মীয়ের বিয়োগে ব্যাকুল—বেতালা তালকাণা সেই সময়ে আসিয়া তোমার কাছে তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনের আড়ম্বর বৃদ্ধি করিবার অভিলাষে ঋণ যাচ্ঞা করিবে' উল্লেখ করা যেতে পারে। বদ্‌রসিক সমালোচকও দুর্লভ নয়। "সমালোচক ভাবেই বদ্‌রসিকের পূর্ণাবতার। এই বেশে তাঁহাদের বদ্‌সুর, বেতাল, ভগ্নকণ্ঠ, বিকৃত মুখভঙ্গি,—সকলই পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। 'ঘৃণা ! ঘৃণা !' বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ আপনাদের রসজ্ঞতার পরিচয় দেন। লেখক যাহা বলেন নাই, ভাবেন নাই, সমালোচক তাহাতে তাহা আরোপ করেন, তাহার পর পেশাদারি রসিকতার সুরে লেখেন—'এ হেন লেখক যখন এ হেন কথা বলিতে পারেন।' * * * ইঁহারা সকল কথাতেই একটু ঘৃণা-মিশ্রিত দন্তের হাসি হাসিয়া বলেন, হ'ল কি ?' —আমরা বলি হ'বে আর কি ? —অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ !"[১৪]

হলধর ঘটক একটি টাইপ চরিত্র। 'তিনি সর্বদাই হাস্য-বদন ; কিন্তু সেই হাস্যের সঙ্গে শ্লেষ যেন সর্বদাই মাখানো রহিয়াছে। কথায় তিনি তুখড়।' সংসারে শত দুঃখেও তিনি হাসতে পারেন, ভিন্ন মতকে 'রহস্য' করে উড়িয়েও দিতে জানেন। অন্ধ প্রাচ্য গোঁড়ামি থেকে তিনি যেমন মুক্ত ছিলেন তেমনি পাশ্চাত্যের উগ্র অনুকরণে তিনি ব্যথিত হতেন।

উনিশ শতকের অধিকাংশ লেখকের কাছেই সাহিত্য-সাধনা ছিল জাতি

ও দেশ গঠনের সাধনা। শিল্পের জন্যই শিল্প—এই ভাবনা আমাদের সাহিত্যে অনেক পরবর্তীকালের। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন'—'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' প্রায় অর্ধ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের পটভূমিতে অক্ষয়-চন্দ্রের সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতার বিস্তার। কবিতা ও গানে, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনায় তাঁর সচেতন সমাজবোধ প্রকাশিত।

পাদটীকা

১) অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (শেষার্ধ) পৃঃ ৭৭৮
২) বঙ্গদর্শন ১২৮১ পৃ ২৮৬
৩) ঐ পৃঃ-২৮৭
৪) বান্ধব ১২৮৭ ৫ম খণ্ড পৃ ১৪০-৪১
৫) বঙ্গদর্শন (৩য় খণ্ড) ১২৮১ পৃঃ ৫৫৪। এ প্রসঙ্গে 'বান্ধব' পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে ; 'সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যে প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেও বিদ্যাপতি, রায় বসন্ত ও চম্পতি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির পদ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। (১২৮২ শ্রাবণ পৃ ৯৯)
৬) অ. সা. স (শেষার্ধ) পৃ ৪১২
৭) ঐ (প্রথমার্ধ) পৃ ৩৩৪
৮) প্রবাসী—১৩১৮ আশ্বিন পৃ ৬৮৩-৮৭
৯) আর্য্যাবর্ত্ত—১৩১৮ চৈত্র পৃ ৮৮০-৮৮
১০) ঐ বৈশাখ পৃ ৭০-৭৩
১১) অ. সা. স (শেষার্ধ) পৃ ৪৪৯
১২) ঐ (প্রথমার্ধ) পৃ ১০১
১৩) ঐ পৃ ১৩২
১৪) ঐ পৃ ২০১

গ্রন্থ-সমালোচনা

সাধারণী-নববিভাকরে গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক অক্ষয়চন্দ্রের একটি বিশিষ্ট পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি কখনও লেখকের মর্যাদা বা বৃত্তির মুখ চেয়ে তাঁর লেখনীকে চাটুবাদে নিযোজিত করেন নি। বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ-সমালোচনার কালে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবণতাগুলির দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ সমালোচনা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হচ্ছে।

যেহেতু বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষে সাধারণীর প্রকাশ এবং তখন দুটি পত্রেরই গ্রন্থ-সমালোচনার দায়িত্ব অক্ষয়চন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তাই বঙ্গদর্শন ও সাধারণীর গ্রন্থ-সমালোচনা পাশাপাশি উল্লিখিত হতে পারে। অবশ্য লালবিহারী দে'-র ইংরেজী-পত্র 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' এবং ভূদেব সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে'-ও এইসব গ্রন্থের উল্লেখ্য সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত 'ভার্জিনিয়া উল্‌ফে'র (১৮৮২-১৯৪১) একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, যে-কাল অতীত, তাকে পরিক্রমা করা সহজ, কিন্তু সমকালীন সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ সমালোচনা করা দুরুহ।* অক্ষয়চন্দ্রের সে-প্রয়াস কতটা সার্থক হয়েছে, তাও লক্ষণীয়।

অক্ষয়চন্দ্রের গ্রন্থ-সমালোচনা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে।

১) প্রথমেই আলোচ্য সাহিত্য। কাব্য-উপন্যাস-গল্প-নাটক সৃজনী সাহিত্যের এই তিনটি শাখার রচনা সাধারণীতে সমালোচিত হয়েছে।

২) সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে গ্রন্থ-সমালোচনা।

৩) বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ-সমালোচনা উপলক্ষে সাহিত্য-সত্যের মূল কথা বিশ্লেষণ। নাটক ও কাব্যের সাধারণ লক্ষণ ও প্রবণতা বিচার।

কাব্য :—

'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১২৮২, অগ্রহায়ণ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উল্লেখযোগ্য রূপক গ্রন্থ। গ্রন্থখানির প্রথম সর্গ কেবলমাত্র বঙ্গদর্শন (১২৮০, শ্রাবণ) পত্রিকায় বার হ'য়েছিল। পরের সর্গগুলি কেন বার হয়নি এ বিষয়ে সকলের মনে নানা রূপ প্রশ্ন জেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ কাব্যখানি প্রসঙ্গে বলেছেন ; 'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র। তাহার

* Virginia Woolf, How it Strikes a Contemporary, The Common Reader, First Series P-203.

চারিদিকের বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি সেটি ত সহজ নহে।' অক্ষয়চন্দ্র কাব্যখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও যে সজাগ ছিলেন তা সমালোচনা-পাঠে সহজেই বোঝা যায়। আলোচনার প্রথমে সমালোচক বলেছেন যে এরূপ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় আর নেই। গ্রন্থখানি রচনার ফলে যে বাংলা ভাষার উন্নতি সাধিত হয়েছে সে কথা বলা বাহুল্য। কেননা 'ইহার ভাষা নূতন, রচনা প্রণালী নূতন, ছন্দ নূতন।' তথাপি কাব্যখানি পাঠে যে চরম আনন্দ লাভ করা যায় না। তা অক্ষয়চন্দ্র অকপটে বলেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্য স্মর্তব্য, 'কবি বৃন্ত-গুলি ছিঁড়িয়া ফেলা দূরে থাকুক, কুসুম গুলিকে কণ্টকহীন করিবারও চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং তদীয় কবিতা কুসুমের সৌরভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভগ্নছন্দঃ ও কটু-ভাষার জ্বালায় অস্থির হইতে হইয়াছে।' তাছাড়া স্বপ্নপ্রয়াণে 'সর্ব্বত্রই ভাষা, রচনা ও ছন্দঃ সুন্দর নহে।' কিন্তু কবির আত্মপরিচয়দানে ও গ্রন্থের উপসংহার অংশের বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রের কবি-কৃতিত্ব যে অপূর্ব রচনা-ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ, তা বলতে অক্ষয়চন্দ্র বিস্মৃত হননি। যেমন-'ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর; / গুণজ্যোতিঃ হরে যথা মনের তিমির! / নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি, / সেই দেব-নিকেতন আলো করে কবি। এটি অতি সুন্দর বলিতে হইবে।' আর 'এই স্বপ্ন-নায়ক কবির সহিত কল্পনার পরিণয়, এই স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থে সংঘটিত হইয়াছে। কবি যখন আপনার মুখে এই শুভ বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, তখন আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি, এখন হইতে কবি কল্পনাকে কোমলতর ভূষণে নিত্য নিত্য ভূষিত করিবেন, এবং কবি-কল্পনার রঙ্গ-লীলার অভিনয় ছবি আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইব। স্বপ্নপ্রয়াণ গ্রন্থের উপসংহার ভাগ অতি সুন্দর ও সুললিত, অথচ এমনই গভীর, গম্ভীর ও ভক্তিভাবপূর্ণ যে, পাঠকালে শরীর মন এককালে ভূমানন্দে ও ধীর গাম্ভীর্য্যে আপ্লুত হইয়া উঠে।'

'কর্ণার্জ্জুন কাব্য' (১২৮২, ফাল্গুন) প্রথম খণ্ড বলদেব পালিতের অন্যতম গ্রন্থ। সম্পূর্ণ হ'বার পূর্বেই লেখক সমালোচনার জন্য সাধারণী সম্পাদকের কাছে গ্রন্থখানি পাঠান এবং বলেন 'যদি পাঠকবর্গের মনোনীত হয়, তবে দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রকাশ করিবেন।' এখানে বলা প্রয়োজন পূর্ববর্তী 'ভর্তৃহরি কাব্য'

রচনায় তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন না করায় তাঁর মনে এরূপ চিন্তা দেখা দিয়েছিল। 'কর্ণার্জ্জুন কাব্য' প্রসঙ্গে লেখক বলদেবের উক্তি ; 'সংস্কৃত কাব্যে যে সমস্ত সু-ললিত ছন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বাঙ্গালা-গদ্যে সেই সমস্ত ছন্দ প্রয়োগ করিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিছু না কিছু সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইতে পারে ; কিন্তু এতদ্দেশে স্বর বর্ণের লঘুত্ব ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, ঐ সকল ছন্দ সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার 'ভর্তৃহরি কাব্য' ইহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণ বশতঃ আমি ঐ প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না। কেবল পঞ্চম সর্গে সূর্যের স্তোত্র এবং প্রতি সর্গের শেষে ২।৩ টি কবিতামাত্র সংস্কৃত ছন্দে লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম।'

অক্ষয়চন্দ্র গ্রন্থখানি পাঠে লেখকের রচনা ক্ষমতায় যে কবিত্বশক্তি বিদ্যমান সে কথা ব্যক্ত করেছেন। এবং দ্বিতীয়ার্ধ প্রকাশ করবার জন্য অভয়মন্ত্র দিয়েছেন। গ্রন্থখানি বীর রসাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম খণ্ডে এর কোন পরিচয় না পাওয়ার কথা বলেছেন। শেষে বলদেব পালিতের উদ্ধৃতিকে সমর্থন করে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন ; 'যদিও বঙ্গভাষায় স্বর বর্ণের লঘু-গুরু ভেদে পাঠ করিবার ব্যবহার নাই, তথাপি উক্ত শ্লোকগুলি সুন্দর আবৃত্তি করা যাইতে পারে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের শ্রমের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি।'

'পলাশীর যুদ্ধ' (১২৮২, মাঘ) নবীনচন্দ্র সেনের উল্লেখযোগ্য গাতিকাব্য। গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসর্গ করা হ'য়েছিল। কাব্যখানি পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। বায়রণের পরোক্ষ প্রভাব কাব্যখানিতে লক্ষ্য করা যায়। রচনারীতি নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও লিরিকের উচ্ছ্বাসে কাব্যখানি পরিপূর্ণ। মূল ঘটনার অংশকে অক্ষযচন্দ্র সবিস্তারে প্রথমে বর্ণিত না করে 'পলাশীর যুদ্ধ' আমাদের জীবন উন্নতি সাধনায় ফলপ্রসূ কিনা সেই প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর উক্তি ; 'আজি ঠিক একশত আঠার বৎসর হইল, তথাপি পলাশীর যুদ্ধে ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে ; ইহার উত্তর দান করা এখনও কঠিন।'

এরপর সর্গ-অনুযায়ী কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। প্রথম সর্গ রাজা রাজবল্লভ-কৃষ্ণচন্দ্র রায়-মীরজাফর ও রাণী ভবাণীর শেঠদিগের বাসভবনে পরামর্শ। দ্বিতীয় সর্গ ক্লাইভের চিন্তা ও দেবী ব্রিটানিয়ার আশ্বাস প্রদান। তৃতীয় সর্গ যুদ্ধের আগের রাত্রিতে পলাসীর মাঠে বিলাসপ্রিয় সিরাজের আতঙ্ক ও যুদ্ধপ্রিয় ক্লাইভের দ্বিধাগ্রস্থ মনে সংশয়। চতুর্থ সর্গ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের

জন্য পরাজয় ও মোহনলালের অনুশোচনা। পঞ্চম সর্গ ইংরেজের বিজয়-উৎসব, সিরাজের হত্যা বর্ণনা ও কাব্যের সমাপ্তি।

বিষয় সংক্ষেপে অক্ষয়চন্দ্র সংযম, যাথার্থ্য এবং ঘটনা সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

অক্ষয়চন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনার সমকালেই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যখানির বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি বলেছেন, "পলাশীর যুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। এবং পলাশীর যুদ্ধ অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত। কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার।"

এরপর কাব্যখানির দোষ-গুণ বর্ণনায় সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য, "এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্থরগতি। ইহাতে কার্য্য অতি অল্প, যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে ২ হইতেছে। অল্প ঘটনার বিস্তীর্ণ বর্ণনায় সর্গ সকল পরিপূরিত হইতেছে। প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ করিলেন, এইমাত্র ; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজ সেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশীতে আসিল এইমাত্র ; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজস্বিনী কবিতার মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, এসকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না। চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ। যুদ্ধ বর্ণনা অতি সুন্দর। তৎপরে মোহনলালের যে বীর বাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর। পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব ; সিরাজদৌল্লার কারাবাস ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, মেঘনাদবধ বা বৃত্রসংহারের সঙ্গে কাব্যখানির সমালোচনা করতে যাওয়া, 'কবির প্রতি অবিচার করা হয়।' তথাপি নবীনচন্দ্র যে আরও ঘটনা বর্ণনায় ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যে নিপুণতা দেখাতে পারতেন সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এই কাব্য মধ্যে ঘটনা বৈচিত্র, সৃষ্টি বৈচিত্র সঙ্ঘটন করা কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীনবাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। * * * 'পলাশীর যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্র সিদ্ধ। সেইজন্য পলাশীর যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে।"

সবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে 'বাঙ্গালার বাইরণ' হিসেবে উল্লেখ প্রসঙ্গে উভয়ের কাব্য সমালোচনা করে বলেছেন, "বাইরণের 'লিপিপ্রণালীর' সাদৃশ্য নবীনচন্দ্রের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও 'চরিত্রের আশ্লেষণে দুই জনের একজনও কোন

শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুই জনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাতপ্রতিঘাত"—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। * * * ইংরেজিতে বাইরণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্য, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্য।'

'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' (১২৮২, ফাল্গুন ১ম ভাগ) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্বনামে প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ। প্রথম অবস্থায় লেখক ভুবনমোহিনীদেবী এই ছদ্মনামের আড়ালে সব কবিতা রচনা করতেন। সাধারণী সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাব্য রচনায় তিনি যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার উল্লেখ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, 'ভুবনমোহিনী যদি রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার প্রতিভার অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদন ও শোভা বৰ্দ্ধন করেন, তবে সত্য সত্যই তাঁহার প্রতিভা ভুবনমোহন করিবে।'

রবীন্দ্রনাথ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যে এর মধ্যে কবিপ্রতিভা ও গীতিধর্মী কাব্য লক্ষণ বিন্দুমাত্র পরিস্ফুট হয়নি। বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেও এর সমালোচনা বার হয়েছিল (অগ্রহায়ণ ১২৮৫)। 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা। Edited and Published by Nabin Chandra Mukherjee গুপ্তপ্রেস, কলিকাতা। অনেক দিন হইল, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু নিতান্ত অপ্রয়োজন বলিয়া আমরা ইহার সমালোচনা করি নাই, কারণ এ গ্রন্থ বিলক্ষণ পরিচিত ও সমাদৃত।'

'ললিত কাব্য, (১২৮২, ফাল্গুন)-র লেখক সত্যচরণ গুপ্ত। কাব্যখানি সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র বিশেষ আলোচনা করেননি। কাব্যটি মোটের ওপর 'সুমিষ্ট, সরস ও কোমল' হ'লেও লেখকের লেখার মুন্সিয়ানী যে নেই তা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে সৌখিন কবিদলভুক্ত লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

'ললিতাসুন্দরী' (১২৮১ অগ্রহায়ণ, প্রথমসর্গ) ও 'মেনকা' (১২৮১ অগ্রহায়ণ, গীতিকাব্য)-র লেখক হিসেবে অধরলাল সেন প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দু'খানি কাব্যগ্রন্থ সমালোচনার পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, "সংসারে যেরূপ নানাবিধ লোক আছে, সেইরূপ নানা রূপ কাব্যও আছে। মানব স্বভাব নানা রূপ, কাব্য ভাবও নানারূপ, তন্মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির ভাব ও স্বভাবের তুলনা করিতে ইচ্ছা করি।'

বস্তুত মানব জগতে যেরূপ বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত ও বৃত্তিভুক্ত লোক দেখা যায়,

কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও সেরূপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আগের তুলনায় বর্তমানে "সৌখিন" পর্যায়ভুক্ত মানব ও কবির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় অক্ষয়চন্দ্র চিন্তান্বিত। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, 'বাবু নবীনচন্দ্র সেন, বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অধরলাল সেন, প্রভৃতি এই শ্রেণীর লেখক। ইহাদের রচনা সুমিষ্ট ও পরিপাটি, কিন্তু তথাপি আমরা ইহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।'

তাই লেখকের মতে, খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য রচনা ক'রে অধরবাবু বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের পরিতৃপ্তি সাধন করলেও 'আমাদের মনে, সেরূপ পরিতৃপ্তি হয় নাই। আমাদের মনে সেরূপ আশা ভরসা হয় নাই।'

এরপর সৌখিন কাব্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ে অক্ষয়চন্দ্র 'ললিতাসুন্দরী' থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে বলেছেন যে, ইহা 'সর্ব্বদা বিরামের, বিশ্রামের, শ্রান্তির ও শান্তির গানই গাইয়া থাকে। এই কাব্য শোভাময় বটে, কিন্তু সেই শোভা মন্দ নীলকাশের শোভার মত, যেন সততই এলাইয়া পড়িতেছে, ধরি ধরি, আর গলিয়া পড়ে। * * * সৌখিন কাব্য চির বসন্ত—তাহাতেই আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না।'

পরিশেষে অধরবাবুর লেখনী শক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য; 'গ্রন্থকার সুলেখক, আমাদের একান্ত ইচ্ছা বাবু অধরলাল সেনের মত তরুণ বয়স্ক সুলেখকগণ একটু গভীরতা ও উৎকটের দিকে রস সঞ্চালনের চেষ্টা করেন।'

এ সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে (১২৮১, শ্রাবণ) বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'এখানি পদ্য। গ্রন্থকারের অনুরোধ, আমরা তাহার গ্রন্থের প্রতি পংক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক পৃথক্ সমালোচনা করি। লেখক অতি তরুণ বয়স্ক, আমরা জানিয়াছি। অতএব এখন তাঁহার এ আশা পূর্ণ না হইলেও তিনি রাগ করিতে পারেন না। যখন তিনি কোন উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন, তখনও আমরা প্রতি পংক্তি প্রতি শ্লোক, প্রতি পৃষ্ঠা পৃথক পৃথক্ করিয়া সমালোচিত করিতে পারিব না—ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শনে তাহা পাঁচ বৎসরে সম্পন্ন হইতে পারে না—তবে সাধ্যানুসারে সবিস্তারে সমালোচনা করিব। উপস্থিত কাব্যে, নবীনত্বের বিশেষ অভাব, কিন্তু দেখিয়া বোধ হয় বয়োবৃদ্ধি হইলে ইহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।"

'মেনকা' অধরলাল সেনের গীতিকাব্য। ইহা ইংরেজ কবি মুরের 'প্যারাডাইজ অ্যাণ্ড দি পেরী'র সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অনুবাদ। সংক্ষেপে কাহিনীটি নিম্নরূপ :—

"দুর্বাসার শাপে মেনকা স্বর্গচ্যুত হয়েন, পরে দৈববণী হয়, যে,

এই বসুমতী বসুধা মাঝে
সর্ব্বসার যেই রতন রাজে,

তাহা আনিতে পারিলেই শাপ মুক্তা হইবেন। প্রমীলা যখন ইন্দ্রজিতের শবদেহসহ চিতা আরোহণ করেন, তখন তাঁহার আনন্দাশ্রু পাত হয়, মেনকা প্রথমে তাহাই স্বর্গ দ্বারে দিল; দুয়ার খুলিল না। শান্তনু তনয় ভীষ্মদেব যখন পিতৃ সন্তোষার্থ চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন, তখন মেনকা তাঁহার সেই দৃঢ়বাক্য লইয়া স্বর্গদ্বারে গেলেন, দুয়ার খুলিল না। পরে অপ্সরা সমরশায়ী অভিমন্যু বীরের বীর লোহা লইয়া স্বর্গ দ্বারে উপহার দিল, দুয়ার খুলিল না। তাহার পর ঘোর পাপী রত্নাকর যখন অনুতাপ তপ্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ববৃত্তি পরিহার করিয়া ক্রৌঞ্চ বধূর জন্য পীড়ত হইয়া "মা নিষাদ" বলিয়া ছন্দোবন্ধে শোক করিতে লাগিল, তখন অপ্সরা সেই অনুতাপীর, ব্যথার শ্লোক হইয়া গেল। তখন দুয়ার খুলিয়া গেল, তাহারা বলিল—

অনুতাপ সুধা মধুর যেমন,
কবিতা তেমনই মধুর রতন,
জগতের সার এই দুই চেয়ে,
এক আছে ভুবনে মধুর ধন !!!"

দুখসঙ্গিনী (১২৮২, ১৫ই কার্তিক) একখানি উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্য। কাব্যখানি নবীনচন্দ্র সেনকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। গ্রন্থ রচনায় লেখক নাম প্রকাশ করেননি। কিন্তু যেহেতু দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর কাব্য সাধনা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র ওয়াকিবহল ছিলেন তাই গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন; 'গ্রন্থকার নাম প্রকাশ করেন নাই, আমরাও প্রকাশ করিলাম না; নতুবা আমাদের নিকট অপ্রকাশ নাই। নব কবির অনেকগুলি উচ্ছ্বাস বহুদিন হইতে সাধারণীর অঙ্ক শোভিত করিয়াছে. সুতরাং দুখসঙ্গিনী আদরের পাত্রী।' কেবলমাত্র উক্ত কাব্যখানি নয় ইতঃপূর্বে সাধারণীতে প্রকাশিত 'আক্ষেপ', 'সরস্বতীপূজা', 'রজনীর প্রতি' প্রভৃতি কবিতা রচনায় কবি হৃদয়ের যেভাব ফুটে উঠেছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তারই সুন্দর পরিচয় যে প্রস্ফুটিত তারই কথা অক্ষয়চন্দ্র ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য; 'এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেক সময় ইহার উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হইয়াছি ও নব কবির শোক প্রতিবিম্বে মর্ম্মে পীড়িত হইয়াছি। * * * দুখসঙ্গিনী পাঠ করিয়া

যাঁহার দুঃখ বেগ উচ্ছ্বসিত না হয়, তিনি হয় দেবতা, না হয় পশু।' কাব্যখানিতে মধুসূদনের সুস্পষ্ট প্রভাব যে লক্ষ্য করা যায় তা 'জন্মভূমি' কবিতার একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে ;

'কোথা আজি ভ্রাতৃগণ এস একবার,
জনম ভূমির দশা কর বিলোকন,—
মা আমার হইয়াছে শ্মশান অঙ্গার,
কত সবে তনয়ের বিচ্ছেদ যাতন,—
হরিলে নিদয় কাল নয়নের মনি
জীবনের প্রিয়তম একটি রতনে,
এক পুত্র শোকে হয় কাতর জননী
শত পুত্র শোক তবে সহিবে কেমনে ?'

এখানে বলা প্রয়োজন কাব্যখানি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল। (তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ : ভুবনমোহিনী, অবসর সরোজিনী, দুখসঙ্গিনী, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব কার্তিক, ১২৮৩)

উপন্যাস :

অচলবাসিনী (১২৮২, ৭ই ভাদ্র) ললিতমোহন ঘোষের 'উপন্যাস'। সাধারণী যন্ত্র থেকে নন্দলাল বসু কর্তৃক প্রকাশিত। অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনাটি উল্লেখযোগ্য বলে এখানে উদ্ধৃত করা হল।

'এই উপন্যাস কাব্যের গল্পটি ইতিহাস মূলক। রোটাস্ অধিপতি বীরকেশ বিন্ধ্যাচলের বিজন প্রদেশে প্রত্যহ শিব পূজা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে সেই পার্ব্বতীয় প্রদেশের একটি রমণীয় স্থানে কতিপয় রমণীকূল সুকণ্ঠে গান করিতেছিল। বীরকেশের আগমনে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেলেন। পর দিন বীরকেশ যুবজনোচিত অনেক অনুসন্ধানের পর গিরি চতুষ্টয় বেষ্টিত একটি সুরম্য ভবনে উপনীত হইলেন। শুনিলেন, সেই ক্ষুদ্র দুর্গ স্বামিনীর নাম শুরবালা। তাঁহার পিতা যবন তাড়িত, তাঁহাকে নিভৃত স্থানে রাখিয়া সেনা-সামন্ত সমভিব্যাহারে সমরে নির্গত হইয়াছেন। বীরকেশ গান্ধর্ব বিধানে শুরবালার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিছু দিন পরে রোটাসে নববধূকে আনয়ন করিলেন ও পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একজন যবন দূত আসিয়া বিখ্যাত শের খাঁর পত্র প্রদান করিল। শের খাঁ লিখিয়াছেন, আমি হুমায়ুন কর্ত্তৃক উত্যক্ত হইয়া পর্বতে পর্বতে

ফিরিতেছি, আমার কন্যা গুল্‌জিহান বাল্যকাল হইতে তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, আমি হিন্দু দেষ্টা, তাহাকে একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন আমি আশ্রয়হীন, আর সেই গুল্‌জিহান খোদার নির্ব্বন্ধে তোমার গৃহলক্ষ্মী হইয়াছেন। আমি এখন সেই ত্যক্তা কন্যার ও হিন্দু জামাতার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। একবার হিন্দু পাঠানে এক হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করিব। তোমার অভেদ্য রোটাস দুর্গে আমার ধনজনকে পরিজনকে আশ্রয় দাও ও রক্ষা কর। আমি হুমায়ুনের বক্ষঃ রক্তে আমার তরবারির পিপাসা শান্তি করিব। তোমার অনুমতি পাইলে আমার জেনানা ও খাজানা তোমার দুর্গে প্রেরণ করিব। বীরকেশ বিস্মিত হইলেন। স্বীয় সচিব মীনকেতুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মীনকেতু বলিলেন, শের খাঁকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। শের খাঁ একবার আশ্রয় দাতা পীর খাঁকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। শের খাঁ বিশ্বাস ঘাতক কৌশলী, কন্যা বিক্রয় করিয়া রোটাস পতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। যদি শুরবালা বিশ্বাসিনী হইত, তাহা হইলে এতদিন স্বামী সন্নিধানে অবশ্য যবনী বলিয়া পরিচয় দিত। বীরকেশের মনে বিষম সন্দেহ হইল, তিনি শুরবালাকে অবিশ্বাসিনী মায়াবিনী বলিয়া ভর্ৎসন করিলেন। শুরবালা আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যবনী একান্ত হিন্দুর প্রেমের ভিখারিণী। শুরবালা রোদন করিতে লাগিলেন। গ্রন্থের প্রাঞ্জল ভাষা ও সুমধুর ছন্দের পরিচয় প্রদান জন্য ও গ্রন্থকারের রসরচনে নিপুণতা প্রদর্শন জন্য আমরা শুরবালার খেদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। লেখা ইংরাজী গন্ধী নহে, বরং অনেক-স্থানে সেকালে টান আছে। সুকুমার সেনের অভিমত; 'ললিত মোহন ঘোষের "অচলবাসিনী" তে রঙ্গলালের অনুকরণ আছে।'

"বিশাল লোচন নীল, নীলপদ্ম প্রায়,
অভিমান রাগ ভরে রক্তরেখা জ্বলে,
পরাগ কেশর রেখা যেন লাগি তায়,
নিশির শিশির সম ঢলঢল জলে।
কহিলা কামিনী অতি কাতর ভারতী,
"হৃদয় বল্লভ"। আমি দুখিনী রমণী,
তব রূপ গুণ শুনে মজেছিল মতি,
আশা নাহি হ'ত কিন্তু বলিয়া যবনী।
এই হেতু ধরিলাম শুরবালা নাম,

শুনি পিতা মম, ক্রোধে ত্যজিল কাননে।

*　　*　　*　　*

অবনীতে পুনরায় জন্ম যদি হয়
দয়াময়! যেন আর না হই যবনী ॥

তাহার পর বীরকেশ শের খাঁকে আশ্রয় দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, সহস্র শিবিকা সমেত শের আসিয়া উপস্থিত। দুর্গ মধ্যে তাহারা আসিলে পর, শেষ রণ বাদ্য বাজাইয়া দিলেন। শ্বশুর জামাতায়—হিন্দু ও পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বীরকেশ যুদ্ধে নিহত হইলেন। শুরবালা আত্মহত্যা করিয়া সহমৃতা হইলেন।

অতঃপর হিন্দুগণ লয়ে দম্পতিরে,
দুর্গের বাহিরে গেল তটিনীর তীরে।
চন্দন ইন্ধনে কিবা চিতা সাজাইল,
সযতনে তদুপরি দুঁহে শোয়াইল
উঠিল চিতার ধূম, ছাইল গগন,
ভস্মীভূত হলো দেহ, সোনার বরণ ॥'

'কল্পতরু' (১২৮১, ১৫ই ভাদ্র) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাস। এ জাতীয় গ্রন্থ রচনায় ইন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র এ গ্রন্থপাঠে যে তৃপ্তি পাননি তা খোলাখুলি ভাবে বলেছেন। এবং গ্রন্থখানিতে করুণরসের চিত্র কেন নেই ; তা উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন।

মূল ঘটনার সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে হুতোমের সঙ্গে কল্পতরুর পার্থক্য নিরূপণ করে বলেছেন ; 'কল্পতরু হুতোম পেঁচার মত, অথচ হুতোমের নকল নহে। হুতোম হইতে এই গ্রন্থ কতক ভাল, কতক মন্দ। হুতোম হাসিতে কাঁদিতে দুই জানে, কাঁদাতে পারুক আর নাই পারুক, কাঁদিতে জানে। বহু-দিনের মরা টিয়া পাখীটী আবার ফিরিয়া আসিবে বলিয়া তাহার পিঞ্জরটী হুতোম অতি যত্নে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল, হুতোম কাঁদিতে শিখিয়াছে। আর হুতোম আপনি হাসিয়া পরকে হাসায়। অর্দ্ধ কোটর প্রবিষ্ট পেচক যখন আপনার সেই অর্দ্ধ কোটর প্রবিষ্ট-চক্ষুঃ ঈষৎ রক্তিম করিয়া খলখল হাস্য করে, তখন সে ফোলা গালের খোলা হাসি দেখিয়া শুনিয়া কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। হুতোম আপনি হাসে দেখাদেখি সকলে হাসে। কল্পতরু আপনি কখন হাসেও না কাঁদেও না। অথচ অনর্গল লোককে

হাসাইতে থাকে। লোক হাসাইতেই কল্পতরুর মর্ত্যে আবির্ভাব। কল্পতরু টিপি টিপি কথাগুলি বলে, লোকে কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠে, কল্পতরু নিস্তব্ধ হইয়া থাকে, যেন কিসের জন্য লোকে হাসিতেছে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সকল কথাই বিলক্ষণ বুঝে, স্থূল কথায় কল্পতরু বড় চতুর।'

এরপর রচনারীতির শিল্প নিপুণতা নিদর্শনে মূল কাহিনী বিবৃত করে ইন্দ্রনাথের ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য যে, লেখক ঘটনা বর্ণনায় যথাযথ মনঃ সংযোগে যত্নবান হননি। প্রসঙ্গত লেখকের বক্তব্য তুলে ধরা হল,—'সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়া সাহিত্য দূষিত করা শ্রেয়ঃ নহে। বিশেষ কল্পতরু সমাজ কাঠামর কেবল পশ্চাদভাগেরই সমালোচন করিয়াছেন; সম্মুখের সুন্দর মূর্ত্তির পর্য্যালোচনা না করিয়া, যেদিকে কেবল খড় আছে, আর বাঁকারি আছে, আর কাদা আছে, আর দড়ি আছে, সেই দিকেরই চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। এটি গ্রন্থের একটি ভয়ানক দোষ। রেনওস্ এই পাপে ইংরাজি সাহিত্য প্লাবিত করিয়াছেন, তাহার অনেক অনুকরণ বাঙ্গালায় হইয়াছে; আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখন আমরা রামের মত রাজা চাই, লক্ষ্মণের মত ভাই চাই, দশরথের মত পিতা চাই, সীতার মত সতী চাই, সূর্য্যমুখীর মত পত্নী চাই, প্রতাপের মত প্রণয়ী চাই। য়াগোর দৌহিত্র পৌত্রকে, রামদাস, নরেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে জজ সাহেবের সম্মুখে উচ্চাসনে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিলেই যথেষ্ট, তাঁহাদিগকে কাব্য গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাই আর না পাই, তাহার জন্য বড় ক্ষতি বোধ করিব না।'

অক্ষয়চন্দ্রের মতে অনুকরণ ছাড়া বাস্তব ঘটনার যথার্থ চিত্র পরিস্ফুটনে সকলের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। কল্পতরুর মধ্যে এ জিনিসের বড় অভাববোধ হওয়ায় অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, 'আমরা কল্পতরু হইতে আশানুরূপ সুখ পাই নাই।' তথাপি ইহা "লিপিকৌশল সম্পন্ন ও হাস্যরসপটু।"

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮১, পৌষ) গ্রন্থখানির প্রশংসা করেছিলেন। তিনিও আলাল এবং হুতোমের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের তুলনা করে লিখেছেন,— "রহস্যপটুতায়, মনুষ্য চরিত্রের বহু দর্শীতায়, লিপি চাতুর্য্যে ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ। এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সু-নীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পর দুঃখে কাতর, সু-নীতির পরিপোষক এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচি বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনা-চাতুর্য তা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে

বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনপ্রিয়তা ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুয়ের একেও নাই।"

অক্ষয়চন্দ্র কল্পতরুতে যে আতিশয্য দোষ দেখেছেন, বঙ্কিমের মতে তা ব্যঙ্গরস পরিস্ফুটনে উপযোগী। 'এসকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদের কার্য আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট। * * * এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি লেখকের কৌশল।'

বাসিফুল—একখানি গল্পের বই—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু রচিত। বইটি সাধারণীতে অক্ষয়চন্দ্র সমালোচনা করেছিলেন। পরে আবার সেটি 'গৃহস্থে' পুনর্মুদ্রিত হয়। এর থেকে আলোচনাটির তৎকালীন জনপ্রিয়তা বোঝা যায়।

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বাসিফুল' উল্লেখযোগ্য পুস্তক। এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। কি হইলে ছোট গল্প পূর্ণতা লাভ করে সেকথা এখন বলিব না, এ পুস্তকে সকল গল্প পূর্ণতা লাভ করে নাই—প্রথমটি ও শেষেরটি যেমন হইয়াছে, মাঝের গুলি তেমন হয় নাই। অজি কেবল 'বাসিফুলের' ভাষায় কথা বলিব—ইহার ভাষা অতুল্য বলিলেও অতিরঞ্জন হইবে না। আজি কালি সবুজ ভাষা, নীল ভাষা পীত ভাষার বৈচিত্র্যে চোখে ধাঁধা লাগিতেছে, সাদা ভাষার কারচুপি আর দেখিতে পাই না। এই গ্রন্থে তাহা পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়াছি। একটু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—'মানব হৃদয়ে একদিন না একদিন বসন্তের বিকাশ হয়। যেদিন পাখীর প্রমত্ততান সুপ্ত প্রাণ জাগাইয়া তোলে; যেদিন ফুলের গন্ধ মদিরার ন্যায় মনে মত্ততা সঞ্চার করে; যেদিন ভৃঙ্গ গুঞ্জনে হৃদয়ের তার বাজিয়া উঠে, যেদিন সমীর সংস্পর্শে অন্তর নবরাগ রঞ্জিত কিশলয়ের ন্যায় তর তর করিয়া কাঁপিতে থাকে, যেদিন কিশোর যৌবন রূপের ডালি লইয়া উপাস্য দেবতার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহে; যেদিন ব্যাকুল বাসনা ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আরাধ্যের অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, তৃষিত চিত্ত মিলনের সাগর সঙ্গমে স্নাত হইবার নিমিত্ত অধীর হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়।'

দেখিবেন বসন্তের ও যৌবনসুলভ মানব হৃদয়ের একত্র সমাবেশের কি সুন্দর বায়স্কোপ চিত্র। যে চিত্রে শ্রীমতী বলিয়াছিলেন "বাঁশী কানে বাজে বা প্রাণে বাজে"—এ সেইরূপ চিত্র, মধুকর মালতী মুকুলে বসিয়া গুন্‌গুন্ করিতেছে—হৃদয়ের মাঝে কে যেন কিসের লাগি সেই মধ্যম স্বরে সুর মিলাইয়া—গুন্‌গুন্

করিতেছে। সাহিত্যের অপূর্ব্ব বায়স্কোপ এটাও দেখাইতেছে ওটাও শুনাইতেছে। নব কিশলয় কাপিতেছে, আর বসন্ত সমীর যেন আনন্দে অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, সাধারণ জড় বায়স্কোপ কেবল দেখা যায়, দেবেন্দ্র বাবুর এই অপূর্ব সাহিত্য বায়স্কোপ দেখা যায়, শুনা যায়, স্পর্শ করা যায়। দেবেন্দ্রবাবু এইরূপ লেখা লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন, এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়া আমরাও ধন্য হইলাম।" (সপ্তম খণ্ড, সপ্তম বর্ষ, ১৩২৩ ভাদ্র, গৃহস্থ, পৃষ্ঠা ১০৫৪)

নাটক :

'ডাক্তার বাবু নাটক' (১২৮২) তথাকথিত ডাক্তারদের জীবন দর্শন, যাঁরা ঐ নামের আড়ালে সমাজের নীচ সম্প্রদায়ের মত যে কোন কাজে লিপ্ত হ'তে সঙ্কোচ বোধ করেন না। নাটকখানি 'জনৈক ডাক্তার প্রণীত' হওয়ায় এর মধ্যে বাস্তব চিত্রের সম্যক পরিচয় ফুটে উঠেছে। নাটকের প্রারম্ভে রচয়িতার বক্তব্য,— 'আমার নাটক বাস্তবিক নাটক হইল কিনা আমি সে বিষয়ে একবারও ভাবিয়া দেখি নাই, আমি কেবল ইহাই দেখিয়াছি যে, আমার নাটকে ঘটনা সকল প্রকৃত রূপে বর্নিত হইয়াছে। আমার রচনায় এমন কোন পারিপাট্য নাই, যাহাতে পাঠক মোহিত হইতে পারেন। আমি পাঠকদিগকে চমৎকৃত করিতে চেষ্টা করি নাই। কেবল সাবধান করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পারে, কিন্তু উপকার হইতে পারিবে, ইহাতে রসোদয় হইতে না পারে কিন্তু জ্ঞানোদয় হইতে পারিবে।'

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতির সব কিছু সমর্থন করলেও অক্ষয়চন্দ্র 'জ্ঞানোদয়' কথাটির ওপর সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং 'সাধারণী'র পৃষ্ঠায় এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পাপিষ্ঠের কখনও জ্ঞানোদয় হয়না।' তা যদি সম্ভব হ'ত তাহলে,— "তাঁহার মন্মথ ডাক্তারের মত কত মহাপুরুষ কত কুমার কৃষ্ণের পাদুকাবেগ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। কই কখনও ত পাপিষ্ঠগণের চৈতন্য হয় নাই। আর নিজে ঔষধালয় করিয়া, বেশী দামে ঔষধ বিক্রয়, রাত্রিতে মদ বেচা, এসকল ত মহাপুরুষগণের অঙ্গের আভরণ হইয়াছে।"

তাই অক্ষয়চন্দ্র পরিশেষে লেখকের উদ্দেশে বলেছেন যে, এর দ্বারা ডাক্তার সমাজের চৈতন্যোদয় না ঘটারই সম্ভাবনা। তবে সাধারণ মানুষের কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হ'লে 'গ্রন্থকার শ্রম সার্থক বোধ করিবেন। আমাদের বোধ তাঁহার শ্রম, নিতান্ত নিরর্থক হইবে না।'

কুঞ্জবিহারী বসুর 'শক্রসিংহ নাটক' (১২৮২) খানি তাঁর দ্বারাই প্রকাশিত

হয়ে বার হয়। লেখকের উদ্দেশ্যে অক্ষয়চন্দ্র যা বলেছেন সমালোচনা অংশটি পুরোপুরি তুলে ধরা গেল,—'শুনিয়াছি গ্রন্থকারের নিতান্ত অল্প বয়স। তিনি বলিয়াছেন, যে, তিনি একবার উৎসাহ পাইয়াছেন বলিয়া আবার লিখিতে সাহসী হইলেন। এবং তিনি এখন রোগ শয্যায় পীড়িত। সুতরাং আমরা তাঁহাকে অধিক কথা বলিব না। তিনি অল্প বয়সে আর পাঁচ সাত বৎসর নাই নাটক লিখিলেন। অজরা মরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।'

'বাঙ্গালির মুখে ছাই প্রহসন' (১২৮২) শ্রীগোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। গ্রন্থখানি যে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের তা অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনা পাঠে সহজেই পরিস্ফুট। গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য; 'এই প্রহসনে জন দুই তিন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালির মুখে ছাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বাঙ্গালি এমন প্রহসন লেখে, আর যে বাঙ্গালি পড়ে, তাহার মুখে ছাই—শতবার।'

সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটক, হেমনলিনী, বীরবালা নাটক, বীরবালা নাটক (রচয়িতার নাম নেই), চিতোর রাজসতী পদ্মিনী, জেলদর্পণ নাটক, ভারত দুঃখিনী নাটক—এই সাতটি নাটক 'সাধারণী'র কার্যালয়ে সমালোচনার্থে প্রেরিত হ'লে সম্পাদক সমালোচনার পূর্বে যে বক্তব্য তুলে ধরেন তা যথাযথ :—

"গ্রন্থকারগণের নিকট আমরা নিতান্ত অপরাধী রহিয়াছি। প্রায় দুই তিন মাস হইল, কয়েকখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য আমাদের হস্তে আসিয়াছে; আমরা নানা কারণে সকলগুলি পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং সমালোচন করিতে পারি নাই। সাধারণতঃ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করাই কষ্টকর; তাহার উপর যদি আবার হিমালয়ের শৃঙ্গমালার ন্যায় একখানির পশ্চাৎ হইতে আর একখানি উঁকি মারিতে থাকে, ক্রমে আর একখানি, আর একখানি, —তাহা হইলে আতঙ্কে হৃৎকম্প হয়; একখানিও পড়িতে ভরসা হয় না। আবার যখন মনে হয়, এইগুলি পড়িয়া শুনিয়া পরে সেইগুলি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিতে হইবে, যে কখন বুঝে না তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, যে নিতান্ত নির্বোধ তাহার উপর রসিকতা বর্ষণ করিতে হইবে, যাহার তিন পুরুষে লজ্জা নাই তাহার মনে কোমল-কঠিন কথায় লজ্জা উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে, যে কখন কোন ভাষা অধ্যয়ন করে নাই, তাহার গ্রন্থ সমালোচনার সময় বলিতে হইবে, যে মম্মট ভট্ট আরিষ্টটলের মতে এরূপ রস রচনার নানা দোষ আছে; যে গদ্য পদ্য বিভেদ করিতে জানে না, তাহাকে বলিতে হইবে, যে তোমার

গ্রন্থের এই সকল পদ অলঙ্কার দুষ্ট ; —যে ব্যাকরণের স্বর সন্ধি জানে না তাহার গ্রন্থ হইতে সমাস দুষ্ট পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া নিষ্কাসিত করিতে হইবে, এই সকল কষ্টকর কথা যখন মনে হয়, তখন আর কোন পুস্তক স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, কেবল মনে হয়, কিরূপে এ দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। এইরূপে প্রায় দুইমাস কাল কাটাইলাম, এখন অগত্যা আবার অদ্য সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলি নাটক আসিয়া জমিয়াছে ; এইগুলির সমালোচন করিয়া উঠিতে পারিলে যথার্থই পৌরুষ আছে, এই বিবেচনা করিয়া অগ্রে সেইগুলি গ্রহণ করিলাম,—কাচ-কাঞ্চন একত্র করিলাম—গ্রন্থকারগণ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" এরপর একে একে উল্লিখিত নাটকের সমালোচনায় কেন অগ্রসর হন তারও এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন,—"এই সাতখানি নাটক একত্র সমালোচনা করিবার একটি উপযুক্ত কারণ আছে। সৌভাগ্যক্রমেই বলুন, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বলুন, এই কয়খানিতেই দেশহিতৈষিতা প্রসূত শোকমিশ্রিত বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। আমরা বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা দেশ-হিতৈষিতা হুজুকে আহ্লাদিত নহি। আমরা উপেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত শরৎ-সরোজিনী পাঠ করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, এবার তাঁহায় সুরেন্দ্র-বিনোদিনী পাঠ করিয়া সেরূপ আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শরৎ-সরোজিনী সমালোচনাকালে আমরা বলিয়াছিলাম যে, 'রস-উদ্ভাবনাতে নাটককারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎ-সরোজিনী গ্রন্থে এরূপ রসোদ্ভেদ মধ্যে মধ্যে আছে। দুর্গাদাস বাবু পরলোকগত না হইলে, আমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার নাটক লিখিতে অনুরোধ করিতাম।' আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে আমাদিগের নরলোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া প্রেতাত্মা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শালিকার বটবৃক্ষমূলে প্রকাশক উপেন্দ্র বাবুকে প্রদান করিয়াছেন। যখন প্রেতাত্মা আমাদের কথা রক্ষা করিয়াছেন, তখন এবার তাঁহাকে স্পষ্টতঃ অনুরোধ, তিনি যেন এবার এই দেশহিতৈষিতা হুজুকের দল বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন, যদি ইহার অন্য কোন যুক্তিও না দেখাইতে পারি, মঙ্গলাকাজ্ক্ষীরূপে একথা বলিতে পারি যে, যে সময়ে ভেক মক্ মক্ করিতে আরম্ভ করে, সে সময়ে কোকিলের নিস্তব্ধ থাকাই উচিত।"

সুরেন্দ্র বিনোদিনী (১২৮২) উপেন্দ্রনাথ দাসের দ্বিতীয় নাটক। নাটকের 'বিজ্ঞাপন' অংশে অর্থাৎ ভূমিকায় নাট্যকারের বক্তব্য অত্যন্ত রসপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। "একদিন সন্ধ্যার সময়, সালিকা গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন-

কালে, এক বট বৃক্ষমূলে এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকাধিকারীকে, তাহা অদ্যাপি নিরূপণ করিতে সমর্থ হই নাই। ইহার এক প্রান্তে, হস্তাক্ষরে এই কয়েকটি মাত্র কথা লিখিত ছিল :—'নবগোপাল মিত্র একটি প্রকাণ্ড জানোয়ার-–বৎসর বৎসর হিন্দুমেলা করিয়া কি হইতেছে? মৃত ব্যক্তিকে কে পুনর্জীবিত করিতে পারে? আবার শুনিতেছি না কি 'কলিকাতা আসো-সিয়েসন্' নামে সভা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। শিশিরকুমার ঘোষের শ্রাদ্ধ হইতেছে।—এ দিকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' করিতেছেন। আমার পিণ্ড চটকাইতেছেন। কে পড়ে? *** ইহার অর্থ কি। যাহা হউক, পুস্তকস্বামী মহাশয় অনুগ্রহ পুরঃসর আর্যদর্শন কার্যালয়ে পত্র লিখিবেন। পত্র প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার পুস্তক তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

পুস্তকখানি কিরূপ, দ্বিপদ বা চতুষ্পদ, তাহা দেখিবার জন্য একবার আর্য-দর্শনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। বাবুটি অতি ভদ্র ও সদ্বিবেচক। তিনি পুস্তকখানি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দণ্ডত্রয় ঘোর চিন্তা করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"মন্দ নহে। 'কি মজার শনিবার' প্রভৃতি পুস্তক অপেক্ষো নিশ্চয়ই কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ।"

নাটকের মূল ঘটনা হুগলীর শিক্ষিত যুবক সুরেন্দ্রনাথ ও বংশবাটীর রাজচন্দ্র বসুর পৌত্রী বিনোদিনীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও অপরদিকে সুরেন্দ্র-ভগিনী বিরাজমোহিনীর প্রতি রাজচন্দ্রের দৌহিত্র হরিপ্রিয়র অনুরক্ত হওয়ার ঘটনার আবর্তে হুগলী ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের ভূমিকা ও চরিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। নাটকখানিতে হুগলী ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘটনা ছাড়া আর বিশেষ বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। নাটকখানি বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছিল। পুলিশের রোষ-দৃষ্টিতে পড়ায়, অশ্লীলতার দায়ে নাটকটি অভিযুক্ত হয়। ফলে নাটকখানি বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

অক্ষয়চন্দ্র নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—'সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকে মফস্বলের ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার, আচার ও অত্যাচার কিঞ্চিৎ রঙ চড়াইয়া স্পষ্টাক্ষরে চিত্রিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। বোধ করি রঙ্গভূমিতে সুরেন্দ্র বিনোদিনী বিলক্ষণ সফলতা লাভ করিয়াছে ও করিবে।'

উমেশচন্দ্র গুপ্তের লেখা 'হেমনলিনী' ও 'বীরবালা' উল্লেখযোগ্য নাটক।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত রজনীকান্ত গুপ্তের ভাই এবং সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থগারিক ছিলেন। এ দুটি নাটক ছাড়া 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' নামে তিনি আর একখানি নাটক রচনা করেন। প্রথম নাটকটি বিয়োগান্ত। দ্বিতীয়টি 'সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সিলিউকস এবং মগধেশ্বরের যুদ্ধ' অবলম্বনে লেখা। দুটি নাটকেরই সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য,—"হেমনলিনী (বিয়োগান্ত নাটক), ও প্রথম বীরবালা নাটক একই লেখনী প্রসূত। বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্বান ও সুরুচিসম্পন্ন ও দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। 'বিয়োগান্ত' নাটক লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কাছে প্রশংসা লাভ করা অতি দুরুহ ব্যাপার। এক নীলদর্পণ ব্যতীত কোন নাটক কিঞ্চিন্মাত্রও সফলতা লাভ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। হেমনলিনীর হেমচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও মনোকষ্টে নিতান্ত পীড়িত, তাঁহার জন্য দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এইমাত্র, কিন্তু হেমচন্দ্র বঙ্গভূমিতে ইহলোক পরিত্যাগ কালে আমাদিগের মনে কোন স্থায়ীভাব চির অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং স্থায়ীভাব উদ্দীপক (Tragedy) নাটক রূপে হেমনলিনী কোন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

হেমনলিনীর ইন্দ্র দমন অতি সুন্দর। ইন্দ্র দমন একরূপ পাগল। এই বিচিত্র বাতুলের সহিত উপন্যাসের সংস্রব আছে ; তাহাতেই তাহার বাতুলতা চিন্তাকর্ষণ করে। ইন্দ্র দমন নৃত্য করিতে করিতে উর্দ্ধহস্তে গীত গাহিতেছে। ইন্দ্র দমন পীড়িতের জন্য পীড়িত, পীড়িতকে সান্ত্বনা করিতে ব্যস্ত, পাপীর দণ্ড বিধান করিবার আহ্লাদে ইন্দ্র দমন একেবারে উচ্ছ্বসিত। ইন্দ্র দমন গান করিতেছে,—

সোনার পুত্তলি কেন, ধরায় পড়িয়ে রে ?
হায় হায় ! কোলে লও, কেন্দে যে আকুল রে।
কূল নাই, কোল নাই, আমি নিব ওকে রে ?
ধরিব চোরেরে আমি, দিবতব ফাস রে
কান্দুক তাহার নারী, আমি বসে হাসি রে।

উমেশচন্দ্রবাবুর বীরবালা সু-প্রসিদ্ধ গ্রীক বীর সিলিউকসের কন্যা। ইতিহাসে লিখিত আছে, সিলিউকস এবং মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, পরে যবনরাজ চন্দ্রগুপ্তে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি বন্ধন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমন করেন। এই ঐতিহাসিক মূল হইতে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ হইতে সৈনগণের সমর ঘোষণা উদ্ধৃত করিলাম।

বিজয় নিশান উড়াও ভারতে,
সাহস ভরেতে চলরে ত্বরিতে,

ভীষণ বীরদর্পে ম্লেচ্ছে দলিতে,
সুখেতে হাসিয়া সংগ্রামে খেলাতে।

* * *

সমলে সসৈন্যে নাশরে, ম্লেচ্ছেরে,
কাঁপাও মেদিনী বীর দর্প ভরে,
হুহুঙ্কার রবে কর আক্রমণ
ভাষাও ভারত পিশাচ শোণিতে।"

'বীরবালা' নামে অপর যে নাটকখানি সমালোচনার জন্য প্রেরিত হ'য়েছিল তাতে গ্রন্থকারের কোন নাম ছিল না। পুরো নাটকখানি পাঠে অক্ষয়চন্দ্র সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। শশিশেখরের মৃত্যু এবং পরমুহূর্তে সত্যবতীর আত্মহত্যা বর্ণনা অত্যন্ত বিসদৃশ। মূল ঘটনা দুঃখজনক হ'লেও 'এখানি আহ্লাদ-পরিণাম নাটক বলিয়াই বোধ হয়।' নাটকখানি প্রসঙ্গে লেখকের উদ্ধৃতি তাৎপর্য পূর্ণ,—'বীরবালা নামে আমরা আর একখানি নাটক পাইয়াছি, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই, আমাদেরও ভাল মন্দ কিছু বলিবার নাই, তবে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে গ্রন্থের নায়ক নায়িকা—শশিশেখর ও সত্যবতীকে নিরর্থক প্রাণে মারা হইযাছে। উপাখ্যানের অঙ্গ সংস্থান দেখিলে এখানি আহ্লাদ-পরিণাম নাটক বলিয়াই বোধ হয়। হঠাৎ দুর্জ্জন হস্তে পঞ্চমাঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে ১১০ পৃষ্ঠায় শশিশেখরের মৃত্যু, পরক্ষণেই সত্যবতীর আত্মহত্যা। এরূপ আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা কি কঠোর ধর্ম্মোপদেষ্টা আর কি রস রচয়িতা, কাহারও আলোচ্য বিষয় নহে। যে ব্যক্তি এই সংসারের বৈচিত্র মধ্যে অন্তরে অন্তরে, স্তরে স্তরে শৃঙ্খল না দেখিতে পায়, সে সংসারের কিছুই বুঝে নাই, আর যে উপন্যাস বা নাটক লেখক, প্রতি পরিচ্ছেদে অঙ্কে অঙ্কে ফল্গুনদীর স্রোতের মত অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত না রাখিতে পারেন, তিনি কবিই নহেন। লীয়র নৃপতি যখন বার্দ্ধক্য সুলভ রাগভরে কর্ডেলিয়াকে পিতৃধনে একেবারে বঞ্চিত করিলেন, তখন শেক্ষপীয়র যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত করিলেন, তাহা পরিণামে শত মুখে, গভীর ধারে খরবেগে যখন সাগরে মিলিল, তখন সেই লীয়র সেই কর্ডেলিয়াকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। ম্যাকবেথ্‌কে যখন পিশাচীগণ ভাবী রাজ বলিয়া সম্ভাষণ কবিল, তখন যে বীজ উপ্ত হইল, তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। একদিন বটবৃক্ষে পরিণত হয় নাই; সংসারেও একদিনে, বা হঠাৎ একটি কাণ্ড হয় না, কাব্যগ্রন্থেও হওয়া উচিত নহে। যেখানে কোন নিয়ম দেখি না, সেখানে মনে কিছুই থাকে না। যেখানে গূঢ়ভাবে,

মৃণালতন্তুর মত অতি সূক্ষ্ম নিয়ম ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানেই বিস্ময় হয়, মনে অতি প্রগাঢ় ভাবের উদয় হয়। যে রস-রচন-পটু গ্রন্থকার মনোমধ্যে এইরূপ ভাবের উদ্দীপন করিতে পারেন, তিনিই সুকবি। আমাদের এই বীরবালায় সেরূপ কিছু দেখিতেছি না।'

'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী' (১২৮২) একখানি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক। এর রচয়িতা মহেন্দ্রলাল বসু ছিলেন একজন দক্ষ অভিনেতা। নাটক খানি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। দ্বিজেন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের গান ছাড়াও রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায়' গানটিও সন্নিবিষ্ট হয়। নাটকখানি রচনায় রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান ছাড়া অন্য কোন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত হ'লে এর নাট্য সৌন্দর্য যে অধিকতর বৃদ্ধি পেত অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনায় সেই বক্তব্যই প্রকাশ পেয়েছে। 'আমাদের বিবেচনায় পদ্মিনী উপখ্যান নাটকের উপযুক্ত নহে। গ্রন্থকার অন্য কোন উপাখ্যান গ্রহণ করিলে সদ্বিবেচনার পরিচয় দিতেন। পদ্মিনী নাটক হইতে আমরা একটা গান উদ্ধৃত করিলাম। আজি তিন চারি বৎসর হইতে এই গানটি কলিকাতা রঙ্গালয় সকলে ও অন্যান্য স্থানে প্রচলিত আছে।

তিলক কামদ ঝাঁপতাল।

মলিনমুখ চন্দ্রিমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিতেছে লোচনবারি॥
চন্দ্র যিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমারি, হায় রে, সহিতে না পারি॥'

দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'জেলদর্পন নাটক' (১২৮২) জেলের কয়েদীদের 'দুরবস্থা' বিষয় অবলম্বনে লেখা। এর আগে লেখক চা-কুলীদের ওপর চা-কুঠীর শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার বিষয় অবলম্বনে লেখেন 'চা-কর দর্পণ নাটক।'

নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে নাট্য সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র বর্তমান নাটক রচয়িতাদের উদ্দেশে গ্রন্থকারের মুখবন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকটি তুলে ধরেছেন ;

'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্ত বিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃতকম্পিত শোভিত দণ্ডং তদপি নমুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডং॥'

এবং এই শ্লোকের মাধ্যমে বলেছেন, 'এখনকার নাটককারগণের তাহাই হইয়াছে,

লেখা জানেন না, পড়া জানেন না, গল্প জানেন না, বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখতে পারেন না, পাঁচ জনের সমীপে কথা কহিতে পারেন না—তদপি নমুক্তত্যাশা ভাগুং।'

হারাণচন্দ্র ঘোষের লেখা 'ভারত দুঃখিনী' (১২৮২) একখানি রূপক নাটক। নাটকটিতে 'ভারতবর্ষের ও বঙ্গ, বোম্বাই, মালব, মাদ্রাজ, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রীদেবী' সকলের নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। নাটক খানিতে কোনরূপ সৌন্দর্য, বাঁধুনি বা নিপুণতা প্রকাশ পায়নি —ইহাই অক্ষয়চন্দ্রের অভিমত। তবে ভারত মাতার দুঃখ-বর্ণনা যেমন করে প্রকাশ করা যাক্ না কেন তাতেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গত নাটকে ব্যবহৃত একটি গানের উদ্ধৃতির মাধ্যমে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন,—'গ্রন্থের শেষভাগ হইতে আমরা একটি গান উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহাদের গীত শক্তি আছে একবার নির্জ্জনে, এক মনে গভীর রাত্রিকালে গান করিয়া দেখিবেন, দেশের জন্য দুঃখ হয় কিনা।

রাগিনী বেহাগ—তাল একতালা।
হায়, কি ঘটিল।
জগত পূজিতা ভারত জননী,
বুঝি কাননেতে জীবন তেজিল।
কবির জননী, বীর প্রসবিনী,
সে ভারতী আজি হয়ে অনাথিনী,
ভূতলশয্যায় যেন পাগলিনী, নিদয় তনয়ে ফিরে না চাহিল।
ওরে মূঢ়গণ কি সুখে এখন, বিলাস সাগরে রয়েছে মগন,
জ্ঞানেরি লোচন কর উন্মীলন, সুখের দিন ফুরাল—
মরি দুখে মরি দহিছে হৃদয়, ভাবী দশা ভাবি জীবন সংশয়
তোদেরি মনেতে ব্যথা নাহি হয়,
অভাগিনী দুখে জগত পুরিল।

'পল্লিবিকাশিনী নাটক' (১২৮১) এর রচয়িতা নাম প্রকাশ করেন নি। লেখক বর্তমান কালে নাটকের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হ'য়ে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তারই ফলশ্রুতি হল 'পল্লিবিকাশিনী নাটক'। তাঁর মতে; "পল্লির অবস্থা বর্ণনই পল্লিবিকাশিনীর প্রধান উদ্দেশ্য।"

অক্ষয়চন্দ্র নাটকখানি সমালোচনায় বিশেষ তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি

এবং লেখককে এ পথে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করেছেন। যদিও পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বর্ণনা সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব তথাপি তার জন্য নাটক রচনার প্রয়োজন আছে বলে অক্ষয়চন্দ্র মনে করেন না। মহাকবি মিল্‌টনের মন্তব্য "যে ভাল উদ্দেশ্যেই নরকের তলা পত্তন হইয়া থাকে" এ যুক্তি অক্ষয়চন্দ্র এ নাটক সম্বন্ধে মেনে নিতে পারেন নি। বরং নাট্যকারকে তিনি প্রবন্ধ বা সম্বাদপত্রে প্রেরিত অংশ সকল লেখবার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন,—"নাটক অতি ভয়নাক পদার্থ। যেরূপ পুরাণ সংহিতা কি মহাকাব্য সেইরূপ নাটকও সকলের স্পৃশ্য নহে। এস্কাইলস, শেক্ষপিয়র, ভবভূতি ও কালিদাস, ও তাঁহাদের মত লোকই নাটক লিখিতে পারেন, এ সকল আপনার আমার কর্ম্ম নয়। তবে অনর্থক কেন লোক হাঁসান? আপনি যদি কোন পল্লীগ্রামের লোক সংখ্যা অবধারণ করিয়া সেখান-কার জলকষ্ট, অন্ন কষ্ট বা পথ কষ্ট বর্ণন করিয়া একখানি পত্র লিখিতেন, আজি আমরা কত সুখী হইতাম। আর আজ আপনার "পল্লিবিকাশিনী" পাঠ করিয়া আমরাও অসুখী হইয়াছি আপনাকেও অসুখী করিলাম।"

'কুসুমে কীট' (১২৮১) প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা। নাটকখানি যে অত্যন্ত নিম্নমানের ও নাট্যকারের রুচি যে অত্যন্ত "কদর্য্য" তা অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া "এই নাটকের বার আনা ভাগ ছত্রে ছত্রে লীলাবতী, স্বর্ণলতা, একেই কি বলে সভ্যতা, সধবার একাদশী, বা বিষবৃক্ষ বা অন্য কোন পরিচিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত।"

'ভারতের সুখশশী যবন কবলে', 'ভারতবিজয়', 'যৌবনে যোগিনী', 'প্রমথনাথ' (১২৮২, ফাল্গুন)—এই চারটি নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র প্রথমে নাটকের সংজ্ঞা ও ক্রমে তাদের নাটকীয় গুনাগুণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম তিনটি নাটকের বিষয় একই পর্যায় ভুক্ত বলে অক্ষয়চন্দ্র এক তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। সমালোচকের বিচারে 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে' ও 'যৌবনে যোগিনী' যথাক্রমে নাটকীয় চাতুর্যে ও রস রচনায় সফলতা অর্জন করলেও 'ভারত বিজয়' রচয়িতা সেরূপ কৃতকার্য হন নি। তবে "তিন খানিতেই দেশহিতৈষিতা মিশ্রিত বীররসোদ্ভাবনের চেষ্টা আছে।" সুকুমার সেনের মতে, "যৌবনে যোগিনী"-তে মায়াবতীর পরিকল্পনায় বঙ্কিমের মৃণালিনীর প্রভাব আছে। এই গানটিতেও বঙ্কিমের অনুসরণ সুস্পষ্ট ;—

প্রেমিক বিধানে, নবীন পরাণে, যৌবনে যোগিনী রে।
শ্যামধন লাগি, গেহ সো তেয়াগি, আজু বিবাগিনী রে…"

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল নাট্যকার হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'চীনের ইতিহাস' (১২৭২) রচয়িতা হিসেবেও তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'প্রমথ নাথ নাটক' সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন যে দু একটি চরিত্র এবং সন্নিবেশিত কবিতা ছাড়া এ নাটকের আর কোন অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

যা হোক চারটি নাটকের সমালোচনা বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনা এখানে তুলে ধরা গেল,—"ভারতের সুখ শশী যবন কবলে, ভারত বিজয় এবং যৌবনে যোগিনী বিষয় একই। তিন খানিতেই পৃথুরাজ বা পৃথ্বীরাজ, হস্তিনা বা ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা একজন প্রধান অভিনেতা। তিন খানির অভিনেতৃগণের সৌ-সাদৃশ্য প্রকাশ করা গেল।

সুখশশীতে	—	বিজয়ে	—	যোগিনীতে
অনঙ্গমঞ্জরী	—	মায়াবতী	—	ইন্দুবালা
পুষ্পকেতু	—	শঙ্করাচার্য্য	—	বিষধর
অপরাজিতা	—	চপলা	—	অম্বালিকা
পৃথুরাজ	—	প্রমথ	—	পৃথুরাজ
কামন্দকী	—		—	সিদ্ধেশ্বরী
সোমরাজ	—		—	সমরসিংহ
ভীমসেন } কালকেতু }	—	প্রমথ	—	

এতদ্ভিন্ন তিন খানিতেই মহম্মদ ঘোরী একই কার্য্যের নিমিত্ত, কুতুবউদ্দীনও একই কার্য্যের নিমিত্ত—অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিন খানিতেই জয়চন্দ্র আছেন; সুখশশী ও বিজয়ের জয়চন্দ্র এক ছাঁচের—যোগিনীর অন্য ছাঁচের। যৌবনে যোগিনীর ভীমদেব কতকাংশে পূর্ব্বোক্ত নাটকের জয়চন্দ্র। পুষ্পকেতু বা বিষধর বা শঙ্করাচার্য্যের গুপ্ত চক্রান্তে ভারত যবন হস্তগত, পৃথ্বীরাজ কবলিত। তিন-খানিতেই দেশহিতৈষিতা মিশ্রিত বীর রসোদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। সুখশশী এবং যোগিনী কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। সমালোচ্য তিনখানি গ্রন্থের উপন্যাস একরূপ হইলেও, ভারতের সুখশশী যবন কবলে নাটকে কিছু চাতুর্য্য আছে। যৌবনে যোগীনী-কার রস-রচন-পটু। ভারত বিজয়কার চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারিবেন। সুখশশীর এক এক স্থলের ভাষা গ্রাম্যতা দোষে দূষিত, কোথাও সংস্কৃতাভিসারিণী। উক্ত নাটকের একস্থলে

বসন্ত ও গণপতির কথা বার্ত্তা পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু * * * দোষঃ গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরনেষ্বিবাঙ্কঃ।

যে উদ্দেশে যৌবনে যোগিনী প্রকাশ, তাহা অধিকাংশে সফল হইয়াছে। যথা :—

ভারতের স্বাধীনতা—প্রিয় স্বাধীনতা—
যার বলে ভূমণ্ডলে পূজ্য হও সবে ;
হরিতে সে ধনে, অমূল্য রতনে, করে
অন্তরে বাসনা, দুষ্ট পাপিষ্ঠ যবন।

* * *

মান, সুখ, স্বাধীনতা, প্রাণ পণ করি,
বীরদর্পে হও অগ্রসর—রুদ্রবেশে,
ভীষণ সংগ্রামে কর যবন সংহার।
আনন্দে যবন-রক্তে মাতারে করাও
স্নান, গাঁথিয়ে যবন-মুণ্ড পর সবে
গলে, ধর বীর নাম। বীর পুত্রগণ।
ভারতের জয়, গাও, ভারতের জয়।

বিখ্যাত নাটক লেখক দীনবন্ধু বাবু লীলাবতী নাটকের একস্থলে হেমচাঁদকে দিয়া বলাইয়াছেন "সব সওয়া যায়, কিন্তু মেয়ে জ্যাঠা সওয়া যায় না।" প্রমথ নাথ নাটক সমালোচনে আমরা সেই মেয়ে জ্যাঠার হস্তে পতিত হইয়াছি। বাস্তবিক এ দোষ কেবল প্রমথ নাথ নাটকেরই নহে। দুই একখানি নাটক ব্যতীত সকল নাটকই এই দোষে দূষিত। এমনকি দীনবন্ধু বাবুও তাঁহার স্বকৃত নাটক সমুদয়ে এদোষ বর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। অশুভক্ষণেই জীবিতেশ্বর, হৃদয়-প্রতিম প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্য সাগর মন্থনে উদ্ভব হইয়াছে! প্রমথ নাথ নাটক আদ্যোপান্ত এইরূপ দোষে দূষিত। নাটককার যে উদ্দেশে পতিত পাবনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সফল করিতে পারেন নাই। ভাসিয়া গিয়াছে। তবে দুই একটি—(বিদ্যাবতী, মন্ত্রী) চরিত্র মন্দ হয় নাই। তবে এরূপ কবিতাও মন্দ নহে।

অক্ষম অবলা-কুল বল কোন্ কাজে ?
পারে না কি তারা তীর ধনু তরবারি
ধরিতে করে সজোরে, করিতে সংহার

রণ রঙ্গভূমে শত্রু ভীম পরাক্রমে ?

* * *

আরোহিতে বাজীপৃষ্ঠে অটল অচল
দ্রুত ইরম্মদ বেগে ধাইতে সংগ্রামে ?

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, যে, রস Refined হইলে গান হয়। সেজন্য নাটকে দুই একটি গান থাকা উচিত। সমালোচ্য নাটকগুলি সকলই এবিষয়ে বিফল প্রযত্ন হইয়াছে। অধিকন্তু 'ভারতের সুখশশী যবন কবলে' নাটকে অনেকগুলি গান থাকাতে যাত্রার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

'বিধবা বঙ্গবালা নাটক' (১২৮২) বিহারীলাল মিত্রের রচনা। নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র একে নাটকের পর্যায়ে না ফেলে 'উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত তাঁর মন্তব্য,—'তিনি যাহা "নাটক" আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা "নাটক" নহে,—নবেল। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, গ্রন্থকার নবেল লিখিতে চেষ্টা করিলে সমধিক কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি রচনা চতুর, রসাবতারণায় বিশেষ ক্ষমতা আছে ; নবেল লিখিতে চেষ্টা করুন।'

অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে নাটকের বিষয়বস্তু আমরা এখানে তুলে ধরলাম।

'ইছাপুর নিবাসী রাজবল্লভ বসুর দ্বিজেন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ নামে দুই পুত্র ও কুসুমকুমারী নামে এক কন্যা ছিল। কন্যাটি দশ বৎসর বয়সের সময় বিধবা হয়। ব্রজেন্দ্রের হেমচন্দ্র নামে একজন শিক্ষক ছিল। হেমচন্দ্র, পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়া স্ত্রৈণ হইলে, গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পিতাও এক কন্যা লইয়া বারানসীতে গমন করেন, সেখানে গিয়া উদাসীন হন, এবং হেমচন্দ্রকে নানা বিপদ হইতে আকস্মিক উপস্থিত হইয়া উদ্ধার করেন। এদিকে, রসময় নামে রাজবল্লভের এক পারিষদ ছিল, সে কুসুমকে পূর্ব্বাবধি বিপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কুসুম হেমের প্রতি অনুরক্ত দেখিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমের সহিত কুসুমের পরিণয় দিবার সঙ্কল্প করেন। রসময় ইহাতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে বিষম ব্যাঘাত দর্শন করিয়া, প্রেমদাসী নামে একজন নাপিতিনীকে মধ্যস্থ করিয়া হেমকে বিষ প্রদান করে, কিন্তু হেম তাহার পিতা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ সেবনে বীতব্যাধি হন। রসময় চেষ্টা বিফল দেখিয়া, অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া কুসুমকে হরণ করে এবং হেমকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর প্রযত্নে কুসুম মুক্তিলাভ করে, এবং

প্রেমদাসী নাপিতিনী ও রসময় ভট্টাচার্য্য বিচারালয়ে নীত হয়। এদিকে রাজবল্লভ সপরিবারে হেমচন্দ্রকে লইয়া কাশীধামে উপনীত হইলেন। বিচারে নাপিতিনীর ও রসময়ের দশ দশ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইল। কাশীতে প্রকাশ পাইল যে, সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী রাজীবলোচন মিত্র, হেমচন্দ্রের পিতা। সেখানে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা বিদ্যাসাগর প্রমাণ করিয়াছেন জানিয়া, কুসুমের সহিত হেমের বিবাহ হইল, এবং ব্রজেন্দ্রের সহিত কামিনীর,—হেমচন্দ্রের—ভগিনীর বিবাহ হইল।'

"মহারাষ্ট্র কলঙ্ক" (১২৮২) 'আরঙ্গজীবের সমসাময়িক প্রকৃত ঘটনাময় দৃশ্যকাব্য।' রচয়িতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত। জনৈক বন্ধু তাঁর রচিত 'বীরবালা' নাটক প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে যে এই নাটক লেখা হয়েছে তা গ্রন্থকার স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। নাটক খানিতে সেকালের মঞ্চরুচি বিষয়ে কটাক্ষ এবং উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র এরূপ বাদ-প্রতিবাদে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, এতে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় থাকলেও নির্মলার চরিত্র-অঙ্কনে এবং ব্রহ্ম সঙ্গীতের পরিচয় দানে নাট্যকার কৃতকার্য হ'তে পারেন নি। প্রসঙ্গতঃ লেখকের বক্তব্য,—"তাঁহার নির্ম্মলার চরিত্র, অতি বিচিত্র। কখন পতি-বন্ধন-দর্শন কাতরা নির্ম্মলা উগ্র চণ্ডী মূর্তিতে, মুক্তকেশে, অসি হস্তে যবনদলনে ভীষনা ; আবার কখন বা প্রেম পাগলিনী নির্ম্মলা তটিনীর তীরে দাঁড়াইয়া, এক একটি ফুল ভাসাইয়া প্রেমময়ী ফিলিয়ার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করেন, আর বলেন,—

চল কল্লোলিনী! কল কল কলে,
ধর মম মালা, পর মম গলে,
* * *
দাঁড়াও দাঁড়াও সখি লও দুটী ফুল,
কাণেতে পরিবি যদি কুসুমেরি দুল।

উমেশবাবু প্রচলিত ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলির যেরূপ দশা করিয়াছেন, তাহাতেও দুঃখ হয়।" (বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মনোরমা চরিত্রের দ্বৈত ভূমিকার সঙ্গে নির্মলার আচার-আচরণ তুলণীয়।)

'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' (১২৮২ ফাল্গুন)-এর রচয়িতা হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ। ইতঃপূর্বে তিনি 'পুরুবিক্রম নাটক' রচনা করে খ্যাতি অর্জন

করেন। 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্য তুলে ধরা গেল,—"সরোজিনী নাটককার অনেকাংশে সফল হইয়াছেন, যথার্থ নাটকের গুণ অর্থাৎ "হৃদয়ে হৃদয়ে ঘাত প্রতিঘাত" ইহার কোন কোন স্থলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলা আলবালে জলসেচন করিতেছেন—সম্মুখে দুষ্মন্ত দণ্ডায়মান। দুষ্মন্ত জিজ্ঞাসিলেন 'এই কি কণ্বের আশ্রম?' শকুন্তলার হৃদয়ে আঘাত হইল। 'হাঁ, মহাশয় আপনি এস্থানে?' প্রতিঘাত হইল। ফল, পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ। ইহাই নাটক। সরেজিনীও কতকাংশে নাটক। ইহাতে দেশহিতৈষিতা মিশ্রিত বীর রসোদ্ভাবনের চেষ্টা আছে। আমাদের বিবেচনায় পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের ফতেউল্লার প্রবেশ দেখিয়া যাত্রার দলের কথা মনে পড়ে। যাহা হউক দোষে-গুণে নাটকখানি মন্দ নহে। ইহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।"

দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা নাটক' (১২৮০, বৈশাখ) প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য,—"গ্রন্থে বিস্তর দোষ আছে, অথচ হীরার টুকরার মত একটু গুণ আছে; সেই গুণটুকু পাইয়া সকল দোষ ভুলিয়া গেলাম; গ্রন্থকারের সকল দোষ মার্জ্জনা করিলাম।

আমরা সেই 'নেহারা' ব্যবসায়ী। যে গ্রন্থে ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া কিছু না পাই, তাহাই "ছাই ভস্ম" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। যদি অনেক পরিশ্রমের পরও দুই চারিখানা সোনার কুচা পাই, তাহা হইলে আহ্লাদের সীমা পরিসীমা থাকে না। কেননা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, এখন বঙ্গদেশে এই রূপেই স্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এরূপে সন্তুষ্ট না হইতে হয়, তাহা হইলে সমালোচন রূপ 'নেহারা' ব্যবসা ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। সেইজন্যই আমরা স্বর্ণলতা হইতে দুই চারিটি স্বর্ণাঙ্কর পাইয়াই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিলাম।

স্বর্ণলতা কুলীনকুমারী। কুলীনকুমারী লীলাবতীর ছায়া ইহাতে স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। স্বর্ণলতা নাটকের কোন্ চিত্র লীলাবতী নাটকের কোন্ চিত্রের সাদৃশ্যে গঠিত তাহা প্রদর্শনার্থ আমরা উভয় নাটক হইতে একরূপ চরিত্র পাশাপাশি করিয়া লিখিলাম।

ভোলানাথ চৌধুরীর	সাদৃশ্যে কৃপাসিন্ধু রায়
হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়ের	,, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
ললিত মোহনের	,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সিদ্ধেশ্বরের	,, বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীনাথের	সাদৃশ্যে	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
নদের চাঁদের	,,	হলধর চট্টোপাধ্যায়
লীলাবতীর	,,	স্বর্ণলতা
ক্ষীরোদ বাসিনীর	,,	মাধবীলতা
রাজলক্ষ্মীর	,,	বিন্দুবাসিনী
শারদাসুন্দরীর	,,	কুমুদিনী

ইঁহাদিগের চরিত্র গত সাদৃশ্য, আকৃতি গত কথোপকথন বিশেষ লক্ষিত হয়। উপন্যাসগত সাদৃশ্য আংশিক মাত্র। লীলাবতীর পিতা হরবিলাস "অর্পিলাম লীলাবতী ললিতের করে" বলিয়া চরমে পরম সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্ণলতার পিতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় স্বীয় অপরিণামদর্শিতা হেতু, স্বীয় বালকের পরামর্শে ; প্রতিবেশীগণের ভয়ে এবং দৈবদুর্বিপাক বশতঃ স্বীয় কন্যা স্বর্ণলতাকে দুর্বৃত্ত হলধরে নিঃক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। নাটকের প্রথম চারি অঙ্ক এই পর্য্যন্ত। তাহার পর পঞ্চমাঙ্ক ; পঞ্চমাঙ্কে এই বিবাহের বিষময় ফল সকল প্রদর্শিত হইয়াছ। প্রথম গর্ভাঙ্কে ফুলশয্যা রাত্রিতেই স্বর্ণলতা বিষপানে কৃত সংকল্পা হইলেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে চারুচন্দ্র ভগ্ন প্রণয়ে উম্মত্ত। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে স্বর্ণ বিষপান করিয়া আসীনা। মাধবীর স্থানে বিদায় গ্রহণ করিল, দাসীকে বলিল "ঝি! একবার মাকে ডাক না—মরণ সময় আমার মাথায় পায়ের ধূলি দিন।" অভাগিনী কিন্তু মাতাকে দেখিতে পাইল না, সেই অভাগিনী মাও আর স্বর্ণকে জীবিতা দেখিতে পাইল না। 'কি আমার স্বর্ণ নেই' বলিয়া যেমন বেগে আসিল, অমনি পড়িল, আর উঠিল না। নির্ব্বোধ হরিমোহন এতক্ষণ পরে আপনার কার্য্যের জন্য এখন অনুতাপ করিতে লাগিল। আর অনুতাপ করিলে কি হইবে ? তোমার সব ফুরাইয়াছে তোমার কুলে তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই সকল হৃদ্বিদারক ঘটনায় কাহার না দুঃখ হয় ? যাহার দুঃখ হয় তাহাকেই গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতে হইবে।"

বঙ্গদর্শন (১২৮১, শ্রাবণ) পত্রিকায় নাটকখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল,—"মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য। তাহা কেবল কবিই দেখিতে পান। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য—সেইজন্য নাটকের সৃষ্টি। বঙ্গদেশে নাটকের সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—মোহন্তের মোকদ্দমা, নাপিতের মোকদ্দমা—কুলীনের বহুবিবাহ —কি মজার শনিবার, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত হয়। কতক-

গুলি নাটককারের উদ্দেশ্য 'সসিয়েল রিফরমেশুন।' এ সসিয়ল রিফরমেশুন অর্থে সমাজ সংস্করণ নহে—ইহার অর্থ বিলাতী রেওয়াজ। যদি দেশে এমত কোন প্রথা থাকে যে ইংরেজে তাহার বিপরীতাচরণ করে, তবে নাটকের দ্বারা তাহার নিন্দা করিতে হইবে। দেবেন্দ্রবাবু দেখিলেন, যে দেশী প্রথা সকল প্রায় পূর্ব্ব-গামী নাটককারগণ উৎসৃষ্ট করিয়াছেন—নীলের চাস হইতে তীর্থ-ভক্তি পর্য্যন্ত কিছু বাকি নাই; অতএব তিনি "মনোনীত করিয়া পরিণয় করিবার প্রথা প্রচলিত না থাকায়" যে কত অনিষ্ট, তাহার বর্ণনা জন্য নাটক লিখিয়াছেন। নাটকখানি ৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতএব দেবেন্দ্র বাবুর দিন কোনমতে কাটিয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নাটককারেরা কি লিখিবেন, তাহা ভাবিয়া আমরা ব্যাকুল হইয়াছি। আমরা তাঁহাদিগের উপকারার্থ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কয়েকটি বিষয় স্থির করিয়াছি—ভরসা করি, তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন বিষয় মনোনীত করিবেন। যথা—বাঙ্গালি মাছ ভাত খায়, মুরগী খায় না এই কুপ্রথায় অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, এই নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া "মুরগী নাটক" নামে এক-খানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। আর এদেশে অশ্বের দ্বারা চাস না হইয়া বলদের দ্বারা চাস হয়, এই কুপ্রথার নিন্দার্থ "বলদ মহিমা" নামে আর একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইতে পারে। "রোডশেষ নাটক", "দুর্ভিক্ষ নাটক" প্রভৃতি নাটক এ পর্যন্ত হয় নাই—ভরসা করি, শীঘ্র হইবে। হইলে, যেমন হউক, স্বর্ণলতা নাটকের অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইতে পারিবে না।"

আদর্শ নাটক বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নির্দেশিত চারটি সূত্র বিশেষ স্মরণীয়। পরবর্তী কালেও এই আদর্শ মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। "সুদীর্ঘ সমালোচনার পর দুটা শেষ কথা। অন্তর্বেদ প্রধান কাব্যের নাম নাটক, এই কথা স্মরণ করিয়া, গ্রন্থকারগণ ১. অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা নাটকে প্রচলিত করুন এবং ২. উপন্যাস (Plot) বড় জটিল না করেন। ৩. করুণ রসের সহিত অন্য রসের অবতারণা করিলে ভাল হয় এবং ৪. গানগুলি একটু সরল হইলে ভাল হয়। আমাদের এত কথার কতক রক্ষা হইলেও চরিতার্থ হইব।"

'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস।' লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্য,—'বাল পাঠোপযোগী সদ্গ্রন্থ বাঙ্গালায় অতি বিরল। এবং বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালার একখানি ভাল ইতিহাসের বিশেষ অভাব ছিল। রাজকৃষ্ণ বাবু সেই অভাব দূর করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কেবল

বালকোপযোগী নহে, ইহাতে বৃদ্ধেরও উপকার দর্শিবে। যে জাতি পূর্ব্বকথা ভুলিয়াছে, আপনার পুরাবৃত্ত হারাইয়াছে, কি ছিল, কিসে কি হইল, যে জাতি জানে না, বোঝে না, সে জাতির জাতীয় জীবন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। যে বাঙ্গালী বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কাহিনী জানে না তাহা হইতে বাঙ্গালার কোন ভরসা নাই। সে বাঙ্গালার দুঃখে পীড়িত হইবে না। উত্তানপাদ সন্তান ধ্রুব যখন জানিত না, যে তাহার পর্ণকুটীরবাসিনী মাতা সুনীতি, রাজমহিষী, তখন সে মনের সুখে মুনি বালকগণের সঙ্গে তপোবনে হরিণ শিশু লইয়া খেলা করিয়া বেড়াইত, কিন্তু সেই ধ্রুব যখন পূর্ব্বকথা শুনিল, তখন বালস্বভাবসুলভ ধুলা খেলা পরিহার পূর্ব্বক, বিজনবনে ভগবানের আরাধনা করিতে লাগিল। এরূপ ভরসা করা যায় যে, যদি বাঙ্গালী পূর্ব্বকথা একবার হৃদ্গত করে, তবে সেই পৌরাণিকী ধ্রুব নিষ্ঠা লাভ করিবে।

বাঙ্গালার খণ্ডীকৃতা বিকৃতীকৃতা পূর্ব্বকথা আমরা দুই চারিবার শুনিয়াছিলাম, রাজকৃষ্ণবাবু এক্ষণে বাঙ্গালীর সাধ্যমত পূর্ণ ইতিহাস প্রদান করিয়া, অতি সহজ সরল ভাষায়, অতি সংক্ষেপে, বিনা আড়ম্বরে,—প্রদান করিয়া আমাদের ধন্য-বাদার্হ হইলেন।' (১২৮১-পৌষ) গ্রন্থখানি 'বঙ্গদর্শন' ও 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়ও (১২৮১, মাঘ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল।

সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত—ঈশানচন্দ্র বসু
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার— ঐ
স্ত্রী দিগের প্রতি উপদেশ— ঐ

(১২৮১, অগ্রহায়ণ)

উপর্যুক্ত চারটি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন,—'এই গ্রন্থগুলি এক ধর্ম্মাক্রান্ত। এইগুলি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি ও আদরে গ্রহণ করিয়াছি। সাহেবেরা সকলেই বিলাসী, অতএব গোলবাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বৈঠকখানা প্রস্তুত কর, গোয়ালবাড়ী উঠাইয়া দিয়া আস্তাবল তৈয়ার কর। সমাজ গাঁথনি, আচার-ব্যবহার সাহেবদিগের মত হইলেই সমাজ চরমোৎকর্ষ লাভ করিবে। এই রূপ উপদেশ সকলে প্রদান করিতেন। এই রূপ শিক্ষা সকলে প্রাপ্ত হইত। সভাস্থলে উর্দ্ধহস্তে ছটাছট ভাবে বাগ্মীগণ এই রূপ মত উদ্গার করিতেন, লিপি-কুশল লেখকগণ এই রূপ বিষয়ে প্রবন্ধ বিন্যাস করিতেন। ব্রহ্ম সভার আচার্য্য উপাসনার পর এই রূপ নীতিশিক্ষা দিতেন, নব্যসম্প্রদায় শৌণ্ডিকালয়ে সুরামত্ত

হইয়া এই সকল বৈদেশিক মত স্থাপনার্থ ঘোরতর তর্ক বিতর্ক করিত। এই রূপে মূর্খ-জ্ঞানী, ছোট-বড়, সকলেই হিন্দুয়ানীকে অধঃপাতে পাঠাইতে যত্নশীল হইয়াছিলেন।

কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, যে, আর সে "সেকাল" নাই। দেশ মধ্যে সাহেবিয়ানা প্রচার জন্য আর তত লাফালাফি নাই, মোহ অমাবস্যায় হিন্দুসমাজ নদে যে "বান" ডাকিয়াছিল, এখন ক্রমে ক্রমে তাহার বেগের হ্রাস হইয়াছে। জলভরা বটে, কিন্তু জোয়ার থমথমে। এমন কি বোধ হয় পূর্ব্ববৎ একটু ভাটার টানও হইয়া থাকিবে। হিন্দুয়ানীর স্রোত এতদিন যে অনন্ত সাগরাভিমুখে প্রধাবিত ছিল, এখন আবার বোধ হয় সেই দিকে অল্প অল্প যাইতেছে। সমালোচ্য গ্রন্থ চতুষ্টয়ও সেই ঘটনার সামান্যতম নিদর্শন মাত্র। রাজনারায়ণ বাবু ও ঈশানচন্দ্র যেমন ভাটা পড়িতেছে অমনি নৌকা খুলিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগের মঙ্গল হউক।

"বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত" নামক গ্রন্থের ভূমিকাভাগে, ঈশানবাবু এই সাহেবিয়ানা অনুকরণ প্রবৃত্তির কিরূপে বৃদ্ধি হয় ও ক্রমে কিরূপেই বা হ্রাস হইতেছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও কাহাও স্মরণ থাকিতে পারে, যে সেই ভূমিকাটি সমস্ত আমরা সাধারণীতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। প্রকৃত সমালোচনা হয় নাই। সেইরূপ "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে এত কথা আছে যে তাহারও সম্যক্ সমালোচনা করা যায় না।"

উল্লিখিত চারটি গ্রন্থের মধ্যে 'বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনুর মত, গ্রন্থখানি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (১২৮১, কার্ত্তিক) সমালোচিত হয়। গ্রন্থখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য,—'এ গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট। এরূপ গ্রন্থের আমরা বিশেষ সমাদর করিয়া থাকি। ইহার ভূমিকা পাঠ করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। পাঠ করিয়া পাঠকগণ সন্তুষ্ট হইবেন। ইহার মতামতের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইলাম না। —ভূমিকা হইতে শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝাইতেছি। গ্রন্থকারের মুখে, এরূপ পরিচয় দেওয়াই বিধেয়।

'আমি হিন্দু কুলশিরোমণি মনুর বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মত এই প্রস্তাবে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মনুর গভীর জ্ঞান, অসাধারণ ব্যবস্থা-প্রণয়ন-কৌশল ও তাঁহার মতের বিশুদ্ধতা প্রদর্শন ভিন্ন আরো কিছু লক্ষ্য আছে। ইহাতে উত্তম মধ্যম অধম বহু প্রকার বিবাহ নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সমুদায়ই

প্রাচীন প্রথা ও তাহা মনুর ব্যবস্থা সম্মত। যে প্রচলিত হিন্দু বিবাহ-রীতির গুণ পূর্ব্বেই উক্ত হইল ; যদি এই বিশুদ্ধ রীতি কাহারো দৃষ্টিতে অবিশুদ্ধ বোধ হয়—যদি ইহার ব্যত্যয় করিয়া অন্য বিধ বিবাহে প্রবৃত্ত হইতে কাহারো একান্ত আগ্রহ হয়, মনুর ব্যবস্থা তাঁহার অনুকূল হইবে। তাঁহার সহিত অন্য লোকের সহানুভূতি না হইতে পারে, কারণ "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" কিন্তু তাঁহার কার্য্য একান্ত শাস্ত্র বহির্ভূত হইবে না—তাঁহাকে হিন্দু সম্প্রদায় চ্যুত হইতে হইবে না। এই রূপ মনোমত বিবাহ করিতে পান না বলিয়া অনেকে হিন্দুদিগকে গালি দিয়া যান—অসভ্য বলিয়া বোধ করেন, তখন সকলের নিকট হিন্দু সভ্য হইবেন।

কিন্তু একটি কথা আছে। কতকগুলি বিবাহ নিয়ম আছে, সেইগুলিকে মনু শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলিয়াছেন, কতকগুলিকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহাদের মর্য্যাদাও স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বিবাহের পরস্পর যেরূপ মর্য্যাদা নিরুপিত আছে, বর্ত্তমান কালে তাহার তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু সেই পর্য্যাদাভেদ চিরকাল থাকিবে। তাহা হিন্দুগণ প্রাণান্তেও ভুলিতে পারিবে না। তাহা হিমাচলের অঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, সমুদায় ভারত-সমুদ্রের জলেও তাহা ধৌত হইবে না।"

বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গবিজেতা—রমেশচন্দ্র দত্ত। বিজ্ঞান রহস্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা বিশেষ উল্লেখ্য বলে সমালোচকের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হল,—"কে বলিল বাঙ্গালীর ভরসা নাই, কে বলিল বাঙ্গালার ভরসা নাই? মিথ্যা কথা। ভরসা আছে; সম্পূর্ণ আছে। হতাশ রাজনীতিজ্ঞগণকে আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা একবার এই গ্রন্থত্রয় পাঠ করেন, পাঠ করিয়া বলুন, বাঙ্গালীর ভরসা আছে কি না? যদি সমস্ত রথ্যাকরের তালিকা দর্শনে বা দণ্ডনীতি শাসনে ব্যাপৃত থাকিয়াও, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র বিজ্ঞান রহস্য জ্ঞান বঙ্গসমাজে প্রচার করিতে, বা রসপূর্ণ সহৃদয়তা প্রকাশক আখ্যায়িকা রচনা করিতে পারেন; যদি হেমচন্দ্র চিরদিন, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কূট ব্যবস্থা জালের গূঢ়ার্থ নিষ্কাশন করিতে, বা মফস্বলের প্রাড়্বিবাকগণের বিচার পত্রের সমালোচন করিতে ব্যস্ত থাকিয়াও, মহাকাব্য বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই, এটি মিথ্যা কথা। বাঙ্গালীর ভরসা আছে। সাহিত্য উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, ও জাতীয় উন্নতি, ইহারা চির:

সঙ্গিনী। যাঁহারা এই সকল উন্নতিতে সংশয়াপন্ন তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে অবনতি মধ্যেও উন্নতি আছে। অধঃপতিত জাতির ক্ষনিক পুনরুত্থানও সুখকর। এই পরিদৃশ্যমান লক্ষণ সমস্ত ক্ষণিকত্ব পরিচায়ক কি না বলিতে পারি না; এইমাত্র বলিতে পারি যে আমরা উন্নতির সূচনা দেখিয়াই, আশা সঞ্চয় করিয়াছি। আশাপূর্ণ হৃদয়ে মুগ্ধ হইয়াছি।

গ্রন্থত্রয় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল। সাধারণীর পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

বৃত্রসংহার হইতে ঃ—

"ধিক দেব। ঘৃণা শূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এতদিন আছ, এই অন্ধতমপুরে;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি।
"ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্যপদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।
"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া?"

উত্তর; —

*** "হে সেনাপতি। এ মণ্ডলী-মাঝে
কোন্ ভীরু আছে হেন ইচ্ছা নাহি করে
অমর আলয় স্বর্গে উদ্ধারি বিক্রমে
স্ববীর্য্য ধরিয়া স্বর্গে পুনঃ প্রবেশিতে?

* * * *

"স্বর্গ অধোদেশে মর্ত্ত্য, দূর নিম্নে তার
অতল গভীর সিন্ধু—তাহার অধঃতে
অন্ধতম পুরী এই পাতাল প্রদেশ
দৈত্য ভয়ে তাহে এবে লুক্কায়িত সবে।

*   *   *   *

"এ কষ্ট অনন্ত কাল যুগ যুগান্তরে
ভুঞ্জিতে হইবে দেবে থাকিলে এখানে,
যতদিন প্রলয়ে না সংহার-বহ্নিতে
অমর আত্মার ধ্বংস হয় পুনর্ব্বার।
"অথবা কপটী হ'য়ে ধরি ছদ্মদেশ
দেবের ঘৃণিত ছল ধূর্ত্ততা প্রকাশি,
ত্রৈলোক্য ভিতরে নিত্য হইবে ভ্রমিতে,
মিথ্যুক বঞ্চক বেশে নিত্য পরবাসী।

*   *   *   *

অথবা প্রকাশ্যভাবে হইবে ভ্রমিতে
চতুর্দ্দশ লোক নিন্দা সহি অবিরত,
শত্রু তিরস্কার অঙ্গে অলঙ্কার করি,
কপালে দাসত্ব চিহ্ন করিয়া অঙ্কিত।
"যখনি ভ্রূকটি করি চাহিবে দানব,
কিম্বা সে অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ উপহাসে
দেখাইবে এই দেব স্বর্গ বিধায়ক,
শত নরকের বহ্নি অন্তর দহিবে।
"অথবা বর্জ্জিত হ'য়ে দেবত্ব আপন
থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প সে যথা,
অসুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর,
অসুর পদাঙ্ক রজঃ শোভিত মস্তকে।
"তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমর বীর্য্য, সমরের স্রোতে
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ

*   *   *   *

"দেবজন্ম লাভ করি অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা হে অমর্ত্ত্যগণ?
দেব অস্ত্রাঘাতে নহে দানব-বিনাশ,

সে দেববিক্রমে তবে কিবা ফলোদয় ?
"নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে ?
দেব কি দানব কিম্বা মানব সন্তানে ?
সাহসে যে পারে তার খণ্ডিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি তাহারি দাস শুন সুপর্ব্বণ।
"ধর শক্তি শক্তি ধর, হও অগ্রসর,
জাঠা, শক্তি, শেল, ভিন্দিপাল, নাগপাশ,
সুরবৃন্দ সুরতেজে কর আকর্ষণ,
অদৃষ্ট খণ্ডন করি সংহার দৈত্যেরে।'

বিজ্ঞান রহস্য হইতে ঃ—

"তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান; বা কেহ মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতিবোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ তাহা মীমাংসা করিবে কে ? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব,—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না। "সর্ব্বজ্ঞ" বা "সিদ্ধ" মানি না, আধুনিক মনুষ্যাপেক্ষা প্রাচীন ঋষিদিগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল, তাহা মানি না— কেননা যাহা অনৈসর্গিক তাহা মানিব না। বরং ইহাই বলি, যে প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকদিগের অধিক জ্ঞানবত্তার সম্ভাবনা। কেননা, কোন বংশে যদি পুরুষানুক্রমে সকলেই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া যায়, তবে প্রপিতামহ অপেক্ষা প্রপৌত্র ধনবান্ হইবে সন্দেহ নাই। তবে, আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এসকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা করিব কি প্রকারে ? প্রমাণানুসারে। যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব। যিনি কেবল আনুমানিক কথা বলিবেন, তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃ পিতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা করিব। দার্শনিকেরা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গ র মধ্যে ঘ আছে ইত্যাদি। তাঁহারা তাহার কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন না ; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত কথা বলেন না, সন্ধান করিলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কখন প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন, সে

প্রমাণও আনুমাণিক বা কাল্পনিক, তাহার আবার প্রমাণের প্রয়োজন, তাহাও পাওয়া যায় না। অতএব আজন্ম মূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, সেও ভাল, তথাপি দর্শন মানিব না। এদিকে বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিতেছে, 'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস করিতে বলি না। যে সহসা বিশ্বাস করে, আমি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করি না ; সে যেন আমার কাছে আইসে না। আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিব ; তুমি তাহাই বিশ্বাস করিও, তাহার তিলার্দ্ধ অধিক বিশ্বাস করিলে তুমি আমার ত্যজ্য। আমি যে প্রমাণ দিব, তাহা প্রত্যক্ষ। একজনে সকল কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি তোমাকে অন্যের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু যেটিতে তোমার সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিও। সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ করিলেই, সে ভস্ম হইয়া যায়, কিন্তু সন্দেহেই আমার পুষ্টি। আমি জীবশরীর সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ গৃহে ও রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় আইস। সকলই প্রত্যক্ষ দেখাইব। এইরূপ অভিহিত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে গিয়া সকলই প্রমাণ সহিত দেখিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বিজ্ঞানেই আমাদের বিশ্বাস।"

বঙ্গবিজেতা হইতে :—

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় উদার চরিত্র পুরুষ ছিলেন। স্বার্থ সাধনে এতদূর বিমুখ, যে অনেক সময়ে লোকে তাহাকে পাগল বলিত,—স্বার্থ সাধনে তৎপর হইলেই লোক জগতে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবান জমীদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না,—উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল বাসিতেন, কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন ;—সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভী সকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞান শুণ্যতায় দোষ শুণ্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন, দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যুগ যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেন,—অমুক গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন হইতেছে, অমুক গ্রামে ধান্য দুর্মূল্য

হইতেছে ;—এ স্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক ; ওস্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী ; সুরেন্দ্রনাথ এসকল কথাই আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধন মর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেন ; আপন কুল গৌরব বিস্মৃত হইতেন ;—সেই ধান্যক্ষেত্র বেষ্টিত, আম্রকানন শোভিত কুটীরাবলি-নিবাসীদিগকে, আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন। এরূপ লোককে সকলেই পাগল বলিবে না ত কি ?

অন্যস্থান হইতে ঃ—

"বাহিরের কক্ষ অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহতল অতি সুচারু চিত্রশোভিত বস্ত্রে মণ্ডিত, প্রতি দ্বারে, প্রতি বাতায়নে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে ; স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে ; সম্মুখে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ দীপ জ্বলিতেছে ; দীপের চতুঃপার্শ্বে আবার পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপবেশন স্থান মহার্হ রক্ত বস্ত্রে মণ্ডিত, সেই সুন্দর কক্ষে, সেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত, মহাধন সম্পন্ন রাজাধিরাজ দেওয়ান সতীশচন্দ্র আজি বিষণ্ণ বদন কেন ? পাপের প্রায়শ্চিত্ত !

পাঠক মহাশয় যদি "বিষয়ী" লোক হয়েন, বলুন দেখি, লোকে আপনাকে যেরূপ সুখী মনে করে, আপনি যথার্থ ই কি সেইরূপ সুখ ভোগ করেন ? বলুন দেখি, জগৎ সংসারের সুখ বর্দ্ধন করিয়া উদার চরিত্র লোকে যেরূপ সুখ সম্ভোগ করেন, আপনার ধন সঞ্চয়ে কি সেই প্রকার নির্মল সুখ লাভ হয় ? প্রেম পাত্রের মুখাবলোকন করিয়া প্রেমিকের হৃদয় যেরূপ উল্লসিত হয়, প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিলে কবির অন্তঃকরণ যেরূপ আনন্দিত হয়, উচ্চ পদ লাভে কি আপনার মন সেইরূপ উল্লাস প্রাপ্ত হয়,—কাব্য রসে বা বান্ধব সদালাপে অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হয়, কেবল ধন সঞ্চয় হৃদয়ের কি সেরূপ জন্মে ? যদি না হয়, তবে দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে কেবল ধন সঞ্চয়ে কেন বিব্রত রহিয়াছেন ?—তদপেক্ষা মহত্তর সুখে কেন একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন ? আর যদি হয়. তবে বলুন, আমরাও "বিষয়ী" লোক হইবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

পাঠক মহাশয় যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন,—যদি কখন অর্থের আবাস স্থানকে সুখের আবাস স্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া

মন শান্ত করি,—লোভ দূর করি।" (১২৮১—১লা চৈত্র)

'চীনের ইতিহাস' (১২৮০, অগ্রহায়ণ) কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে আদর্শ গদ্য রচনাভঙ্গি বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের নির্দেশ :—"ঐরূপ অভ্রাড়ম্বর—ব্যাঘ্রাড়ম্বর ঘটাড়ম্বর-সাজে—দক্ষিণ মাদল ঘর্ঘর-বাজে, ভাষায় লিখিতে হইলে কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থকার সকল স্থানে তাহা করেন নাই, করিলে গ্রন্থের কোন প্রশংসা করিতাম না। কিন্তু তা তাঁর 'ঘটাড়ম্বরের' দিকে একটু টান আছে, ইতিহাস গ্রন্থে রচনা যত বিশদ ও প্রাঞ্জল হয় ততই ভাল, ভরসা করি ইতিহাস লেখকেরা ও আমাদের গ্রন্থকারেরা ভবিষ্যতে এরূপ ভাষার অনুকরণ করিবেন না।"

'ঐতিহাসিক রহস্য' (১২৮১, জ্যৈষ্ঠ—১ম ভাগ,)-র রচয়িতা রামদাস সেন। রামদাস সেন বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর লেখক, অক্ষয়চন্দ্রেরও সুহৃদ। তবে দু'একটি বিষয়ে তিনি মতভেদ প্রকাশ করেছেন।

'দ্বিতীয় প্রস্তাব মহাকবি কালিদাস বিষয়ে। এই ভাগে গ্রন্থকার সমধিক পাণ্ডিত্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সকল কথায় আমাদের একমত না হউক, ভাওদাজির ও তাঁহার কথা স্থূলতঃ আমরা বিশ্বাস করি। ও পাঠককে অনুরোধ করি তাঁহার গ্রন্থের এই ভাগটি যত্নপূর্বক পাঠ করেন। আমরা কিঞ্চিৎ সারাংশ প্রদান করিতেছি।

"রাজতরঙ্গিনীতে লিখিত আছে। খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামে জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এবং শত বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত হয়েন। এই মাতৃগুপ্ত কালিদাস।

প্রমাণ :—"এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করেন, মাতৃগুপ্ত কালিদাস হইলে এই প্রবাদ সমূলক হয়।"

"তাহার পর বররুচি। বররুচি দুইজন। পাণিনিক ব্যাকরণের বার্ত্তিক কার কাত্যায়ন বররুচি এবং "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ কার বররুচি। প্রথম বররুচি যখন বার্ত্তিক লেখেন তখন প্রাকৃত ভাষা, ভাষা বলিয়া গণ্য হয় নাই। সুতরাং এই দুই বররুচি মধ্যে বোধ হয় সহস্র বৎসরের ব্যবধান আছে। রামদাস বাবু বলেন 'আচার্য্য গোল্ড ষ্টুকরের মতে তিনি (অর্থাৎ কাত্যায়ন বররুচি), পতঞ্জলির সমসাময়িক এবং ১৪০ ও ১২০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে

বর্ত্তমান ছিলেন।" এই স্থলে রামদাস বাবু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আচার্য্য কোন স্থলেই বার্ত্তিকার এবং মহাভাষ্যকারকে সমসাময়িক বলেন নাই। বরঞ্চ পতঞ্জলি, যে কাত্যায়নের বহুকাল পরে তাহাই প্রতীত হয়।"

যেহেতু রামদাস সেনের সিদ্ধান্ত এবং আলোচনা পদ্ধতি সম্পর্কে অক্ষয়চন্দ্র অনেকগুলি সুপারিশ করেন, তাই গ্রন্থকারেরও এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য পত্রাকারে 'সাধারণী'তে প্রকাশিত হয়।

॥ ঐতিহাসিক রহস্য : সমালোচনার প্রতিবাদ ॥

সবিনয় নিবেদন মিদং,

আপনার গত সপ্তাহের সাধারণীতে আমার কৃত ঐতিহাসিক রহস্যের একটি সুদীর্ঘ সমালোচন প্রকাশ করাতে যাহার পর নাই বাধিত হইলাম। আপনার ন্যায় সুযোগ্য সম্পাদকের অভিপ্রায় বহুমূল্য জ্ঞান করি। এই সমালোচন মধ্যে যে ক-একটি কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর নিম্নে প্রদান করিতেছি। অনুগ্রহপূর্বক সাধারণীতে অচিরে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। ভট্ট মোক্ষমূলর যে বৈদিককাল নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই আমি গ্রহণ করিয়াছি, ইহা ভ্রমাত্মক হইতেও পারে, কেননা এসকল বিষয়ের যথার্থ কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে, ও তাহা করিবারও কোন বিশেষ সুবিধা নাই। গোল্ডষ্টুয়ার মোক্ষমূলারের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত বিদ্যা বিশারদ হগ মহোদয় বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ খ্রীষ্ট জন্মাইবার ২৪০০ হইতে ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে লিখিয়াছেন। এইরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পরস্পরের মত বিভিন্ন।

ঐতিহাসিক রহস্যের মধ্যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন সকল প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিকা ভাগ মাত্র; তাহার মধ্যে সুবিখ্যাত নৃপতিগণের বিবরণ সংক্ষেপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে এবং তাহাতেই অশোকের প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বৌদ্ধদেবের বিবরণে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব রচিত হইবে বলিয়াই, তদ্বিষয় কেবল উল্লেখ মাত্র করিয়াছি, নতুবা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ সমুদয় সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা কি?

এই প্রস্তাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুসারে বিক্রমাদিত্যের কাল নিরূপণ করিয়াছি, এজন্য তাহা ভ্রমাত্মক হইলেও সংশোধন করা হয় নাই। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের বিষয়ে তাহার বিশেষ রূপ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

২। কাত্যায়ন বররুচি পাণিনির বার্ত্তিক কর্ত্তা এবং বিক্রমের বররুচি প্রাকৃত প্রকাশ প্রণেতা। ইঁহারা দুইজন বিভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট লিখিয়াছি, সুতরাং তাহাতে আমার কোন ভ্রম হয় নাই। আপনি লিখিয়াছেন আচার্য্য গোল্ডষ্টুয়ার কোন স্থলেই কাত্যায়ন বররুচিকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সমসাময়িক বলেন নাই, এ কথায় আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবেক। কেননা তিনি "Royal Asiatic Society" ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের অধিবেশনে, কাত্যায়ন বররুচিকে বৈয়াকরণ পতঞ্জলির সমকালিক স্থির করিয়া একটি অতি সারবান্ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আপনি পাঠ করিলেই আমার কথা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বোধ হইবেক।

নিবেদন ইতি। ৬ই জ্যৈষ্ঠ

একান্ত অনুগত

শ্রীরামদাস সেন (সাধারণী ১২৮:—১১ই জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৭১)

বহরমপুর

বঙ্গদর্শনে গ্রন্থখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, "এই গ্রন্থে কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। যথা ১) ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন, ২) মহাকবি কালিদাস, ৩) বররুচি, ৪) শ্রীহর্ষ, ৫) হেমচন্দ্র, ৬) হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, ৭) বেদপ্রচার, ৮) গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-বৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ৯) শ্রীমদ্ভাগবত, ১০) ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র। এবং একটি পরিশিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবতবিষয়ক প্রবন্ধটি রহস্যসন্দর্ভ হইতে পুনর্মুদ্রিত, এবং অবশিষ্ট সকলগুলিই বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অল্পাংশ ভিন্ন এই গ্রন্থ বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত বলিয়া আমরা ইহার সবিশেষ সমালোচনা হইতে বিরত হইলাম। কেননা, ইহার প্রশংসা করিলে একপ্রকার আত্মপ্রশংসা করিতে হয়। বিশেষ, এই সকল প্রবন্ধ প্রথমে এই পত্রের সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত হয়।

তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রামদাস বাবু একজন বিখ্যাত লেখক এবং পুরাবৃত্তবেত্তা। এবং এই সকল প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হইল।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থ সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববেত্তা "ভট্ট মোক্ষমূলর"কে উপহার প্রদান করিয়াছেন।"(১২৮১, জ্যৈষ্ঠ)

পত্রাবলী : অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখিত

নীচে অক্ষয়চন্দ্রকে লিখিত কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধৃত হল। এগুলির মধ্যে প্রথমটি ও চতুর্থটি মাত্র 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার (প্রথমার্ধ)'—এর ২৪ ও ৪১ পৃষ্ঠায় আংশিকভাবে স্থান পেয়েছে। সেযুগের সাহিত্যিক যতীন্দ্রমোহন সিংহ* চুয়াডাঙ্গা থেকে ১৩১৪ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তাঁকে যে-চিঠি লেখেন সেটি এখানে দেওয়া হল। এটি যতীন্দ্রমোহনের শ্রদ্ধার নিদর্শন। পক্ষান্তরে অক্ষয়চন্দ্র সমালোচক হিসেবে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এই চিঠিখানিতে তারও প্রমাণ আছে।

চুয়াডাঙ্গা

১. ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১৪

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণম্

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

নমস্কার পূর্ব্বক বিনীত নিবেদন। আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি ধ্রুবতারা পাঠ করিয়াছেন জানিয়া অনুগৃহীত হইলাম। পুস্তক সম্বন্ধে আপনার বিস্তৃত মতামত জানিবার জন্য উৎসুক আছি। তাহা আপনার অবসর মত জানাইবেন। আর যদি বঙ্গবাসী কিংবা অন্য কোন কাগজে "উড়িষ্যার চিত্র" ও ইহার সমালোচনা করা যায় উপযুক্ত বোধ করেন তবে তাহা করিবেন। এই পুস্তকে যে সকল দোষ দেখেন, তাহা আমাকে সরলভাবে জানাইবেন, তাহাতে কিছু মাত্র দ্বিধা করিবেন না। আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী সমালোচকের নিকট আমার অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। এখন আমার লেখার দোষ জানিতে পারিলে আমি ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারিব।

---

* 'উড়িষ্যার চিত্র' ও ধ্রুবতারা' যতীন্দ্রমোহনের.গ্রন্থ।

ধ্রুবতারার পুণ্যচিত্র কিছু কম হইয়াছে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজে পুণ্যবান চরিত্রই বিরল হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং সমাজের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে পুণ্যচিত্র কম হইবার কথা। তবে যেমন পাপ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সবগুলি আমার জ্ঞানকৃত নাও হইতে পারে। যেমন "চারুলতা" চরিত্র সম্বন্ধে পাঠকগণ দুই মত প্রকাশ করিতেছেন। আমি এই চরিত্রটিকে পাপ চরিত্র মনে করিয়া তাকে অঙ্কিত করি নাই, কিন্তু এতদ্ভিন্ন "দত্তমহাশয়", "রেবা" "সতীসাধ্বী বনলতা", "বিদ্যানিধি মহাশয়", "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়", বীরেন, বীরেনের স্ত্রী ইহারা সকলেই সচ্চরিত্র, বোধ হয়, এবিষয়ে মতদ্বৈধ হইবে না। ইহাদের দ্বারা কি অন্যগুলির ক্ষতিপূরণ হইবে না। আর আলোর পাশে ছায়া না থাকিলে আলো ফুটিবে কেন? ছায়া দ্বারা আলোরই গৌরব বৃদ্ধি হয়। মহাশয় আমার এই কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। "ধ্রুবতারা" "উড়িষ্যার চিত্রের" মতন হয় নাই লিখিয়াছেন, আমার কিন্তু অন্যরূপ ধারণা ছিল। উড়িষ্যার চিত্রে চরিত্রের বিকাশ নাই, এখানিতে কয়েকটি চরিত্রের বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। বোধ হয় এবিষয়ে আমার উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিচারক।

আশাকরি আপনি কুশলে আছেন। আপনাকে বারংবার বিরক্ত করিতেছি, সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। নিবেদন ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

নীচের দুটি চিঠি সহধর্মিণী সৌদামিনী দেবীর। একটি ১৭ই ফাল্গুন এবং অপরটি ২৪শে ফাল্গুন লিখিত। প্রথম পত্রটি 'লীলাবতী'* নাটকাভিনয় প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয়টি লক্ষ্মীপূজা সম্বন্ধে লিখিত। প্রথমটির প্রত্যুত্তর অক্ষয়চন্দ্র ৭-৩-৭২ সালে দিয়েছিলেন। পত্রখানি নিম্নরূপ।

২.

কালরাত্রে তোমাদের থিয়েটার সাজঘরে আমার কাছ থেকে দুইটা কাঁচুলি লইয়া গিয়াছিল। এইবার তুমি আসিলে অভিনয় হইবে। আমরা দেখিতে

* ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' নাটক অভিনীত হয়েছিল। পত্রটি সেই উপলক্ষে লিখিত।

পাইব ত। না দেখিতে পাবনা আমাকে লিখিবেন। * * * (নষ্ট) বিশ্বাস. করি না।

বসন্তের পূজার পর প্রতিমা বিশর্জন দেবে ত না বারমাস পূজা করিবে? বাড়ীতে আসিয়া বুঝিয়ে দেবে বলিয়াছ। মাঘ মাসের মতন তো আসিবেন না। মায়ের জ্বর ভাল হইয়াছে।

ইতি—

তারিখ ১৭ই ফানুগুন

তোমার শ্রীমতী সৌদামিনী

৩.

২৪শে ফাল্গুন তারিখের পত্র,

তোমার মায়ের বসন্তে লক্ষ্মীপূজোর বাই হলো। চৈত্র মাসে লোকে তো লক্ষ্মী পূজাই করিয়া থাকে। এবার আবার চৈত্র মাসে দোল হইল। মদনমোহন চতুর্দোলে উঠিবেন ভালই ত হইয়াছে।

শ্যামবাবুর কথা কাল লিখিব এখানে সকলে ভাল আছেন।

ইতি—

তারিখ-২৪এ ফানুগুন

তোমার শ্রীমতী সৌদামিনী

চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উদ্ধৃত চিঠি দু'খানি পাঠ করলে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অক্ষয়চন্দ্র চন্দ্রনাথকে 'দাদা' সম্বোধন করতেন এবং চন্দ্রনাথও তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

৪নং চিঠিতে অক্ষয়চন্দ্রের 'পিতাপুত্র' গ্রন্থ প্রসঙ্গে অতি উদার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। পত্রটি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। চন্দ্রনাথ ২৩শে কার্ত্তিক ১৩১১ সালে কলিকাতা থেকে এটি লিখেছিলেন। 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার'-এ (প্রথমার্ধ) এটির অংশমাত্র ছেদ ঘটায়, এখানে পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত করা হোল।

দ্বিতীয় চিঠি ২২শে পৌষ ১৩০২ সালে বৈদ্যনাথ—দেওঘর থেকে লেখা। পত্রের বিষয়বস্তু একান্ত ব্যক্তিগত।

৪.

কলিকাতা

ভায়া, ২৩শে কার্তিক ১৩১১

আমার বিজয়ার নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিও এবং বালক বালিকা-দিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও।

নাতনীটি ভাত পাইয়াছে কি? আমার বাড়ীতেও অসুখ। হরনাথের দুইবার ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। এখন ভাল আছে। আবার হইবে কিনা কে বলিবে। ছোট ছেলেটির জ্বর ও কাসি। কবিরাজী চিকিৎসা হইতেছে। আর আর ভাল।

এমন অপূর্ব্ব পিতাপুত্র আমি দেখি নাই। আমাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ বড় গাঢ়। কিন্তু আমাদের মধ্যেও এমন পিতাপুত্র দেখি নাই। পিতা পিতা বটেন, অথচ যেন পুত্র। পুত্র পুত্র বটেন, অথচ যেন পিতা। পিতা পিতা বটেন, অথচ যেন ভাই। পুত্রও পুত্র বটেন, অথচ যেন ভাই। পিতা পিতা বটেন, অথচ যেন বয়স্য। পুত্রও পুত্র বটেন, অথচ যেন বয়স্য। পিতা পিতা বটেন, অথচ কি নহেন তাহা বলিতে পারিনা,—হাড়ে হাড়ে বুঝি যেন সবই। পুত্রও পুত্র বটেন, অথচ কি নহেন তাহা বলিতে পারি না,—হাড়ে হাড়ে বুঝি যেন সবই। পুত্র পিতাকে ভক্তি করেন, পিতাও পুত্রকে ভক্তি করেন। পিতাপুত্রের এরূপ মিশ্রণ আমি আর দেখি নাই। এরূপ অপূর্ব মিশ্রণ দেখি—ঠিক কথা বলিব—হাসিও না—দেবতার মধ্যে, হরগৌরীতে, কৃষ্ণকালীতে, কৃষ্ণরাধায়। পিতাপুত্রের এরূপ মিশ্রণ মনুষ্য-মধ্যে একটা ঘটনা। এরূপ ঘটনার তোমার লিখিত কাহিনী মানব-সাহিত্যে বোধ হয় আর নাই। জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মকাহিনীতে বাপের গৌরব দেখি। কিন্তু পুত্র অক্ষয়ের পিতা গঙ্গাচরণের কথার সহিত তুলনায় তাহা উল্লেখযোগ্যই নয়। "পিতাপুত্র"-এ বাঙ্গলা সাহিত্য অতুলনীয় সামগ্রী পাইয়াছে এবং বাঙ্গালী জীবনপথে অমূল্য আদর্শ লভিয়াছে।

সুখ্যাতি করিতে বারণ করিয়াছ। তাই সুখ্যাতি করিলাম না। সত্যমাত্র জ্ঞাপন করিলাম।

তোমার দাদা

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

৫.

বৈদ্যনাথ—দেওঘর

ভাই হে,

২২শে পৌষ, ১৩০২

আমার পরশ্ব যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এমন কি রিজার্ভের বন্দোবস্তও হইয়াছে। আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। ২৪শে ও ২৮শের মধ্যে ভাল দিনও নাই। কাল একান্ত না পার, পরশ্ব অতি অবশ্য আসিও। শিশিরবাবুও বিলম্ব করিতে পারিতেছেন না। তোমার ছেলেগুলিকে রাখিয়া যাইতে আমাদের বড় কষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি যদি মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালেও আস তাহা হইলে আমাদের ভাবনার কারণ থাকিবে না।

ইতি—

তোমার দাদা শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দেবশর্মা), শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু ও হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্রগুলি উল্লেখ করা হ'ল।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

৬.

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন,

দাদা, আমি অপদার্থ, তা তুমি জানো। তবু তুমি যাহা বলিবে, সবিশেষ উপদেশ পাইলে তাহা করিবার চেষ্টা করিব। ৺পূজার পর তুমি একবার এখানে তো আসিবে, তখনই পথ দেখাইয়া দিও, আমা হইতে যাহা হইবে, করিব। ভাল কথারই সূচনা করিয়াছ।

কয়দিন মনে করিতেছিলাম, তোমাকে পত্র লিখি। তোমাদের খবর না পাইয়া মনটা কেমন করিতেছিল।

সতীন্দ্র বাড়ীতেই আছে, অতীন্দ্র কুঠী গিয়াছে সেখান হইতে বর্ধমান কলিকাতা ঘুরিয়া বাড়ী আসিবে।

এখানকার উপস্থিত ভাল। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি—

১৩১৩, ২৪শে ভাদ্র

ইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা

গঙ্গাটিকুরী

৭. বৈদ্যনাথ—দেওঘর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সারদাবাবুর বাটীতে ভাড়াটিয়া আছে। আপনার বাটী ৮ মাস অবধি ভাড়া আছে। আপনার ভাড়াটিয়া বোধ হয় তাহার পরেও থাকিবেন। শিশিরবাবুর নূতন বাটী খালি আছে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

৮.

শ্রীরামঃশরণং ভাটপাড়া

১১ই ফাল্গুন, ১৩১৯

৭ স্বস্তি শ্রীমৎসু অভিন্ন হৃদয়বন্ধুপ্রবরেষু

শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিজ্ঞাপনমেতৎ—

সম্প্রতি কাগজপত্রে আপনি চট্টগ্রামসাহিত্য সম্মেলনীর, সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। চট্টগ্রামেই যদি যাইতে পারেন, তবে গঙ্গা পার হইয়া একদিন আমার বাটীতে আসা আপনার পক্ষে বিশেষ ক্লেশকর হইবে না এই মনে করিয়া আপনাকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিতেছি। ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান ভবভূতি ভট্টাচার্য্যের শুভবিবাহ বসিরহাটের নিকট দড়িহাট গ্রামে হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। ১৪ই বুধবার দ্বিপ্রহরের পর আমরা বর পাত্র লইয়া সেইখানে যাত্রা করিব,—১৭ই সেইখান হইতে বাটীতে আসিব। ১৮ই রবিবার অথবা তৎপরদিন সোমবার আপনি যদি পুত্রদিগকে লইয়া এই বাটীতে আগমন করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব, একথা লেখা বাহুল্য। সোমবারের কথা বলিলাম এই জন্য যে ঐ দিবস ডাক্তার নন্দী এখানে আসিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। * * * (নষ্ট)

হৃষীকেশ শাস্ত্রী

নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি মানসী প্রেসের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা। তিনি অক্ষয়চন্দ্রকে পরবর্তী বৈশাখ সংখ্যায় যাতে পাঠকবৃন্দ পাঠ করে পরম

সন্তোষ লাভ করতে পারেন এমন পাঠোপযোগী লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে লিখেছেন।

MANASI PRESS

৯. 14A, Ramtanu Bose Lane.

Calcutta

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩২৩

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। আপনার আদেশ অনুসারে আগামীকল্যই ফটোখানিতে ব্লক করিতে দিব এবং ব্লক হইয়া গেলেই, ফটোখানি রেজিষ্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাইব। কিন্তু দোহাই আপনার, মোটে একপৃষ্ঠা লেখা দিবেন না,—অন্ততঃ ৪।৫ পৃষ্ঠা দিন। চৈত্র সংখ্যায় আমরা ঘোষণা করিয়া দিব যে, বৈশাখ সংখ্যায় আপনার লেখা ছাপা হইবে।

পাঠকরা বড় আশা করিয়া, বৈশাখ সংখ্যা খুলিয়া, যদিমাত্র একপৃষ্ঠা পায়, তবে পেট ভরিল না বলিয়া গালি দিতে থাকিবে। পেট ভরা না দেন, অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় এমন দিবেন—একপৃষ্ঠা ত মুখেই মিলাইয়া যাইবে, গলার নিম্নে নামিবে না।

ভবদীয়—

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

তৎকালীন তিনজন মহিলা সাহিত্যিক পত্রের মাধ্যমে অক্ষয়চন্দ্রের প্রতি তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। এই তিনজন লেখিকা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, মানকুমারী দাসী ও অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা। তিনখানি পত্রই পোষ্ট কার্ডে লেখা।

১০. S. Ghosol.

44, Old Ballyganj Road

সবিনয় নিবেদন, 19.11...

আপনাদিগের পত্র হইতে বুঝিতে পারিতেছি আপনারা কেহ কেহ আগামী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে আমাকে সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার অভিলাষ পোষণ করেন। * * * (নষ্ট) ইহা হইতে আমার প্রতি আপনাদিগের

যে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্মানভাব প্রকাশিত হইতেছে তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আপনারা সকলেই জানেন আমাদের দেশের কোন মহিলার এই আসন গ্রহণ করার পক্ষে কিরূপ অন্তরায় বিদ্যমান এবং সেই বাধাবিঘ্ন দূরে ঠেলিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা *** (নষ্ট) কিরূপ *** (নষ্ট) তবে আমি মনে করি, আমাদের পক্ষে *** (নষ্ট) সে বিবেচনার সময় এখনও আসে নাই। অভ্যর্থনা সমিতি যদি উক্ত পদ গ্রহণ জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেন তখনই আমার এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আপনাদিগকে জানাইবার সময় আসিবে।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রোত্তর দিবার কিছু বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিনীতা—

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীদুর্গাসহায়

১১.

সাগরদাঁড়ি

৩রা ফাল্গুন

শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম শতকোটি নিবেদন—

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা যথাসময়ে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে (একমাত্র সন্তান) আমার কন্যাটি আজি ১৫দিন প্রবল পীড়ায় শয্যাগতা। তাহার বিছানা ছাড়িয়া একদণ্ড আমার উঠিবার সাধ্য নাই। সেইজন্য আমার প্রবন্ধ লিখিবার অবকাশ হইতেছে না। ইহাতে আমার মনেও একটি বিশেষ ক্ষোভ রহিল। যদি ভগবানের কৃপায় আমার কন্যাটি সুস্থ হয়, তবে ১৫ই ১৬ই ফাল্গুন মধ্যে "পরার্থপরতা" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিলে আপনি গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা লিখিতে আজ্ঞা হইবে।

নিবেদনমিতি—

প্রণতা—

শ্রীমানকুমারী দাসী

১২.

শ্রীহট্ট

৮ই ফেব্রুয়ারী

১৯১২ ইং

মহাশয়,

আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া সমুদয় অবগত হইলাম। আপনি যে অনুগ্রহ করিয়া আমার লিখিত কোন প্রবন্ধ সম্মেলনীতে পাঠ করিতে চাহিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বঙ্গদেশে "নারী জাতির শিক্ষাবিস্তারের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি, এ বিষয়ে মহাশয়ের মতামত কি অবিলম্বে জানাইলে বড়ই উপকৃত হইব— আর সময় নাই। নিবেদন ইতি—

অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা

বান্ধব পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় অক্ষয়চন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই ভাবটি অতি সুপরিস্ফুট।

১৩.

শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্

ঢাকা, বান্ধবকুটীর

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০

বহুবিনয়সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমিদম্,

অনেকদিনের পর আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া বাধিত হইয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব ঘটিয়াছে। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। আমি নানারূপ উদ্বেগে আছি তাহা জানেন। কিন্তু এই উদ্বেগের উপর অতিরিক্ত উদ্বেগ গ্রীষ্মাতিশয্য। আমি গ্রীষ্ম একবারেই সহ্য করিতে পারি না। গ্রীষ্মের সময় নিরন্তর পাখার নিচে থাকিয়াও জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাই। কিন্তু এবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ঢাকায় কিরূপ গ্রীষ্ম পড়িয়াছে এবং এখনও পড়িতেছে তাহা আমি আপনাকে লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমরা এদেশে পঁচিশ বৎসরেও এমন ভয়ঙ্কর প্রাণান্ত গ্রীষ্মের পরিচয় পাই নাই। এখানে প্রকৃতই দুই একটি লোক—দুগ্ধবাহী গোয়ালা—দুপুর বেলায় রাস্তায় পড়িয়া দাপাইয়া মরিয়াছে। এ গ্রীষ্মে

আপনারা কলিকাতায় কেমন আছেন তাহা জগদীশ্বর জানেন।

"বঙ্গবাসী"-র নূতন উপহার পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছি। ভরসা করি গত সন যেমন বিবিধ আশ্চর্য্য বস্তু উপহার পাইয়াছি এবারও তেমনই পাইব।

পাঁচালির পণ্ডিত দাশুরায় আপনার হাতে তরিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ, মধুকান ও বদন অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালা এবং হরুঠাকুর, মাধব ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালার প্রতি কি আপনার দৃষ্টি পড়িবে না? ইঁহারা সকলেই প্রতিভান্বিত পুরুষ; এবং আমার ভরসা আছে ইঁহারা আপনার অনুগ্রহে বঙ্গীয় সাহিত্যে স্থায়ী আসন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

সেদিন যে পঁচাত্তর খানা (৭৫) বঙ্গবাসী পাঠাইয়াছিলেন তাহা তৎক্ষণাৎই আমার একটি পিয়নের যত্নে বিক্রয় হইয়াছে এবং দুই টাকা ছয় আনা তিন পয়সা আপনার নামে জমা হইয়া রহিয়াছে। পরীক্ষার ফল সংক্রান্ত কাগজ সেসময় পাঁচশত আসিলেও বোধ হয় বিক্রীত হইত। বিক্রেতাকে সামান্য কিছু কমিশন দিতে ইচ্ছা হইলে উপদেশ করিবেন, নচেৎ সমস্ত টাকা মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইব।

"হিতবাদী"-র উপহার—রমেশ দত্তের গ্রন্থাবলী আপনি অল্পে কিনিয়া আমাকে দিতে পারেন কি?

আপনার নিকট আর একটি গুরুতর কথা লিখিতেছি। কলিকাতায় কায়স্থসভা হইতে বাবু রমানাথ ঘোষ ও মাননীয় বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ আমাকে তথায় যাইবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন। বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ আমার অবস্থান জন্য তাঁহার ভবানীপুরের বাড়ীর এক অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার উপদেশের উপর নির্ভর করি। যদি আমার যাওয়া আপনার নিকট সকলদিকে সুসঙ্গত জ্ঞান হয় তাহা হইলে দয়া করিয়া অবশ্যই একটা টেলিগ্রাম করিবেন। টেলিগ্রামের টাকা ও বঙ্গবাসীর টাকা এক সঙ্গে পাঠাইয়া দিব। টেলিগ্রাম না পাইলে বুঝিব আমার যাওয়া আপনার অভিপ্রেত নহে। পত্রোত্তরে নিজ কুশল জ্ঞাপনে বাধিত করিবেন, একেবারে ভুলিয়া যাইবেন না।

নিবেদন ইতি—চির-অনুগত

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

১৪. 302, Upper Circular Road
Calcutta
যথোচিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনামিদং The 28-2-1912

আগামী সাহিত্য সম্মিলনে এতৎসহ গ্রথিত তালিকানুযায়ী নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিলে বিশেষ সুখী ও বাধিত হইব।

ইতি—
একান্ত বশংবদ
শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী

১৫.
The Bangobasi office 88-2, Bhawani ch. Dutta Street
Calcutta

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

শ্রীচরণেষু,

আপনার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া পুলকিত হইলাম। আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটিল। এখানে হরিমোহন বাবু এবং সত্যেন্দ্রবাবু অসুস্থ ও অনুপস্থিত, সুতরাং আমি একা। সমস্ত কাজের ভার আমার উপর। সময়ের অভাব। অধিকন্তু আমার শরীরও ভাল নয়। হরিমোহন বাবু এবং সত্যেন্দ্র বাবু উপস্থিত থাকিলে, আমি এ শরীরেও আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সভার কার্য্যে যোগ দিতাম, কিন্তু উপায় নাই। আশা করি, আপনি নিজগুণে আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি—তাং ৪ঠা মাঘ, ১৩১৮
প্রণত
শ্রীবিহারীলাল সরকার

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'মানব-বন্দনা' একটি বিখ্যাত কবিতা। এটি যে অক্ষয়চন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী রচিত হয়েছিল, এখানে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

১৬. ৭ই ফাল্গুন, ১৩১৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার আদেশানুযায়ী একটি কবিতা লিখিয়াছি। নাম "মানব বন্দনা"। ইহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা কোনরূপ ব্যক্তিগত আলোচনা করি নাই। আমি মানবের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া মানবজাতিকে বন্দনা করিয়াছি। এবং কবিতাটী শতাধিক ছত্র মাত্র।

যেদিনে পড়া হইলে ভাল হয়, সে বন্দোবস্তের ভার আপনার উপর রহিল।

ভরসা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন।

ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রী অক্ষয়কুমার বড়াল

১৭

কলিকাতা

৭১।১, সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, ৭ই ফাল্গুন, ১৩১৮

আপনার ২৭ই পৌষের অনুগ্রহ লিপির উত্তর এতদিন দিতে না পারিয়া আপনার নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী আছি। নিজগুণে যদি আমায় ক্ষমা করেন, এক্ষণে এইমাত্র ভরসা।

একাধিক পারিবারিক দুর্ঘটনায় যেরূপ মানসিক কষ্টে ও তদুপরি অসুস্থ দেহে দিনযাপন করিতেছি তাহাতে সাহিত্য সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না—তদ্ভিন্ন আমার যোগ্যতাও অতি সামান্য। আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন।

সম্মেলনস্থলে উপস্থিত হইয়া, আপনার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

বিনয়াবনত

শ্রীসখারাম গণেশ দেউসকার

অক্ষয়চন্দ্রের ঘরোয়া দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ প্রাণতা ফুটে উঠেছে নিম্নে বর্ণিত চিঠিগুলির মধ্যে। এখানে সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্রের ব্যক্তি মনের পরিচয় অতি

সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ৩ সংখ্যক চিঠির সঙ্গে ২৩ সংখ্যক চিঠির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১৮.

শ্রীশ্রীঈশ্বর শনিবার

সৌদামিনী,

আমি কি করিলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তা তুমি পত্রের দ্বারা বলিতে পারিবে না দেখা হলে বলিবে বলিয়াছ, কিন্তু তুমি কি করিলে আমি সুখী হই তা আমি বলিব? শুনিবে? তা আমি অতি অল্প কথায় বলিতে পারি, পত্রের দ্বারা বলিতে পারি, ডাকে বলিতে পারি, টেলিগ্রাফে বলিতে পারি, সকলের সাক্ষাতে বলিতে পারি, নির্জনে বলিতে পারি, অতি উচ্চরবে বলিতে পারি, অতি মৃদুস্বরে বলিতে পারি, সে কথা বলিতে আমার লজ্জা হয় না—আমি কুণ্ঠিত হই না সে কথা তোমাকে আমি কতদিন বলিয়াছি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি, আবার আজ স্পষ্ট করিয়া বলিব? কিসে আমি সুখী হই—তুমি ভাল বাসিলে। তুমি বলিবে তবে কি আমি তোমাকে ভাল বাসি না? আমি বলি বাস,—কিন্তু যতদূর ভালবাসিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ততদূর ভাল বাস না। কেমন করে জানিলাম বুঝাইয়া দিব। দি—আমি যখন তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম আমি কি করিলে তুমি ভাল থাক? তুমি যদি আমার পূর্ণ ভালবাসা বাসিতে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইলে লিখিতে তুমি ভালবাসিলে। "পত্রের দ্বারা লিখিতে পারি না যদি কখন দেখা হয় তাহা হইলে বলিব" এমন কথা কখন লিখিতে না। তাই বলি তোমার ভালবাসা ছেলে মানুষের ভালবাসা এখন নাই। অতি কাচা আঙ্গুর (কিসমিস) তাহার বেশ অম্ল রাঁধা যাইতে পারে; সে অম্ল যার অরুচি হইয়াছে তাহার রুচি জন্মাইয়া দিতে পারে তোমার ভালবাসা সেই কচি আঙ্গুরের অম্বল? অরুচির রুচি হয় বটে—কিন্তু অতি সুমিষ্ট সুপক্ক আঙ্গুর দেখ, যদি অমনি খাইতে চাহ অতি যত্ন করিয়া তুলার ভিতর রাখিয়া দেও, খাও, অতি সুস্বাদু, অতি মধুর, প্রাণ শীতল করে। পচিলেও নষ্ট হয় না, অতি সুমিষ্ট সুরা প্রস্তুত হইবে। উপকারী, খাইতে ভাল, অল্পে নেশা হয়। আমি তোমার নিকট হইতে সেই পাকা আঙ্গুরের ভাল বাসা খুঁজিতেছি। এর

মদ অধিক দিন রাখিবে, তত আরো মাদকতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। পৃথিবীর নানা কষ্টে মনে অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম, তোমার সেই ভালবাসা পাকা আঙ্গুরের মদ এক বার পান করিলাম, সকল রোগের শান্তি হইল, মানসিক বলধান হইল। সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইলাম, অল্প নেশার আমোদে ভোর হইয়া চিত্ত স্থির করিয়া বসিয়া রহিলাম। আহা! এ মদ যে খেতে পায় সে কি আর শুঁড়ির দোকানের বোতলে ভরা মদ খাইতে চায়? আমি এই মদের প্রত্যাশায় এত দিন মদ খাই নাই; দেখো সৌদামিনী! তুমি আমাকে নিরাশ করিয়া যেন মাতাল করিয়া তুলিও না।

একান্ত অনুগত বলিয়া সহি করিও না। আমার একান্ত অনুগত লোক অনেক আছে, কারণ বেহারা আছে, বেণী সাইদাস আছে। তুমি আমার সৌদামিনী আর তুমি তাই বলিয়াই লিখিবে। বাবার পত্রের উত্তর পরে পাঠাইবে। বেণী বাবু স্নগন্ধ্যার বাটীতে আসিলে আমাকে সম্বাদ লিখিবে। তুমি বেণী বাবু আসিলে একদিনের জন্য স্নগন্ধ্যা যাইতে চাহিয়াছ তাহাতে আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, তবে আমার ইচ্ছা যে আমি বাড়ী গিয়া বেণী বাবু আসিলে তোমাতে আমাতে দুইজনে গিয়া সাক্ষাৎ করিব। স্নতরাং তোমার এখন যাইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু বেণীবাবু আসিলে এবার নিতু কিরূপ ব্যবহার করে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া লিখিবে। অমৃতবাজার প্রভৃতি অনেকগুলি কাগজ আছে সব পাঠাইয়া দিব। তোমার চুড় হইয়াছে শুনিয়া খুসী হইলাম; মল গড়াতে দাও আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু আমি বাড়ি গিয়া দিলেই ভাল হয় না? তোমাকে যে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে বঙ্কিমবাবুর চিঠি আমাকে দেওয়া হয় নাই কেন? সে কথারও ত তুমি কোন উত্তর লেখ নাই। আমি অনেক ভাল আছি।

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১৯.

শ্রীশ্রীঈশ্বর শুক্রবার

সৌদামিনী,

তোমার ১৮ই তারিখের পত্র পাইলাম পত্রেতে ব্যার লিখিতে ভুল। কি রকম ভুল বলিব এই যেমন প্রিয়বর লিখিতে গিয়া পেয় বর লেখা; রোজ রোজ

"প্রিয়বরেষু" "পিয় বরেষু" কে তোমার পিয়বর? * * * (নষ্ট) চুড়ের জন্য আমি তোমাকে কবে শুধু শুধু কি বকেছিলাম তা ত আমার কিছুই মনে নাই। অবশ্য হয়ত বকে থাকিব সেটা বড় আমার পক্ষে বড় বিচিত্র কথা নয় কিন্তু কিছুই ত মনে হইতেছে না তুমি পত্রে লিখিয়া আমাকে মনে করিয়া দিও। "যেখানে গিয়ে শ্বশুর কি কাস্তাই বা কি যা কেহ কিছুই বলিতে পারেন না এবার আমি সেই * * * (নষ্ট) যাইব" কোথা সে? আমার কাছে ত? * * * (নষ্ট) তোমার সব কথা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি তুমি এটি জানিয়াছ যে স্বামী মনে করিলে সব হয় স্বামী মনে না করিলে হাজার লোকে বলুক না কেন কিছুই হবে না এবং ইহাও বলিয়াছ যে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর তবে তোমার ভয়ভাব বা দুঃখ কিসের? তুমি শ্মশান থাকিলেও তোমার কষ্ট হবে না। বাস্তবিক তোমার দুঃখ কিসের যে যাহা বলুক তুমি তাহাতে কান দিবে কেন? তুমি এখনও নিতান্ত ছেলে মানুষ তাই একটুতে ভয় পাও। সংসারে এত দুঃখ আছে তা মনে করিতে গেলে পাগল হতে হয়। সে সব কি গ্রাহ্য করিতে কেন চাও। নিজে ঠিক পথে থাকিবে সামান্য গৃহকক্ষে যাতে পাঁচ জনে নিন্দা না করে এমন করে চলবে। কুকক্ষে জয় করিবে আর কাহাকেও ভয় করিবে না। আমার ভয়ের কথা আমি ব্রজেন্দ্র বাবুকে বলিয়াছিলাম। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে কথাটা শুনে অবধি আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল। দুঃখের কথা কাহাকেও না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না তাই বলিয়া ছিলাম। ব্রজেন্দ্র বাবু আমার অসাক্ষাতে সেই কথা বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলেন যে "অক্ষয়ের স্ত্রী সেই কথা বিশ্বাস করিল নাকি? আমি একদিন তামাসা করে নয় সত্য সত্যই আমার স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে আমাকে বুঝি আবার বিয়া করিতে হয়" এ পর্যন্ত ত বেটা ছেলে হল না।" তাতে ঠাকুরাণ দিদি বলেন, "না-না আর বিয়ে করিতে হবে না আমারই বেটা ছেলে হবে আমাকে দিয়েই হবে।" বঙ্কিমবাবু বলেন যে তিনি হাসিতে হাসিতে এইরূপ উত্তর করেন কথাটা একটুও গায়ে মেখে নেন নাই। আমি কথাটা শুনিয়া মনে মনে প্রশংসা করিলাম তোমাকে বলা উচিত তাই তোমায় লিখিলাম। বেণীবাবু সুগন্ধ্যায় আসিয়াছিলেন কিনা সে কথার তুমি কোন উত্তর লেখ নাই। বোধ করি তিনি সুগন্ধ্যায় আসেন নাই আসিলে লিখিতে। নিতু আমার পত্রের উত্তর লেখে নাই। আমি তাকে কি উপদেশ দিয়া লিখিয়াছিলাম তাহাতেই বুঝি রাগ করিয়াছে। আমি তোমাকে এত

বড় বড় পত্র লিখিতেছি তুমি আমাকে এত ছোট পত্র লেখ কেন? একখানা কাগজ রাখিয়া দিবে যখন যাহা মনে হয় তাহাতেই লিখিবে তারপর খামের ভিতর আঁটিয়া পাঠাইয়া দিবে। আবার একখান কাগজ লইবে এইরূপ করিলেই সকল কথা লিখা হইবে পত্রও বড় হইবে। বাড়ীতে কে কোন দিন কোন কথা বলে তা বেশ গুছিয়া লিখিলেই আমিও যাব কথা শুনিতে পাইব তোমার মন অনেকটা খোলস হইবে। মনের কথা মনে রাখা ভাল নয়।

শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার

২০.

শ্রীশ্রী ঈশ্বর

প্রণামপ্রিয়বরেষু,

ভেবে সে শেলের দুখ
বিদরে আমার বুক
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে
বেঁধে যারা কত সয়
জীবন যন্ত্রণা ময়
ছার্ খার্ চুর্ মার্ বিনি বজ্রাঘাতে
অন্তরাত্মা জর জর
জীর্ণ দেহ বহা ভার
সুখের জীবন হয় বিজন শ্মশান
কি করিব, কোথা যাব
কোথা গেলে তেম্নি হব
হৃদি কমল বাসিন এবে হে কাহার
কোথা সে প্রাণের * * * (নষ্ট)
পূর্ণিমা চন্দ্রিমা জান
ওহো সেই হৃদি রাজ্য এবে কি আঁধার
তুমি তো পাষাণ নও
দেখে কোন প্রাণে রও
রহে সুপ্রসন্ন হও কাতর বাতুলে

বুঝিলাম আনুমানে
করুণা কটাক্ষ দানে
চাবেন আমার পানে, কবে নাও কথা
কেন যে হবে না হায়
হৃদয় জানিতে চায়
চির অনুরক্ত দাসী হয়ে কৃতাঞ্জলি
পাদ পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
কি করিবো কোথা যাব দাও অনুমতি।
নরকে না রকি দয়ে
মিশি গে মনের বয়ে
পরাণ কাতর হয়ে ডাকিব তোমায়
যেন নাথ সেই ক্ষণে
অভাগীরে পড়ে মনে
চরণে রেখো ভুলো না আমায়
এত যে যন্ত্রণা জ্বালা
অনাদর অবহেলা
তবু কেন প্রাণ টানে কি করি কি করি।
তুমি যে এমন হবে
মোর দুখে সুখে রবে
কাঁদিয়ে ধরিয়ে কর ফিরাবে বয়ান
সপনে ভাবি না যাহা
এখন হইল তাহা
দিলাম প্রাণের ধন যতনে রাখিও
আর আমার মতন
তেজনা এদের যেন
মনে রেখ সুখে থাক বিদায় ওপায়।

তারিখ ১১ই শ্রাবণ
চুঁচুড়া
তোমার
শ্রীমতী সৌদামিনী

২১.

শ্রীশ্রী ঈশ্বর সহায়

প্রণামপ্রিয়বরেষু,

তুমি কি করিলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। না বকিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ও সুখি হই ঐ কথা না নেখাতে যে আমার ভালবাসা কমিবে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই তাহা হইলে লিখিতাম তুমি বলিবে বুঝিতে না পারাই কম ভালবাসার কারণ। যত কিছুই আমার কপালের দোষ তাহা হইলে বা আগে লিখিলাম নাই বা কেন। আমি এখন বলিতেছি যে স্বামীকে ভালবাসা না জানাইতে পারে তাহার মরণ ভাল। তুমি যে দিন বহরমপুরে পৌছিয়াছিলে সেই দিন বঙ্কিমবাবুর পত্র আসিয়াছিল তাহা তোমাকে দিয়া হইবে কেমন করে। বেণীবাবু যদি আসেন তাহা হইলে নিতুর কথা সকল লিখিব।

তুমি বাবার পত্রের উত্তর লিখিবে। ইতি

তারিখ ৮ই ফান্গুন

তোমার

শ্রীমতী সৌদামিনী

২২.

শ্রীশ্রী ঈশ্বর সহায়

প্রণামপ্রিয়বরেষু,

তোমার শনিবারের পত্র পাইলাম। যদিও অসুখ সারে নাই কিন্তু গায়ে একটু বল পাইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম।

মার জ্বর ভাল হয় নাই, আমি * * * (নষ্ট) বলিলাম, মার মত নহে তিনি ডাক্তারি ঔষধ খাইবেন না।

এবার যাওয়া কোন অনিয়ম হয় নাই। মাধব দেখে গিয়াছে কে আসিয়া বাড়ীতে শুইবে, কার্ত্তিক পূজার দিন আসিবে।

আজ সরাগুড় ও বড়ি পাঠাইয়ালাম পাইয়ে পত্র লিখিবেন।

তবে দুক্ষ করি কাঁদি। ইতি

তারিখ ২৬ এ কার্ত্তিক

তোমার

শ্রীমতী সৌদামিনী

পুন— * * * (নষ্ট) একটা কথা যদি রাত্রদিন ভাবনা হয় আর খুব কষ্টের উপর তা হইলে, পাগল হইবার কিছু বিচিত্র নহে।

যাহাই হউক ও কথা আর তুলিবেন না।

"মনের মানুষ পাইনে রে ফুল,
বলব কারে মনের কথা, ছার হয়ে
জাক পোড়া হৃদয় মনে থাকুক
মনের ব্যথা। বনের আগুন বনে
বনে আপনি নিয়ে যায় সে যথা
আমার মনের দারুণ আগুন
চিতার সনে নিবে তথা।"

অমর, বাবা, নলিনী, মনিনী, হরিত্রী, আর সকলে ভাল আছেন। তোমার কুশল লিখিবেন। তোমার পত্র না পাইলে আমি রাগ করি না।

২৩

শ্রীশ্রী জগদীশ্বর

প্রণামপ্রিয়বরেষু,

তোমার বৃহস্পতিবারের পত্র পাইয়াছি না ভাই তোমার আর পাকা গাঁথনি করিতে হইবে না আমার কাঁচা গাঁথনি ভাল কি জানি মন না মতী যদি আবার খুলিতে হইল তবে পাকা গাঁথনি হইলে খুলিতে কষ্ট হইবে তাই বর্ণে আমার কাঁচাই ভাল ইংরাজী মতে লক্ষ্মী পূজা হইবে শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে আমরা বাঙ্গালি মানুষ ইংরাজির কথা শুনিলে আমাদের ভয় হয়।

শাক কচু খাই পাটে পাটে করি
ইংরাজের কি ধার ধারি

তাই বলি আমরা বাঙ্গালি মানুষ আমাদের বাঙ্গালি মতেই লক্ষ্মী পূজা করা ভাল।

কিশোরী বাবুর ব্যারাম হইয়াছিল শুনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইলাম তোমার শশির দাদাকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমার জায়েরা কেমন আছেন যদু পতি বাবুর যদি ব্যারাম ভাল হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার কথা তাহা * * * (নষ্ট) জিজ্ঞাসা করিবেন।

এইবার আমার পত্র ছোট বলিতে পারিবে না। আপনি নিজেই ছোট পত্র লিখিয়াছ তুমি চৈত্র মাসে বাড়ী আসিবে কিন্তু আমি যাইতে যেন চৈত্র মাস বলিয়া * * * (নষ্ট)

আমি এখানে আর থাকিব না এখানে সকলে ভাল আছেন তুমি কেমন আছ লিখিবে।

তারিখ ২৭শে ফান্‌গুন
তোমার
শ্রীমতী সৌদামিনী

অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শোকসন্তপ্ত পুত্র অজয় চন্দ্রকে পোষ্টকার্ডে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

২৪. ওঁ

Ranchi
The 28th Oct. 1917

সবিনয় নিবেদন,

তোমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেবের মৃত্যু সংবাদে যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের সাহিত্য মুকুটের একটি উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া গেল। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানিবে। ভগবান পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন এবং তোমাদের শোকসন্তাপ দূর করুন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশেষে অক্ষয়চন্দ্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রখানি উদ্ধৃত করা গেল।

৺গঙ্গা

যথাবিহিত সময়োচিত নিবেদনম্,

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গত ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার—কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। আগামী ১৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ। তদুপলক্ষে মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক

নিম্নলিখিত দিবসত্রয়ে আমাদের চুঁচুড়া—কদমতলার বাটীতে সবান্ধব আগমন করিয়া আমাদিগকে এই মহাদায় হইতে উদ্ধার করিলে কৃতার্থ হইব। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম,—ত্রুটি মার্জনা করিবেন। ইতি তারিখ—২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪ সাল।

১৫ই কার্ত্তিক (১লা নভেম্বর), বৃহস্পতিবার—আদ্যশ্রাদ্ধ, সভা এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অধ্যাপক-বিদায়।

১৬ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর), শুক্রবার—মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণগণের জলপান এবং রাত্রিতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের জলপান।

১৭ই কার্ত্তিক (৩রা নভেম্বর), শনিবার—মধ্যাহ্নে স্বজাতি ও কুটুম্বগণের ভোজ।

ভাগ্যহীন—

কদমতলা, চুঁচুড়া

সানুজ অজরচন্দ্র দেবদাসস্য

(সরকার)

অক্ষয়চন্দ্রের কয়েকটি রচনার বর্জিত অংশ

অক্ষয়চন্দ্রের নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে মূল প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ মুদ্রিত পাঠ থেকে বর্জিত হয়। আবার প্রবন্ধ সম্পূর্ণভাবে না পড়লে তার রস আহরণ করা যায় না। এই কারণে বর্জিত অংশগুলি সাধারণী নবজীবন, জন্মভূমি, বসুধা, পূর্ণিমা থেকে উদ্ধার করে আমরা প্রকাশ করলাম।

একই প্রবন্ধ ভিন্ন নামে ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কখনো পুরো রচনা নয়, অংশবিশেষ মাত্র অন্য নামে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন 'চট্টগ্রাম অভিভাষণে'র (১৩১৯) অংশ 'বাঙ্গালার স্বাস্থোন্নতি করা অগ্রে চাই' নামে ১৩.৫ সালের 'পূর্ণিমা'-য় প্রকাশিত হয়। 'আমাদের আপনাদের কথা' (পূর্ণিমা, ১৩১৫) শীর্ষক রচনাটিও পরে ঐ অভিভাষণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অজরচন্দ্র সম্পাদিত 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারে' 'ধর্ম ও ধর্মের অনুষ্ঠাতা' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি ভুলক্রমে 'সনাতনী'তে স্থান পেয়েছে। আসলে প্রবন্ধটির রচয়িতা বিখ্যাত শশধর তর্কচূড়ামণি। এ বিষয়ে চন্দ্রমোহন সেন নবজীবনে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন (আষাঢ়, ১২৯৪)। তার উত্তরে অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। "তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রথমাংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয়। তিনি ভাগ করেন নাই বা ভাগ করিবার অনুমতি দেন নাই। যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কাটা ছাঁটা নাই। তাহাতে একটি বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ মত প্রকাশিত হইয়াছে। বাকিটুকু আমার নিকট এখনও আছে। আমি এখন অভিযুক্ত আসামী সুতরাং আমার সাফাই জন্য যদি সেই অপ্রকাশিত অংশের তিন চারি পংক্তি উদ্ধার করি, তাহা হইলে, বোধ হয়, অন্তত আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে না। প্রবন্ধে আছে,—'আর তুমি স্বেচ্ছাচারী মহাপুরুষ মদ্যপান ও কুক্কুট গো-মাংসাদি ভক্ষণ করিবে, অথচ হরিণাম করিবে তাহা হইতে পারে না।' ইত্যাদি। প্রথমে তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীতে আমাদের উপর "কাঁটা ছাঁটার" অভিযোগ আনেন, এক্ষণে নবজীবনেই সেই অভিযোগে আমাদিগকে অপরাধী স্থির করা হইল। সুতরাং এই

দুই অনুষ্ঠানের মধ্যে অপরাধের বিচার বলিয়া একটা পদার্থের আবির্ভাবই হইল না"—নবজীবন সম্পাদক।

'সহজজ্ঞান ও স্বচ্ছন্দতা' (জন্মভূমি, ১৩০০) রচনাটি 'সনাতনী'-তে (পৃঃ-৩৬৩) ভিন্ন নামে প্রকাশিত হবার পর কেবলমাত্র এই অনুচ্ছেদটি বর্জিত হয়েছে,—'একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজী উপাধ্যায়,—একজন বিচক্ষণ মহামহোপাধ্যায়কে সেদিন বলিতেছিলেন যে, মানুষের মনের মধ্যেই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের সহজ উপায় আছে, এমন কথাটা আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। মহামহোপাধ্যায় উত্তর করেন যে, তা এমন কিছু নাই। তাঁহাদের এই কথোপকথনের আভাস পাইয়া, ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়।'

'প্রবন্ধ ও নিবন্ধ' পর্যায়ে (১ম ভাগ) 'ভূমিকম্প' প্রবন্ধের পূর্বে একটি টীকা ছিল। রচনাটির উৎস বিষয়ে টীকাটি মূল্যবান।

(দ্রষ্টব্য ১। নবজীবনের ১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসুর লিখিত "সঙ্কর্ষণাগ্নি—অনন্ত—বলরাম" শীর্ষক প্রবন্ধ। ২। ৩১শে আষাঢ়ের দৈনিকে উদ্ধৃত ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত "ভূমিকম্পের কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। ৩। আষাঢ়ের জন্মভূমিতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কাশীর লিখিত 'ভূমিকম্প' শীর্ষক প্রবন্ধ। আমার প্রবন্ধ, শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের পূর্ব্বে লেখা, সকল প্রবন্ধেরই সামঞ্জস্য হয়।)

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অপর একটি কবিতা 'অমিয় বরখে' এই নামে রচিত হয়নি। এই নামটি অক্ষয়-পুত্র অজরচন্দ্রের দেওয়া। কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তার শিরোনাম ছিল 'গান'। এ ছাড়া মূল কবিতার চরণ-বিন্যাস রীতিও এখানে পরিবর্তিত হয়েছে।

নবজলধর, শ্যাম সুন্দর, গগনে উদয় ভেল।
জলদে জড়িত, থীর তড়িত, নয়ন ভরিয়া গেল॥
মেঘে ঝলকে, চপলা চমকে, অমিয় বরখে তায়।
সোহি অমিয়ে, সিনাম করিয়ে পরাণ যুড়ায়ে যায়॥ (পূর্ণিমা ১৩০০, পৃষ্ঠা ৯১৫। অ সা. স (শেষার্ধ) পৃঃ-৮২০)

এছাড়া অজরচন্দ্র সম্পাদিত 'স্মৃতিতর্পণ' (অ. সা. স. শেষার্ধ) নামক অংশে 'অক্ষয়কুমার দত্ত' (পৃঃ-৬২৩-২৮) 'হিন্দুহিতৈষী হরিশচন্দ্র' (পৃঃ-৪৩১-৩২) ও 'প্যারীচরণ সরকার' (পৃঃ-৪৩৭-৩৯) নামক তিনটি প্রবন্ধের কিছু মূল্যবান অংশ

বাদ পড়ায় তা এখানে তুলে ধরা গেল।

'অক্ষয়কুমার দত্ত' প্রবন্ধটি 'নবজীবনে' প্রকাশের সময় এইরকম পাদটীকা ছিল :—'শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে এই জীবন চরিত প্রধানত গৃহীত হইল।'

'হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র' প্রবন্ধটিও 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। এরও পাদটীকাটি বর্জিত হয়েছে :—'হিন্দুপেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত। রামগোপাল বাবুর বহু পরিশ্রম সাধ্য হরিশ্চন্দ্রের জীবনীর আমরা যে মুখবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাই হরিশ্চন্দ্র চরিতের যৎ সামান্য সমালোচনাভাবে প্রকাশ করা গেল।'

'প্যারীচরণ সরকার' নামক প্রবন্ধটিতে কার্তিক মাসের সাধারণীতে যা প্রকাশিত হয়েছিল 'অক্ষয় সাহিত্যসম্ভারে'-র শেষার্ধে (পৃঃ-৪৩৮) তার প্রথম অনুচ্ছেদটি বর্জিত হয়েছে। অথচ উচ্ছ্বাসময় এই প্রারম্ভিক অংশটি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

> "অভাগিনী বঙ্গভূমি আর একটি পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন। আজি একমাস হইল, কলিকাতার প্যারীচরণ সরকার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমাদের নিতান্ত দুরদৃষ্টক্রমে এই বিজয়ার উৎসব পরে সাধারণীর জন্মবাসরে আজি সেই হৃদয়ভেদকারী বার্ত্তা ঘোষণা করিতে হইতেছে। কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধন কি কষ্টকর।" (সাধারণী ১২৮২, ১৫ই কার্ত্তিক, পৃঃ-২)

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট